প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত গবেষণাসন্দর্ভ

গবেষক

ঐশী সাহা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডঃ অশোক কুমার মাহাত

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধনক্রম – A00SA1601618

শিক্ষাবর্ষ – ২০১৮-২০১৯

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

Prācīn Bhāratīya Śikṣāviṣayak Saṃskār O Ādhunik Vaṅgajīvane Tār Uttarādhikar

A thesis submitted to the Faculty of Arts, Jadavpur University
in partial fulfilment for the Award of the Degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY
in
SANSKRIT

By
Oishi Saha
Registration No.: A00SA1601618
Session – 2018-2019

Under the Supervision of
Prof. Ashok Kumar Mahata
Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit
Jadavpur University
2023

Certified that the Thesis entitled

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার (Prācīn Bhāratīya Śikṣāviṣayak Saṃskār O Ādhunik Vaṅgajīvane Tār Uttarādhikar) Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my own work carried out under the supervision of Prof. Dr. Ashok Kumar Mahata, Professor of Sanskrit, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor
Date:

Candidate
Date:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় আমার অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্নাতক-স্নাতকোত্তর শ্রেণী থেকে তাঁদের অত্যুৎকৃষ্ট অধ্যাপনায় আমার চিত্তে জ্ঞানের প্রদীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। প্রাক্তন অধ্যাপক ড. প্রদ্যোত কুমার দত্ত, প্রয়াত অধ্যাপক ড. অভিজিৎ ঘোষ মহাশয়ের মনোগ্রাহী শিক্ষণপদ্ধতি আমাদের যে কোনও ছাত্র-ছাত্রীর অনুসন্ধিৎসার জাগরণ ঘটাত। শ্রদ্ধা জানাই মাননীয় অধ্যাপক ডঃ তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপিকা ডঃ দেবার্চনা সরকার মহাশয়াকে। তাঁদের দিগ্ দর্শনের দ্বারা আমার মধ্যে গবেষণার সুপ্ত ভাবনার বীজ বপন হয়।

এরপর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণা-সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক মাননীয় অধ্যাপক ডঃ অশোক কুমার মাহাত মহাশয়কে। বহু ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁর উৎসাহ, নির্দেশনা ও আন্তরিকতা এই গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার এই গবেষণা-সন্দর্ভের অন্যতম পথপ্রদর্শক ডঃ দেবদাস মণ্ডল মহাশয় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সঞ্জিৎ কুমার সাঁধুখা মহাশয়কে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক মাননীয়া শ্রুতিদি ও নিমাইদাকে আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গ্রন্থাগার থেকেও যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি।

ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্যে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ এবং শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। এছাড়াও অধ্যাপক ডঃ ধনঞ্জয় চক্রবর্তী মহাশয়, অধ্যাপক ডঃ ব্রজকিশোর স্বাঁই মহাশয় এবং অধ্যাপক ডঃ স্বদেশ রঞ্জন ঘোষাল মহাশয় আমার গবেষণা সন্দর্ভটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। তাঁদের কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়া গবেষণা-সন্দর্ভের কিছু পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার সহকর্মী অধ্যাপক ডঃ অন্তরা মিত্র দিদি, অধ্যাপক ডঃ নিবেদিতা সোম দিদি। এছাড়াও আমার ভ্রাতৃতুল্য অধ্যাপক ডঃ উজ্জ্বল সর্দার দাদা এবং আমার সহপাঠী সঞ্জীব মণ্ডল আমার গবেষণাকার্যে সহায়তা করেছেন।

সবশেষে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার পিতা স্বপন কুমার সাহা, মাতা প্রগতি সাহা এবং আমার পতি তাপস কুমার ডাঙ্গরকে যাঁরা আমাকে এই কর্মটি করতে সমর্থন করেছেন। এই কর্মের জন্য কিছুটা হলেও অবহেলিত স্বীয় সন্তানদের নিকট থাকল নীরব ক্ষমাপ্রার্থনা, যাদের সাময়িক ত্যাগ ছাড়া এই গবেষণাসন্দর্ভটি রচনা করা একেবারেরই সম্ভব হত না।

ঐশী সাহা

গবেষিকা

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শব্দসংকেত

অ. বে = অথর্ববেদ সংহিতা

আ. গৃ. সূ = আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র

আ. শ্রৌ. সূ = আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র

আপ. গৃ. সূ = আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র

আপ. ধর্ম. সূ = আপস্তম্ব ধর্মসূত্র

উ.সং = উশনঃ সংহিতা

ঋ. বে = ঋগ্বেদ সংহিতা

ঋ. ভা = ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা

ঋ. বর্গ = ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য বর্গদ্বয়বৃত্তি

কা. শ্রৌ. সূ = কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র

কা. গৃ. সূ = কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্র

কু.স = কুমারসম্ভবম্

কা. স্মৃ = কাত্যায়ন স্মৃতি

কা. পরি = কাত্যায়ন পরিশিষ্ট

কৌ. গৃ. সূ = কৌশিক গৃহ্যসূত্র

খা. গৃ. সূ = খাদির গৃহ্যসূত্র

গো. গৃ. সূ = গোভিল গৃহ্যসূত্র

গো. ব্রা = গোপথ ব্রাহ্মণ

গৌ. ধর্ম. সূ = গৌতম ধর্মসূত্র

গৌ. সং = গৌতম সংহিতা

ছা. উপ = ছান্দোগ্য উপনিষদ

জৈ. গৃ. সূ = জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র

তৈ. সং = তৈত্তিরীয় সংহিতা

তৈ. উ = তৈত্তিরীয় উপনিষদ

তর্ক. সং = তর্কসংগ্রহ

দক্ষ. সং = দক্ষ সংহিতা

পা. গৃ. সূ = পারস্কর গৃহ্যসূত্র

ব্যা. সং = ব্যাস সংহিতা

বৌ. গৃ. সূ = বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র

বৌ. ধর্ম. সূ = বৌধায়ন ধর্মসূত্র

বৈখা. গৃ. সূ = বৈখানস গৃহ্যসূত্র

বৈ. য = বৈদিক যজ্ঞ

বার. গৃ. সূ = বারাহ গৃহ্যসূত্র

বিষ্ণু. সং = বিষ্ণু সংহিতা

মা. গৃ. সূ = মানব গৃহ্যসূত্র

মনু.সং = মনুসংহিতা

যা.সং = যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

রঘু = রঘুবংশম্

শা. গৃ. সূ = শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র

শঙ্খ. সং = শঙ্খ সংহিতা

শত. ব্রা = শতপথ ব্রাহ্মণ

শ. ক. দ্রু = শব্দকল্পদ্রুম

শু. যজুঃ = শুক্ল যজুর্বেদ

সং. প্র = সংস্কারপ্রকাশ

সংব. সং = সংবর্ত্ত সংহিতা

সং. রত্ন. মা = সংস্কার রত্নমালা

হা. সং = হারীত সংহিতা

হি. গৃ. সূ = হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়:	ভূমিকা	**১-১১**
দ্বিতীয় অধ্যায়:	কল্পসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	**১২-৭৯**
তৃতীয় অধ্যায়:	শিক্ষাবিষয়ক সংস্কাররূপে উপনয়ন ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার	**৮০-১৪৭**
চতুর্থ অধ্যায়:	বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার	**১৪৮-১৬৬**
পঞ্চম অধ্যায়:	শিক্ষাবিষয়ক সংস্কাররূপে সমাবর্তন ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার	**১৬৭-১৯৩**
ষষ্ঠ অধ্যায়:	উপসংহার	**১৯৪-১৯৮**
তালিকা		**১৯৯-২০৪**
নির্দেশিকা		**২০৫-২০৮**
গ্রন্থপঞ্জী		**২০৯-২১৪**

প্রথম অধ্যায়:
ভূমিকা

১.১ অবতরণিকা (Introduction):

ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল বেদ। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ এই বেদ থেকেই জানা যায়। জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'বেদ' শব্দের অর্থ হল জ্ঞান। তবে সেই জ্ঞান সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর লৌকিক জ্ঞান নয়। বেদ হল ঋষিদের অপরোক্ষ অনুভূতির প্রকাশ, বেদ বলতে এক অলৌকিক অখণ্ড জ্ঞানরাশিকে বোঝায়। প্রাচীন ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে বেদ এবং বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজও অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে স্বীকৃত। এখানে আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের শিরোনাম হল **"প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিষয়ক-সংস্কার ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার।"** সংস্কারসমূহের বিবরণ প্রথমত কল্পবেদাঙ্গের মধ্যে ও পরবর্তী সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে দেখা যায়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি সংস্কার শিক্ষাসংক্রান্ত। বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভটিতে বৈদিক যুগ ও বেদপরবর্তী যুগে অনুষ্ঠিত শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারগুলির আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এখানে আধুনিক বঙ্গজীবনে তাদের উত্তরাধিকারের ধারা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রচলিত উক্ত শিক্ষাসংস্কারগুলির পদ্ধতি ও প্রকরণগত যে পরিবর্তন ঘটেছে তাও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে ঔপনিবেশিক সময়ে ও স্বাধীনতার উত্তরকালে আধুনিক ভারতীয় তথা বঙ্গজীবনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ধারা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের ব্যাপ্তি শুধুমাত্র ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি ও তদ্বিষয়ক

সংস্কারসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিচারবিশ্লেষণ আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

এই সন্দর্ভটিতে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে। সেই প্রসঙ্গে বৈদিক যুগের মানুষের জীবনে সংস্কারের গুরুত্ব, শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারের স্বরূপ ইত্যাদি অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র প্রভৃতি কল্পসূত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে শ্রুতি বা বেদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তারা পরোক্ষভাবে বেদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এরা কল্পসাহিত্যের অন্তর্গত আর কল্প হল বেদাঙ্গের অন্তর্গত। ষড়্বেদাঙ্গের সঙ্গে বেদ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। গৃহ্যসূত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই যাদের কথা বলা যেতে পারে তারা হল- গৃহস্থের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্কার। জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত যে যে সংস্কার একজন গৃহস্থের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত সে সবই গৃহ্যসূত্রে সূত্রাকারে বলা হয়েছে। এই সংস্কারগুলির নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ প্রভৃতি সম্পর্কেও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই গৃহ্যসূত্রগুলিতে। এই গৃহ্যসূত্রগুলিকে বেদের চারটি সংহিতা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। উক্ত ভাগগুলিতে গৃহ্যকর্মগুলি সুবিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিতেও সংস্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১.২ গবেষণাকর্মের বিষয়বস্তু (Content):

কল্পসূত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে সংস্কারের বিভিন্ন সংখ্যা ও নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই সংস্কারগুলির মধ্যে প্রধান সংস্কার হিসেবে– (১) গর্ভাধান (২) পুংসবন (৩) সীমন্তোন্নয়ন (৪) জাতকর্ম (৫) নামকরণ (৬) অন্নপ্রাশন (৭) চূড়াকরণ (৮) উপনয়ন (৯) সমাবর্তন (১০) বিবাহ- এইগুলিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়ে থাকে। বর্তমান

গবেষণাসন্দর্ভে এই সমস্ত সংস্কারের নিয়মবিধি, সেই সংস্কারগুলি পালন করার জন্য আবশ্যক দ্রব্যের বিবরণ এবং সংস্কারগুলির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কল্পসূত্র বিশেষত গৃহ্যসূত্রের সংস্কারসমূহের অন্তর্গত শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারগুলি বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। এই গবেষণা-সন্দর্ভে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার-সমূহের মধ্যে দুটি সংস্কার প্রধানভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলি হল উপনয়ন ও সমাবর্তন। এছাড়া শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারের মধ্যে আরও তিনটি স্বল্পালোচিত সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। এগুলি হল- উপাকরণ, উৎসর্জন ও বেদব্রত।

১.৩ বিষয়-নির্বাচনের গুরুত্ব (Importance) :

সংস্কৃত সাহিত্যে 'সংস্কার' শব্দটি বহু ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যে সংস্কার বলতে শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে। *"নিসর্গসংস্কারবিনীত ইত্যসৌ নৃপেণ চক্রে যুবরাজশব্দভাক্" (রঘু. ৩/৩৫)।* মহারাজ দিলীপ তাঁর পুত্র রঘুকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করলেন কারণ রঘু নিজের স্বভাব এবং শাস্ত্রাভ্যাসজনিত সুশিক্ষার গুণে চরিত্রের পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। সুতরাং সংস্কার বলতে এখানে শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে। আবার *কুমারসম্ভব* কাব্যে আমরা ব্যাকরণশুদ্ধি অর্থেও এই শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। *"সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী তয়া স পুতশ্চ বিভূতিশ্চ" (কু.স. ১/২৮)।* ভ্রমপ্রমাদ বর্জিত পরিশুদ্ধ বাক্য দ্বারা যেমন জ্ঞানবান সুপণ্ডিত পবিত্র এবং বিভূষিত হন, সেইরকম কুমারী পার্বতীর দ্বারাও তাঁর পিতা হিমালয় পবিত্র এবং অলংকৃত হয়েছিলেন। সুতরাং ব্যাকরণশুদ্ধি প্রসঙ্গেই এখানে সংস্কার শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

কল্পসূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহৃত সংস্কার শব্দটি আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কার বলতে এখানে আচার-অনুষ্ঠানমূলক কর্মকেই বোঝানো হয়েছে। নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে সেই কর্ম দুরকম। যে কর্ম না করলে প্রত্যবায় বা পাপ হয় তাকেই শাস্ত্রে নিত্যকর্ম বলা হয়েছে। যেমন, ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি। পক্ষান্তরে নৈমিত্তিক কর্ম তাকেই বলে যা বিশেষ নিমিত্ত উপস্থিত হলে তবেই অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়- পুত্র জন্মগ্রহণ করলে জাতেষ্টি, প্রিয়জনের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান- এগুলি হল নৈমিত্তিক কর্ম। সংস্কার, পূজা, ব্রত, শ্রাদ্ধভেদে নৈমিত্তিক কর্ম বহুধা-বিভক্ত।

সংস্কার শব্দের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে দার্শনিক মতবাদের বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। মীমাংসা-দর্শনে সংস্কারের উল্লেখ রয়েছে কর্ম-প্রকরণে। গুণকর্ম ও অর্থকর্ম (প্রধানকর্ম)- এই দ্বিবিধ কর্মের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে সূত্রকার আচার্য জৈমিনি দুটি সূত্র প্রণয়ন করেছেন। সূত্র দুটি হল-*"যৈস্তু দ্রবং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়তে তস্য দ্রব্যপ্রধানত্বাৎ"(মী. সূ. ২/১/৮)* এবং *"যৈস্তু দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে তানি প্রধানভূতানি দ্রব্যস্য গুণভূতত্বাৎ"(মী. সূ. ২/১/৭)।* যে কর্মসমূহের দ্বারা কোনও দ্রব্যের উৎপাদন বা সংস্কার সম্পাদিত হয়, সেখানে দ্রব্যই প্রধান এবং তার ফলে কর্মটি অপ্রধান কর্ম বা গুণকর্ম রূপে পরিচিত হয়।

১.৪-সাহিত্য-সমীক্ষা (Review of Literature) :

এই গবেষণাকার্যের পরিকল্পনা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী গবেষক ও গ্রন্থকারদের নানাবিধ গ্রন্থের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে নির্বাচিত দুটি গ্রন্থের বিধিসম্মতভাবে সাহিত্য-সমীক্ষা করা হল।

India of Vedic Kalpasūtras

রামগোপালপ্রণীত *India of Vedic Kalpasūtras* গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। National Publishing House দিল্লি থেকে ১৯৫৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে সর্বমোট ২২ টি অধ্যায়ে নানা বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি হল - ১) The Kalpasūtras ২) The Gṛihyasūtras ৩) The Darmasūtras ৪) The Age of the Sūtras ৫) Geographical Background ৬) Social Organization ৭) Economic life ৮) Everyday Life ৯) The System of Government ১০) Law and Justice ১১) Marriage Laws and Customs ১২) Marriage Rites and Festivities ১৩) Saṃskāras for Maternity and Child Welfare ১৪) Educational Saṃskāras ১৫) The System of Education ১৬) Funeral Rites and Śrāddhas ১৭) Daily Sacrifices ১৮) Periodical Sacrifices ১৯) Special Sacrifices ২০) Family Life and Position of Women ২১) Orals and Manners ২২) Religion and Philosophy.

উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়সমূহের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্যে কল্পসূত্রের অবস্থান, শ্রৌত এবং গৃহ্যসূত্রের মধ্যে সম্পর্ক, গৃহ্য ও ধর্ম সূত্রের মধ্যে সম্পর্ক, কল্পসূত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গৃহ্যসূত্রের বিষয়বস্তু, গৃহ্যসূত্রের উৎস এবং তার ক্রমবিকাশ এবং প্রত্যেকটি গৃহ্যসূত্র বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এখানে গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্মসূত্রের বিষয়বস্তু, ধর্মসূত্রের উৎস এবং তার ক্রমবিকাশ, মানবধর্মসূত্র এবং মনুস্মৃতি, প্রত্যেকটি ধর্মসূত্র ও তাদের আপেক্ষিক কালানুক্রম। পঞ্চম অধ্যায়ে সূত্রকারদের বাসস্থান, আর্যসংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র, সেখানকার আবহাওয়া, উদ্ভিদ

এবং প্রাণিজগৎ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন জাতি ও তাদের পেশা, বেদপাঠের অধিকার ও তার নিয়ম, জাতিসমূহের ধর্ম এবং সামাজিক বিষয়ে পার্থক্য, ধর্মীয় বিষয়ে পার্থক্যের ভিত্তি, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, বিভিন্ন বর্ণের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা এবং শূদ্রের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে পেশা, কৃষি, গবাদি পশু, প্রজনন, হস্তশিল্প, যাজকত্ব, শিক্ষকতা ও অন্যান্য পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ, ওজন ও পরিমাপ, মুদ্রা, ব্যাংকিং বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে শহর ও গ্রাম, বাড়ি, পোশাক, অলঙ্কার ও সাজসজ্জা, চুল, খাদ্য ও পানীয় এবং বিনোদন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে শাসনপদ্ধতি, রাজার কর্তব্য, রাষ্ট্রের রাজস্ব ও ব্যয়, সামরিক প্রশাসন, সেনাবাহিনী এবং যুদ্ধনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে আইনের উৎস, দণ্ড আইন, দেওয়ানি আইন, বিচার প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে বিবাহের ধরণ, আর্য-বিবাহের অপরিহার্য আচার, অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহ, বিবাহের উপহার এবং বিবাহের শুভ সময় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রাথমিক আচার ও উৎসব, বিবাহের প্রয়োজনীয় আচার, কনের বাড়িতে সপ্তপদী অনুষ্ঠানের পরবর্তী আচার, দম্পতির গৃহে প্রস্থান, কন্যার অভ্যর্থনা এবং দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সংস্কারের অর্থ, জাত-কর্ম, নামকরণ, কিছু ক্ষুদ্র সংস্কার, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও গোদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা আমাদের গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু। এই শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারগুলির মধ্যে যে সংস্কারগুলি আছে সেগুলি হল- উপনয়ন, উপাকর্মন, উৎসর্জন, বেদব্রত এবং সমাবর্তন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রজীবন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক, অধ্যয়নের বিষয়, নির্দেশনার পদ্ধতি, শিক্ষার কাল,

শিক্ষার ধারণা এবং নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষোড়শ অধ্যায়ে শ্মশানে অনুষ্ঠেয় কর্মের পূর্বের আচার, শ্মশানের আচার, শ্মশানে আচরণীয় কর্মের পরের আচার এবং শ্রাদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে গার্হপত্য অগ্নি হোম করার পদ্ধতি এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টদশ অধ্যায়ে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ, শ্রবণাকর্ম ইন্দ্র-যজ্ঞ, অশ্বযুজী, ধ্রুবকল্প, অগ্রহায়ণী, অষ্টকা, ফাল্গুনী, চৈত্রী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঊনবিংশ অধ্যায়ে চৈত্য-যজ্ঞ, চাষের সঙ্গে যুক্ত আচার, আগ্রহায়ণী, সীতাযজ্ঞ, বৃষোৎসর্গ, এবং শূলগব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিংশ অধ্যায়ে পারিবারিক জীবন ও নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একবিংশ অধ্যায়ে উত্তম আচরণের গুরুত্ব, সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা, যৌনতাবিষয়ক নৈতিকতা, গুরুজনদের সম্মান, সততা, দয়া, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আদর্শ আচরণ ও শিষ্টাচার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে সর্বোত্তম জনপ্রিয় দেবতা এবং দানবদের ধারণা, উপাসনার পদ্ধতি, কুসংস্কার এবং জাদুকরি আচার, কর্মবিষয়ক মতবাদ, নীতিশাস্ত্র, যুগতত্ত্ব এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের সংস্কার চর্চা

অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য প্রণীত ***প্রাচীন ভারতের সংস্কার চর্চা*** একটি সুপাঠ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি সংস্কৃত বুক ডিপো থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লেখা। এই গ্রন্থটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টিতে সংস্কারের স্বরূপ এবং প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংস্কার শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন গ্রন্থে কীভাবে পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে

সংস্কারের সংখ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জন্মপূর্ব সংস্কার অর্থাৎ গর্ভাধান, পুংসবন এবং সীমন্তোন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জন্মোত্তর সংস্কার অর্থাৎ জাতকর্ম এবং নামকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শৈশবের সংস্কার অর্থাৎ অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শৈশবোত্তীর্ণ সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যৌবনের সংস্কার অর্থাৎ সমাবর্তন এবং বিবাহ নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অর্থাৎ জীবনের অন্তিম সংস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া আরও নানাবিধ গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে আচার্য শ্রীরামগোবিন্দ শুক্লের *সংস্কারসার,* বীরমিত্রোদয়ের *সংস্কারপ্রকাশ,* অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হিন্দুশাস্ত্রমতে উপনয়ন ও তৎপূর্ববর্তী পঞ্চবিধ সংস্কার, হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধসংস্কার,* হরিনারায়ণ আপ্তের *সংস্কাররত্নমালা,* বিদ্যামার্তণ্ড ড. সত্যব্রত সিদ্ধান্তালঙ্কারের *সংস্কার-চন্দ্রিকা,* রাজবলী পাণ্ডের *Hindu Samskāras* এবং রাধাকুমুদ মুখার্জীর *Ancient Indian Education* ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১.৫-গবেষণাবকাশ (Research Gap):

পূর্বোল্লিখিত গুণিজনদের গ্রন্থে সাধারণভাবে যাবতীয় সংস্কারের আলোচনা গুরুত্ব লাভ করেছে। কেবলমাত্র শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারগুলি সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার ক্ষেত্র উক্ত গ্রন্থগুলি নয়। আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণাকার্যে বিশেষভাবে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার বিষয়টির কালানুক্রম অনুসারে একটি ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এই সংস্কারগুলি আধুনিক কালে বঙ্গজীবনে কতটা প্রাসঙ্গিক সে বিষয়ে

বিশেষভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থগুলির লেখকদের সুচিন্তিত অভিমত আমাদের গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং নতুন পথের সন্ধান দিতে সাহায্য করেছে।

১.৬ পূর্বানুমান (Hypothesis):

এই গবেষণাকর্মে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারের যে সমস্ত বিধিনিষেধ কল্পসাহিত্য ও তৎপরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায় তার পর্যালোচনা করা হবে। তাছাড়া সে সমস্ত সংস্কার আধুনিক কালে বঙ্গজীবনে পালন করা হয় কি না তাও সীমিত পরিসরের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা হবে। যে সমস্ত শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার বর্তমানে পালন করা হয়ে থাকে সেগুলির সম্ভাব্য বিবর্তনের ধারাও আলোচনার পরিসরে স্থানলাভ করবে। প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আধুনিক শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য থাকবে সেটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। আবার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ- কোনও না কোনও রূপে তা যে অবস্থান করবে সেটি আমরা অনুমান করতে পারি। এই অনুমানের সূত্র ধরেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করব। এছাড়া বর্তমান যুগে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারের কতটা প্রাসঙ্গিকতা আছে তারও অনুসন্ধান করা হবে।

১.৭ গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

নির্মীয়মাণ গবেষণাকার্যটি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সাহায্যলাভের জন্যে নানা গ্রন্থাগার ব্যবহার করা হবে। এগুলির মধ্যে প্রধান গ্রন্থাগারগুলি হল- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রভৃতি। ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্যে যে সমস্ত

প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করা হয়েছে তাদের নাম হল শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ এবং শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়। সংস্কারবিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। গবেষণা-সন্দর্ভটি চলিত বাংলা ভাষায় লেখা হবে এবং এজন্যে আধুনিক বানানবিধি অনুসরণ করা হবে। গবেষণা-সন্দর্ভটিতে প্রতি অধ্যায়ের শিরোনামে কালপুরুষ ১৬ মাত্রাকৃতি রাখা হবে। মূল প্রবন্ধ ও পাদটীকায় এই মাত্রাকৃতি হবে যথাক্রমে ১৪ ও ১২। সন্দর্ভটির মূলভাগে মুদ্রিত উভয় পঙ্‌ক্তির মাঝে ১.৫ করে ব্যবধান রাখা হবে। এখানে মূল অংশে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এবং পাদটীকায় বিস্তৃত উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হবে। প্রয়োজন অনুসারে কখনও মূল অংশ ও কখনও বা পাদটীকায় আকরস্থান উল্লিখিত হবে। গ্রন্থপঞ্জিতে MLA পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রন্থগুলির নাম বর্ণক্রমানুসারে সাজানো হবে। এখানে মূল গ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থের সূচী পৃথক্‌ভাবে সজ্জিত করা হবে। গবেষণাকর্মের শেষে কয়েকটি নির্দেশিকা প্রদান করা হবে।

১.৮ গবেষণাকর্মের অধ্যায়বিভাজন (Division of Chapters):

সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভটিকে প্রধানত ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভূমিকা ভাগটিকে প্রথম অধ্যায়রূপে গণ্য করা হবে যার মধ্যে গবেষণা-পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্থানলাভ করবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হিসাবে থাকবে গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র ও আধুনিক জীবনযাত্রায় উপনয়ন-নামক শিক্ষাসংস্কারের বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা। চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়রূপে গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র ও আধুনিক জীবনযাত্রায় বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পঞ্চম

অধ্যায়ে গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র ও আধুনিক জীবনযাত্রায় সমাবর্তননামক শিক্ষাসংস্কারের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ষষ্ঠ অধ্যায় তথা উপসংহার অংশে পূর্ববর্তী সকল অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার ও নূতন দিগ্‌দর্শন সন্নিবিষ্ট করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:
কল্পসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২.১ বেদাঙ্গ সাহিত্যে কল্পসূত্রের স্থান:

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব- এই চারটি বেদের প্রত্যেকটির সংহিতা বা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্- এই চার শ্রেণীর সাহিত্য নিয়ে বৈদিক সাহিত্য। এই বৈদিক সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল ষড়্বেদাঙ্গ- যাদের নাম হল শিক্ষা, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প। এই বেদাঙ্গসমূহের অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ বেদাঙ্গ হল কল্প। কল্প শব্দটির মূলে রয়েছে 'ক্‌৯প্' ধাতু। কল্প শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যার দ্বারা যাগ প্রয়োগকল্পিত অর্থাৎ সমর্থিত হয়। বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের নিয়মকানুন বিষয়ে বিশদভাবে জানতে গেলে কল্প নামক বেদাঙ্গের জ্ঞান অপরিহার্য, কারণ এই কল্পশাস্ত্রের মধ্যেই বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে বৈদিক কর্মানুষ্ঠান তথা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মকানুন নির্দেশ করতে কল্প নামক বেদাঙ্গ সহায়তা করে থাকে। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য তাঁর '*ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকাতে*' বেদাঙ্গ বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে কল্প শব্দের অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, যে বেদাঙ্গ শাস্ত্রে যাগের প্রয়োগ সমর্থিত হয় তাই হল কল্প।[১] বিষ্ণুমিত্র রচিত 'ঋক্‌প্রাতিশাখ্য বর্গদ্বয়বৃত্তির' একস্থানে কল্প শব্দটির সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বেদবিহিত যাগাদি কর্মসমূহের আনুপূর্বিক বা ক্রমানুসারী প্রয়োগ ব্যবস্থাপক শাস্ত্রই হল কল্প।[২]

---

[১] 'কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্র' ঋ. ভা

[২] 'কল্পো বেদবিহিতানাং কর্মণামানুপূর্বেণ কল্পশাস্ত্রম্।' ঋ.বর্গ

এই যজ্ঞ বা যাগ[১] বলতে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগকেই বোঝানো হয়। মানুষের কর্ম সম্পাদনের জন্য দেবতার দুটি হাতই বিশেষ সহায়ক। সেই কারণেই হয়তো *'পাণিনীয়শিক্ষাতে'* বেদপুরুষের হাত হিসেবে কল্পের কথাই বলা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে যাগাদি কর্মসম্পাদন তথা বেদমন্ত্রসমূহের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কল্প নামক বেদাঙ্গেরই সহায়তা প্রয়োজন।

বেদমন্ত্রসমূহের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কল্পশাস্ত্রকে ব্রাহ্মণেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা হয়। কারণ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কল্পশাস্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের বিবরণ বহু বিস্তৃত এবং বহু আখ্যায়িকাসমৃদ্ধ। সেই কারণেই ব্রাহ্মণের এই বিপুলায়তন কর্মকাণ্ডের বিবরণ বর্জন করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিধি ও বিধানকে সংক্ষিপ্ত করে মনে রাখার জন্যই সূত্রাকারে কল্পশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। শ্রীঅনির্বাণ তাঁর লিখিত *'বেদমীমাংসা'* নামক গ্রন্থে বলেছেন যে- 'যজ্ঞভাবনা ব্রাহ্মণে বিবৃতধর্মী বলে ছড়ানো, আর কল্পসূত্রে তা প্রয়োগের অনুরোধে সংক্ষিপ্ত আকারে গোছানো'।[২] এই বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিত Winternitz তাঁর 'A History of Indian literature' গ্রন্থে বলেছেন যে ''Ritual (Kalpa), which constitutes the chief contents of the Brāhmaṇas, is then the first Vedāṅga to receive systematic treatment in special manuals, the so-called Kalpasūtras. They arose out of the need for compiling the rules for the sacrificial ritual in a shorter, more manageable and connected form for the practical purposes of the priests.''[৩] সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে সর্বতোমুখী ভাবের

---

[১] 'দ্রবং দেবতা ত্যাগঃ।' কা. শ্রৌ ১/২/২

[২] বেদমীমাংসা, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৩

[৩] Vide.'A History of Indian Literature,' vol. I, pt. I, C.U. ed.1962, p. 237

প্রকাশই সূত্ররচনার বৈশিষ্ট্য। সূত্রাকারে রচিত এই কল্পশাস্ত্রই কালক্রমে এক বিশাল সূত্রসাহিত্যর এবং সূত্রযুগের সূচনা করে। এই সূত্রযুগই বৈদিক সাহিত্যের শেষ যুগ।

এই কল্পসূত্রগুলি চার শ্রেণীর হয়ে থাকে- শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র। এদের মধ্যে প্রধান দুটি হল- শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিহিত ও বিবৃত শ্রৌত যাগের বিধি, নিয়মাদি যে সমস্ত সূত্রে গ্রথিত হয়েছে সেই সমস্ত সূত্রকে বলা হয় শ্রৌতসূত্র। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উল্লিখিত হোম, ইষ্টি, পশু, সোম ও সত্র- এই পাঁচ শ্রেণীর যজ্ঞ এবং এদের অন্তর্গত প্রকৃতিযাগ অর্থাৎ প্রধান যাগ এবং বিকৃতিযাগ অর্থাৎ অপ্রধান যাগের বিধান শ্রৌতসূত্রসমূহে পাওয়া যায়। এই শ্রৌতসূত্রসমূহে প্রাচীন ভারতের যজ্ঞানুষ্ঠান পদ্ধতির একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রৌতসূত্রে সর্বমোট চোদ্দটি শ্রৌতযজ্ঞের বিধান আছে, তাদের মধ্যে সাতটি হবির্যজ্ঞ এবং সাতটি সোমযজ্ঞ। এই হবির্যজ্ঞগুলি হল অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, আগ্রহায়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ ও সৌত্রামণী। অন্যদিকে সাতটি সোমযজ্ঞ হল অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম। সুতরাং বলা যেতে পারে যে এই সব শ্রৌতযাগাদির বিষয় নিয়ে শ্রৌতসূত্রগুলি রচিত হয়েছে এবং অধিকাংশ স্থলেই শ্রৌতসূত্রটি যে যে বেদের সঙ্গে জড়িত সেই সেই বেদের ঋত্বিক্ বা পুরোহিতদের কর্মগুলিকেই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত করেছে। যেমন, *ঋগ্বেদীয় 'আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র'* প্রধানত হোতা ও হোতৃগণান্তর্গত ঋত্বিক্দের যজ্ঞকর্মগুলির উপরই জোর দিয়েছে। আবার *শুক্লযজুর্বেদের 'কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র '* গ্রন্থে মূলতঃ অধ্বর্যু ও অধ্বর্যুগণান্তর্গত ঋত্বিক্দের কাজের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। এইভাবেই প্রত্যেক বেদের সঙ্গে জড়িত শ্রৌতসূত্রগুলি সেই সেই বেদের সঙ্গে জড়িত ঋত্বিক্ বা পুরোহিতদের কর্মগুলিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছে। শ্রৌতকর্মের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে

মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীঅনির্বাণ তাঁর *বেদমীমাংসা* গ্রন্থে বলেছেন যে -''ব্রাহ্মণ অপৌরষেয় শ্রুতি, তাই তার মাঝে শ্রৌতকর্মই প্রধান। শ্রৌতকর্মের মূল লক্ষ্য হল নিঃশ্রেয়স, আর স্মার্তকর্মের অভ্যুদয়। নিঃশ্রেয়সের সাধনাকে অভ্যুদয়ের উদ্দেশেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাতে শ্রৌতকাম্যকর্মের উৎপত্তি। তবে এগুলোকে পতঞ্জলির ভাষায় মূল লক্ষ্যের 'উপসর্গ' বলা যেতে পারে। কল্পসূত্রের অধিকার স্বভাবতই ব্রাহ্মণের চাইতে বিস্তৃত, তাতে নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়-দুয়েরই কথা আছে।''[১]

এবার বলা যাক গৃহ্যসূত্রের কথা। যেখানে গৃহস্থের করণীয় সংস্কার ও যাগযজ্ঞাদি লিপিবদ্ধ করা আছে সেই সমস্ত সূত্রকে বলা হয় গৃহ্যসূত্র। এই সূত্রে সামাজিক সকল মানুষের জীবনে তাঁর জন্মের পূর্বে গর্ভাধান থেকে মৃত্যুর পর প্রেতকৃত্য পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান এবং তার যে নিয়মকানুন তা বর্ণিত আছে। ব্রহ্মচর্য সমাপ্তির পর গৃহস্থের পক্ষে অবশ্যপালনীয় যজ্ঞগুলির বিধানও গৃহ্যসূত্রেরই বিষয়বস্তু। এই যজ্ঞগুলিকে 'পাকযজ্ঞ' বলা হয়। এই 'পাকযজ্ঞ' সাত প্রকারের। যথা- পিতৃশ্রাদ্ধ, পার্বণশ্রাদ্ধ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, শ্রাবণীযজ্ঞ, আশ্বযুজী যজ্ঞ, আগ্রহায়ণী যজ্ঞ এবং চৈত্রী যজ্ঞ। এছাড়াও এই গৃহ্যসূত্রের মধ্যে গৃহস্থের করণীয় পঞ্চমহাযজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ- এই পাঁচ প্রকারের যজ্ঞের কথাও বলা আছে।

গৃহ্যসূত্রের সমতুল্য অপর এক কল্পসূত্র হল ধর্মসূত্র। এই 'ধর্ম' কথাটির প্রকৃত অর্থ হল- 'যা আমাদের ধারণ করে থাকে'। অর্থাৎ সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম বা কর্তব্য যেখানে ব্যক্ত করা আছে তাই হল ধর্ম। এই কারণেই এই কল্পসূত্রে যাগধর্মমূলক এবং

[১] বেদমীমাংসা,১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৯৭৫, পৃঃ ২৬৩, পাদটীকা নং-১১১১

যাগধর্মনিরপেক্ষ- এই দুপ্রকারেরই বিধিনিয়মাদি লিপিবদ্ধ আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্বর্ণ এবং চার আশ্রম সংক্রান্ত বিধিনিয়মও এই সূত্রে লিপিবদ্ধ আছে। গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই একইরকম পাওয়া যায়। তবে গৃহ্যসূত্রের তুলনায় ধর্মসূত্রের বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। যেমন গৃহ্যসূত্রের ন্যায় ধর্মসূত্রগুলিতেও বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংক্রান্ত বিধিনিয়মাদি পাওয়া যায়। তবে গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে এই ধর্মসূত্রের একটি পার্থক্য হল- উপরি-উক্ত বিষয়গুলির অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত দিকেরই বিধান গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু ধর্মসূত্রে কর্তব্য, অকর্তব্য এবং এগুলির করণে যে সুফল এবং অকরণে যে কুফল বা প্রত্যবায়- তার বর্ণনা করা আছে। এই কারণে ধর্মসূত্রের অপর নাম 'সাময়াচারিকসূত্র'। বস্তুত সামাজিক আচার-আচরণই সমাজস্থিতির মূল। এই ধর্মসূত্রগুলিকে স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের পূর্বরূপ বলে ধরা হয়। এই সূত্রের বিষয়বস্তু হল– বর্ণাশ্রমধর্ম, সামাজিক আচার-বিচার, কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি। শ্রীঅনির্বাণের মতে, যা আর্যসমাজের বর্ণ ও আশ্রম-ব্যবস্থাকে ধরে রাখে তাই হল ধর্ম। তিনি তাঁর বেদমীমাংসা গ্রন্থে ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন যে ''বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়াই সময় এবং আচারের লক্ষ্য।''[১]

এই তিন প্রকার সূত্র ছাড়াও অপর এক সূত্র হল শুল্বসূত্র। 'শুল্ব' শব্দের অর্থ হল পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত রজ্জুখণ্ড। বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞবেদী নির্মাণকালে ভূমির পরিমাপ এবং আকার নির্ধারণের জন্য অর্থাৎ বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণাকৃতি প্রভৃতি আকার নির্ধারণের জন্য যে সমস্ত প্রণালী অবলম্বন করা হত, তা শুল্বসূত্রেই লিপিবদ্ধ আছে। এই শুল্বসূত্রের সঙ্গে শ্রৌতসূত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কারণ এই শ্রৌতসূত্রে বর্ণিত

[১]বেদ মীমাংসা, পৃঃ ২৬৪, পাদটীকা নং-১১১৭

যজ্ঞসমূহের ভূমির পরিমাপ ও যজ্ঞবেদী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করতে গেলে শুল্বসূত্রের উপরই নির্ভর করতে হয়। বৈদিকযুগে ভারতীয়দের জ্যামিতিশাস্ত্র-জ্ঞানের নিদর্শনরূপে ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে শুল্বসূত্রের স্থান গুরুত্বপূর্ণ।

অবশেষে বলা যেতে পারে যে শ্রৌতসূত্র ও কল্পসূত্রে বৈদিক যাগযজ্ঞে নিরত মানুষদের, গৃহ্যসূত্রে গার্হস্থ্যাশ্রমবাসী ব্যক্তিদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, বিধি-নিয়ম এবং ধর্মসূত্রে ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতিতে যুক্ত নাগরিকদের কথাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে এই সমস্ত প্রকারের সূত্রসাহিত্য বা এককথায় সমগ্র কল্পসূত্রসাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জীবনযাত্রার ইতিহাসে অমূল্য এবং অপরিহার্য আকর। বৈদিক ধর্ম তথা যাজ্ঞিক, সামাজিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক দিক এমনকী বৈজ্ঞানিক দিক দিয়েও দেশী-বিদেশী আধুনিক পণ্ডিত ও গবেষকগণ কল্পসূত্রের মহত্ত্ব বা গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন।

২.২ কল্পসূত্রে গৃহ্যসূত্রের স্থান:

আগেই বলা হয়েছে- যেখানে গৃহস্থের করণীয় সংস্কার ও যাগযজ্ঞাদি লিপিবদ্ধ করা আছে সেই সমস্ত সূত্রকে বলা হয় গৃহ্যসূত্র। বর্তমান গবেষণানিবন্ধের উপজীব্য সাহিত্য হল এই গৃহ্যসূত্র। এগুলি অন্যান্য কল্পসূত্রের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কল্পশাস্ত্রের প্রণেতা হিসেবে আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন, বৌধায়ন, কাত্যায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি ঋষিদের নাম পাওয়া যায় যাঁরা বিভিন্ন বেদের অন্তর্গত বিভিন্ন কল্পসূত্র রচনা করেছেন। যেমন *ঋগ্বেদের* অন্তর্গত *আশ্বলায়ন* ও *সাংখ্যায়ন* শ্রৌত, গৃহ্যসূত্র এবং *বসিষ্ঠ* (?) ধর্মসূত্র। *সামবেদের* অন্তর্গত *লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ন, খাদির* শ্রৌতসূত্র। *গৌতম, গোভিল, জৈমিনীয়, কৌথুমী ও খাদির* গৃহ্যসূত্র এবং *গৌতম* ধর্মসূত্র। ঋগ্বেদ ও সামবেদের কোনও শুল্বসূত্র এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত *বৌধায়ন, আপস্তম্ব, ভারদ্বাজ, সত্যাষাঢ় বা হিরণ্যকেশী, বৈখানস, বাধূল, কাঠক, মানব, বারাহ* প্রভৃতি শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র । *বৌধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী, বৈখানস* প্রভৃতি ধর্মসূত্র এবং *বৌধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী, কাঠক, মানব, বারাহ* প্রভৃতি শুল্বসূত্রও বেদের এই শাখার অন্তর্গত। *শুক্লযজুর্বেদের* অন্তর্গত *কাত্যায়ন* শ্রৌতসূত্র, *পারস্কর বা বাজসনেয়ী* গৃহ্যসূত্র এবং *মৈত্রায়ণী* শুল্বসূত্র। বেদের এই শাখার অন্তর্গত কোনও ধর্মসূত্র পাওয়া যায়নি। *অথর্ববেদের* অন্তর্গত *বৈতান* শ্রৌতসূত্র, *কৌশিক* গৃহ্যসূত্র। বেদের এই শাখাতেও কোনও ধর্মসূত্র এবং শুল্বসূত্র এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।[১] মোটামুটিভাবে এই হল চারটি বেদের উল্লেখযোগ্য গৃহ্যসূত্র সহ অন্যান্য কল্পসূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে কল্পসূত্রের অন্তর্গত গৃহ্যসূত্রগুলোতে গৃহস্থজীবনের নানা আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। পারিবারিক উৎসব উপলক্ষে ও গৃহের সদস্যদের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলে এই অনুষ্ঠানগুলিকে বলা হয় গৃহ্যকর্ম। এই গৃহ্যসূত্রের 'সূত্র' শব্দটি এসেছে সিব্ ধাতু থেকে, যার অর্থ হল একাধিক তত্ত্বকে পরস্পর সংযুক্ত করা- সিব্+স্ট্রন্। 'সিবিমুচ্যোষ্টের্ ঊ চ' (ঊণাদি৬০১)। যেমন একটি বস্ত্র নানা সূত্রের সংযোগে গঠিত হয়, তেমন এই গ্রন্থগুলিও সূত্রতুল্য নানা সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বারা গঠিত বলে এদের সূত্রগ্রন্থ বলা হয়ে থাকে।

'গৃহ্য' শব্দটির মধ্যেই গৃহ্যসূত্রের লক্ষ্য ও স্বরূপ সূচিত হয়েছে। *গোভিল গৃহ্যসূত্রের* প্রথমেই তাই উল্লেখ হয়েছে যে 'অথাতো গৃহ্যকর্মাণ্যুপদেক্ষ্যাম' (১/১/১)। এই উক্তিটির দ্বারা

[১] ভূমিকা, আ.শ্রৌ, পৃ.১৪-১৫

এটিই অনুমান করা যায় যে এখানে গৃহ্যকর্ম শব্দের অর্থ হল গৃহস্থ-আশ্রমীদের ধর্ম, কর্ম বা পত্নীর সঙ্গে করণীয় কর্মসমূহ সম্পর্কে বলা।

শ্রৌতকর্মের মতো গৃহ্যকর্মের ক্ষেত্রেও অগ্নির প্রয়োজন হয়। তবে শ্রৌতকর্মে যেমন তিনটি বিভিন্ন কুণ্ডে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই তিনটি অগ্নি প্রজ্বলিত করার প্রয়োজন পড়ে, গৃহ্যকর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি অগ্নিই যথেষ্ট আর তা হল গৃহ্য অগ্নি। যাকে আবসথ্য, ঔপাসন বা স্মার্ত অগ্নিও বলা হয়ে থাকে। জন্মগ্রহণ থেকে পরিণত বয়স এবং তারপর মৃত্যু পর্যন্ত সকল গৃহস্থের জীবনেই যে সকল বিশেষ ঘটনা ঘটে থাকে, প্রধানত সেই ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ করেই আয়োজন করা হয় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আর এই ধরনের অনুষ্ঠানকে ঘিরেই গৃহ্যসূত্রের আলোচনা হয়ে থাকে। প্রথমে ঋষিহৃদয়ের আপন অনুভূতি ও ঋষির ব্যক্তিত্বের কারণে যে মন্ত্র ও অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক, ভাবের ও ভাষার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের কারণে সকলের নিকটে বিশেষ আকর্ষণীয় ও অনুসরণীয় ছিল সেই মন্ত্রই পরবর্তী কালে সমাজজীবনে অনুকরণ ও অনুসরণের ফলে বিস্তার লাভ করে এবং নানা সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়। বর্তমান যুগে নানা দিক থেকে সমাজের বিরাট পরিবর্তন ঘটায় অনুষ্ঠানের প্রাচীন পদ্ধতি ও ঋষিকবিদের মন্ত্রের প্রতি সেই মুগ্ধভাব সেই আন্তরিক গভীর আকর্ষণ আমরা হারিয়েছি বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, সমাবর্তনের মতো কিছু কিছু পারিবারিক অনুষ্ঠান আমরা এখনও ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারিনি। যদিও এইসব অনুষ্ঠানের আনন্দ ও উচ্ছাস প্রকাশের ভাষা ও রীতি এখন প্রাচীন যুগের তুলনায় ভিন্ন তা সত্ত্বেও মানুষ এখনও প্রাচীন সংস্কৃতি, পরম্পরা ও আপন পূর্বপুরুষদের প্রবর্তিত ঐতিহ্যের ধারার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারেনি।

গৃহ্যকর্মের প্রাচীনতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে যেটা বলতে হয় তা হল বিভিন্ন গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে পাঠ্য এমন বহু মন্ত্রই আছে যেগুলি বিভিন্ন বেদের সংহিতা গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃত। এই মন্ত্রগুলি সংশ্লিষ্ট গৃহ্য অনুষ্ঠানকে লক্ষ্য করেই দৃষ্ট বা রচিত হয়ে থাকে। সেই কারণেই মনে করা হয় যে গর্ভাধান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি নানা গৃহ্যকর্মের প্রচলন শুরু হয়েছিল সুদূর অতীতে মন্ত্ররচনার যুগেই। ঋক্-সংহিতার দশম মণ্ডলের ৮৫ সংখ্যক সূক্তে সোম প্রমুখ দেবতাকে উদ্দেশ্য করে সূর্যা ঋষির দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও এই সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৪-১৬ সূক্তগুলিতেও পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি দেবতাকে উদ্দেশ্য করে অন্ত্যেষ্টিকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সূক্তগুলিতে উল্লিখিত মন্ত্রগুলির ভাষা অত্যন্ত মার্জিত ও অলংকৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি প্রথার উদ্ভব যে. প্রাক্-ঋগ্বেদীয় যুগেই ঘটেছিল তা নিয়ে বোধ হয় সন্দেহের তেমন কোনও অবকাশ থাকতে পারে না। সন্দেহ থাকতে পারে না যে সেই সব বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান অত্যন্ত নীরবে নিভৃতে অনুষ্ঠিত হত। বরং আনন্দ, প্রত্যাশা, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশের কিছু স্থানও সেখানে ছিল। এছাড়াও শতপথ ব্রাহ্মণের ১/৪/২/১০ এবং ১/৭/১/৩ মন্ত্রে পাকযজ্ঞের এবং ১/৭/১/৩ মন্ত্রে স্থালীপাকের কথা এবং ১১/৫/৪ এই মন্ত্রে উপনয়নের কথাও বলা হয়েছে। এই বিষয়গুলি থেকে অনুমান করা যায় যে ব্রাহ্মণযুগে গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত ক্রিয়াগুলির বিচার-বিবেচনা আরম্ভ হয়েছিল।

গৃহ্যসূত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি হল সমাজের সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা প্রাচীন অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন মৌখিক আলোচনা। এখানে উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু বৈদিক গৃহ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত নানা অনুষ্ঠানের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই বিষয়টি থেকে এটি অনুমান করা

যায় যে বৈদিক আর্যেরা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে একত্র বাস করতেন বলেই হয়তো সমাজে অনেক গৃহ্য অনুষ্ঠানের উদ্ভব ও প্রচলন ঘটেছিল এবং পরবর্তীকালে দেশাচার ও কুলাচারের মধ্যে পরিবর্তন ঘটার কারণেই হোক অথবা অবৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানের কারণেই হোক বেদপন্থী সমাজে অনেক নূতন প্রথার আবির্ভাব হয়েছিল। যেহেতু লেখার কোনও উপকরণ তখন ছিল না, তাই সেই অনুষ্ঠান এবং তার বিধি প্রথমে মুখে মুখেই প্রচারিত হত ও স্মৃতিতে ধরে রাখা হত। সেই কারণেই হয়তো *পারস্কর গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে, বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেই সেই গ্রামে যে প্রথা প্রচলিত আছে তাকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে হবে।[১] এছাড়া 'সীমন্তোন্নয়ন' অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গেও *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে সন্তানবতী সধবা নারী যে উপদেশ দেবেন তা প্রমাণ বলে গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।[২]

গৃহ্যসূত্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সাধারণত গৃহ্য অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে সম্পন্ন করতে হয়। এই গৃহ্য অনুষ্ঠান আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই অনুষ্ঠানগুলি হল বিবাহ, সন্তানের জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত গর্ভসঞ্চারের জন্য অনুষ্ঠেয় কর্ম, গর্ভাধানের কয়েক মাস পরে পুত্রলাভের জন্য করণীয় 'পুংসবন', 'পুংসবনের' কয়েক মাস পরে অনুষ্ঠেয় 'সীমন্তোন্নয়ন' (ভাবী জননীর মাথার চুলগুলিকে দুই পাশে বিভক্ত করে দেওয়াকে উপলক্ষ করে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকেই 'সীমন্তোন্নয়ন' বলা হয়ে থাকে), সন্তানের জন্মের পর করণীয় 'জাতকর্ম', তারপর সেই সন্তানের 'নামকরণ', সন্তানকে প্রথম গৃহের বাইরে নিয়ে

---

[১] গ্রামবচনং চ কুর্যুঃ। বিবাহশ্মশানয়োর্ গ্রামং প্রবিশতাদিতি বচনাৎ। তস্মাত্তয়োর্গ্রামপ্রমাণমিতিশ্রুতেঃ। পা.গৃ ১/৮/১১-১৩

[২] ব্রাহ্মণ্যশ্চ বৃদ্ধা জীবপত্ন্যো জীবপ্রজা যদ্ যদ্ উপদিশেয়ুস্ তত্ তত্ কুর্যুঃ। আ.গৃ ১/১৪/৮

যাওয়া (নিষ্ক্রমণ) এবং তাকে প্রথম অন্নভক্ষণ করানো ('অন্নপ্রাশন), এরপর তিন বছর বয়সে মস্তক মুণ্ডিত করে শিখা ধারণ (চূড়াকরণ) এবং তারপর প্রথম শ্মশ্রুমুণ্ডনের জন্য করণীয় 'গোদান' নামক অনুষ্ঠান।

বর্তমান যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় সেই শিক্ষা গ্রহণ করার প্রচলন প্রাচীন যুগ থেকেই ছিল। প্রাচীনকালে বিদ্যালয় বলতে গুরুর গৃহকেই বোঝানো হত এবং এই গুরুগৃহ থেকেই শিষ্যকে আবাসিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। বালককে গুরুগৃহে নিয়ে যাওয়ার সময় যে অনুষ্ঠান হত তার নাম 'উপনয়ন'। এরপর গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষালাভ শুরু করবার জন্য যে অনুষ্ঠান করা হত তাকে বলা হত 'উপাকর্ম'। বছর শেষে শিক্ষার সমাপ্তিসূচক যে অনুষ্ঠান করা হত তাকে বলা হত 'উৎসর্জন' বা 'উৎসর্গ'। অবশেষে যে দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা শেষে বালক যুবক হয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন সেই অনুষ্ঠানকে বলা হত 'সমাবর্তন'। গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-সম্পর্কিত এই অনুষ্ঠানগুলির কথাও গৃহ্যসূত্রসমূহে উল্লেখ করা ছিল।

অবশেষে বলা যেতে পারে যে কল্পসূত্রের অন্তর্গত গৃহ্যসূত্রের মুখ্য ও সর্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ বিষয় হল সামাজিক জীবনের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য দান। প্রাচীন হিন্দু জীবনের রূপরেখা গৃহ্যসূত্রে যে ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই ভাবে আর কোথাও পাওয়া যায় না বলেই মনে করা হয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গৃহ্যসূত্রের উপযোগিতা আছে। গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত মানুষের জীবনের যে ঘটনাবলী আছে তার থেকেই বোঝা যায় যে এই গৃহ্যসূত্রগুলির দ্বারাই মানুষের জীবনের জীবনবৃত্ত সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়ে থাকি। এখানে উল্লিখিত গৃহ্যকর্মগুলি মানুষের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই গৃহ্যসূত্রসমূহে

যে সমস্ত গৃহ্যকর্মের উল্লেখ আছে সেগুলিকে আমাদের জীবনের দুটি মহত্ত্বপূর্ণ অংশ দিয়ে নির্দেশ করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি অংশ হল হল শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের কাল থেকে আরম্ভ করে সমাবর্তন পর্যন্ত আর অপর অংশটি হল বিবাহ থেকে শ্রাদ্ধকর্ম পর্যন্ত। এগুলি ছাড়াও প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন আহুতি, মাসে মাসে কৃত্য বলিকর্ম, প্রতিদিন আচরণীয় বলিকর্ম এবং সর্পবলি প্রভৃতি বার্ষিক কর্মগুলির উল্লেখও এখানে আছে। এছাড়াও গৃহনির্মাণ কর্মে ভূমিশোধন, গৃহনির্মাণ বিধি, স্তম্ভস্থাপন বিধি প্রভৃতির কথাও এখানে বলা হয়েছে। তাছাড়াও মানুষের গার্হস্থ্য জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত নিবারণের জন্য যে আভিচারিক মন্ত্র আছে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুত্রের রোগ নিবারণ কল্পে অভিচারমন্ত্র, পত্নী পরপুরুষগামী হলে তা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য অভিচারমন্ত্র, চঞ্চল দুষ্ট ভৃত্যকে বশীভুত করে রাখার জন্য অভিচারমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্র যা একজন মানুষের গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে প্রয়োজন তাদেরও এই গৃহ্যসূত্রগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায়শ্চিত্ত কর্ম এবং অভিমন্ত্রণ অর্থাৎ যাত্রাকালে এবং প্রত্যাবর্তন কালে মাঙ্গলিক মন্ত্রপাঠ, পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহদান কল্পে অভিমন্ত্রণ, বিচারালয়ে বা সভা সমারোহে নিজের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ এই সমস্ত কিছু এই গৃহ্যসূত্র গুলোতে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

‘সংস্কার’ শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। বৈশেষিক দর্শনে সংস্কার বলতে স্বীকৃত চব্বিশটি গুণের একটিকে বোঝায়। অন্নংভট্ট তাঁর *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে স্পষ্টভাবে রূপ থকে শুরু করে সংস্কার পর্যন্ত চব্বিশটি গুণের উল্লেখ করেছেন। রূপরসাদি চতুর্বিংশতি গুণের তালিকায় সকলের শেষে সংস্কারের স্থান। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব,

সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার এই চব্বিশটি গুণপদবাচ্য।[১]

সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কার শব্দটি বহু ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। কালিদাসের *রঘুবংশ* মহাকাব্যে সংস্কার বলতে শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।[২] আবার *কুমারসম্ভবে* আমরা ব্যাকরণশুদ্ধি অর্থেও এই সংস্কার শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই।[৩]

স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহৃত সংস্কার শব্দটি আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কার বলতে এখানে আচার-অনুষ্ঠানমূলক কর্মকেই বোঝানো হয়েছে। নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে সেই কর্ম দুরকম। যে কর্ম না করলে প্রত্যবায় বা পাপ হয় তাকেই শাস্ত্রে নিত্যকর্ম বলা হয়েছে। যেমন, ত্রিবর্ণের জন্য নিত্যকর্ম হল সন্ধ্যাবন্দনা। অন্যদিকে নৈমিত্তিক কর্ম তাকেই বলে যা বিশেষ নিমিত্ত উপস্থিত হলেই অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়ে থাকে। যেমন- পুত্র জন্মগ্রহণ করলে জাতেষ্টি, প্রিয়জনের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান- এ সবই হল নৈমিত্তিক কর্ম। সংস্কার, পূজা, ব্রত, শ্রাদ্ধভেদে নৈমিত্তিক কর্ম বহুধা-বিভক্ত।

'সংস্কার' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল- 'সম্' উপসর্গপূর্বক 'কৃ' ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ্' প্রত্যয়। "সম্পরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে" (লঘু. সি. কৌ.৬/১/১৩৭) এই পাণিনীয় সূত্র দ্বারা ভূষণ অর্থে 'সুট্' আগমে সংস্কার শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সংস্কার শব্দের অর্থ হল– সংস্করণ, পরিষ্করণ, বিমলীকরণ বা বিশুদ্ধীকরণ। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যার মৃত্যু হয়েছে

---

[১] তর্ক. সং ৪

[২] নিসর্গসংস্কারবিনীত ইত্যসৌ নৃপেণ চক্রে যুবরাজশব্দভাক্ । রঘু ৩/৩৫।

[৩] সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী তয়া স পুতশ্চ বিভূতিশ্চ। কু.স. ১/২৮

তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ যে জন্মগ্রহণ করে তার মৃত্যুও হয় এবং মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়- এই হল জন্মান্তরবাদের মূল কথা। অতএব অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করার সময় শোক করা উচিত নয়। *গীতাতে* এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।" (গীতা ২/২৭)। মানুষের নৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শাস্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট সংস্কারের দ্বারা ব্যক্তিকে সংস্কৃত করার আবশ্যকতা আছে। জীবের জন্ম জন্মান্তরে সঞ্চিত নিকৃষ্ট কর্ম সংস্কারের দ্বারাই দূরীভূত করা যায়। সংস্কার শব্দের অর্থ হল দোষের পরিমার্জন করা। সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য হল জীবের দোষ এবং ত্রুটিগুলি শুধরে নিয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের যোগ্য তৈরি করা। সংস্কার মানুষকে পাপ এবং অজ্ঞান থেকে দূরে রেখে আচার, বিচার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা সংযুক্ত করে, অতএব সংস্কার সম্পন্ন করা নিতান্ত অপেক্ষিত। সংস্কারের দ্বারাই একজন ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক যে মলিনতা সেটির নিবারণ করা যায় এবং আধ্যাত্মিক পূর্ণতারও প্রাপ্তি সম্ভব হয় যা মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। ভারতীয় সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে যে মানুষের একবার মাতার গর্ভ থেকে জন্ম হয় এবং দ্বিতীয়বার জন্ম হয় উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা। এই কারণে যাদের বৈদিক সংস্কার হয় তাদের দ্বিজ বলা হয়ে থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র- এদের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণকে দ্বিজ বলে। এই তিন বর্ণের মানুষেরা গর্ভাধান থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত সংস্কার আছে সব সংস্কার কর্মই বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা করে থাকেন।[১]

[১] যাজ্ঞ.সং ১/১০

মহর্ষি ব্যাস প্রথম থেকে যে নয়টি সংস্কারের কথা বলেছেন অর্থাৎ গর্ভাধান থেকে কর্ণবেধ পর্যন্ত যে নয়টি সংস্কারের কথা *ব্যাস সংহিতায়* বলা হয়েছে,তার মধ্যে বিবাহ ছাড়া আর সমস্ত সংস্কারই স্ত্রীলোকেরা অমন্ত্রক অবস্থায় করে কিন্তু শূদ্ররা বিবাহ এবং বাকি নয়টি সংস্কারই অমন্ত্রকভাবে করে থাকে।[১]

আচার্য যাজ্ঞবল্ক্যও বলেছেন যে স্ত্রীর নয়টি সংস্কার অমন্ত্রক সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিবাহ মন্ত্রের সঙ্গেই সম্পন্ন করা দরকার।[২]

২.৩ সংস্কারের প্রকারভেদ:

সংস্কারের সংখ্যাবিষয়ে গৃহ্যসূত্রকার, ধর্মসূত্রকারদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কার হল এগারোটি- বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও অন্ত্যেষ্টি। *শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কার হল বারোটি- বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সূতিকা গৃহের সংস্কার, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও শ্রাদ্ধ। *গোভিল গৃহ্যসূত্র ও খাদির গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কার হল দশটি– বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তকরণ, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামধেয়করণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং সমাবর্তন বা গোদান। *জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কার হল বারোটি– বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তকরণ, জাতকর্ম, নামকর্ম বা নামকরণ, প্রাশনকর্ম বা অন্নপ্রাশন, চৌড় অর্থাৎ চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও শ্রাদ্ধ। *পারস্কর গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কার হল তেরোটি-

---

[১] নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তা মন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ। বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রাস্যামন্ত্রতো দশ। ব্যাস. সং ১/১৫,১৬

[২] তুষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়াঃ স্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ। যাজ্ঞ. সং আচারাধ্যায় ১/১৩

বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কেশান্ত, উপনয়ন, সমাবর্তন এবং শ্রাদ্ধ। *বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কারের সংখ্যা এগারো- বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, উপনিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন। *হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কারের সংখ্যা বারোটি- বিবাহ, সীমন্তোন্নয়ন, পুংসবন, জাতকর্ম, মেধাজনন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপাকরণ, উৎসর্জন, উপনয়ন ও সমাবর্তন। *বৈখানস গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কারের সংখ্যা সতেরোটি– পাণিগ্রহণ, নিষেক, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, বিষ্ণুবলি, জাতকর্ম, উত্থানবিধি, নামকরণ, বর্ষবর্ধন, অন্নপ্রাশন, প্রবাসাগমন, পিণ্ডবর্ধন, চৌলক, উপনয়ন, বেদপারায়ণাঙ্গভূত সংস্কার, উপাকর্ম এবং সমাবর্তন। *বারাহ গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কারের সংখ্যা আটটি- বিবাহ, পুংসবন, জাতকর্ম, নামকরণ, পুত্রাভিমর্শন, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন ও উপনয়ন। *আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রে* সংস্কারের সংখ্যা এগারোটি। সেগুলি হল - বিবাহ, সীমন্তোন্নয়ন, পুংসবন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চৌল, গোদান, উপনয়ন, সমাবর্তন ও মাসিক শ্রাদ্ধ। *মানব গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কারের সংখ্যা হল দশটি। সেগুলি হল- বিবাহ, গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, চূড়াকরণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, সমাবর্তন ও শ্রাদ্ধ। *কাঠক গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সংস্কারের সংখ্যা বারোটি। সেগুলো হল- বিবাহ, গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, পুংসবন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন, সমাবর্তন, উপাকর্ম, শ্রাদ্ধ। *কৌশিক গৃহ্যসূত্রে* সংস্কারের সংখ্যা আটটি বলা হয়েছে। সেগুলি হল- বিবাহ, মধুপর্ক, জাতকর্ম, মেধাজনন, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন ও অন্ত্যেষ্টিকর্ম। *গৌতম ধর্মসূত্রে* সংস্কারের সংখ্যা বলা হয়েছে চল্লিশ। এগুলি হল- গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চৌল, উপনয়ন, বেদের চার ব্রত, স্নান (সমাবর্তন), বিবাহ (সহধর্মচারিণীসংযোগ), পঞ্চমহাযজ্ঞ

(দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ), সপ্তবিধ পাকযজ্ঞ (তিন অষ্টকা, পার্বণশ্রাদ্ধশ্রাবণী, আগ্রহায়ণী, চৈত্রী ও আশ্বযুজী), সপ্তবিধ হবির্যজ্ঞ (অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী) এবং সাত প্রকার সোমযাগ (অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, বাজপেয় ও আপ্তোর্যাম)।[১] এই সংস্কারগুলিকে গৌতম স্বীকার করেছেন ঠিকই, কিন্তু এদের বিশদ কোনও বিবরণ তিনি তাঁর ধর্মসূত্রে করেননি। *আপস্তম্ভ ধর্মসুত্রে* সংস্কার হল চারটি। যথা- উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অনুসারে সংস্কার হল চারটি। সেগুলি হল- উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ।

২.৪ বিবিধ সংস্কার সমূহের বিবরণ :

২.৪.১ বিবাহ সংস্কার:

সংসার এবং সমাজকে রক্ষার ক্ষেত্রে বিবাহ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। বিবাহ শব্দটি "বি" উপসর্গ পূর্বক বহ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে যার তাৎপর্য হল বিশেষ ভাবে বহন করা। সুতরাং বিবাহ হল এক শাস্ত্রীয় পরম্পরা যার দ্বারা স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। ফলস্বরূপ দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ স্ত্রী এবং পুরুষ সম্পূর্ণ জীবন একজন অপরজনকে বিশেষভাবে বহন করে চলে। বিবাহ এমন এক বন্ধন যার দ্বারা দুটি আত্মার শাশ্বত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। দুটি হৃদয়ের একীকরণ তথা দ্বৈতকে মুছে ফেলে অদ্বৈতের দিকে অভিগমন করা এই বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

[১]গৌ. ধর্মসূত্র ১/৮/১৪-২৪

চূড়াকরণ, উপনয়ন, কেশান্ত অর্থাৎ গোদান কর্ম এবং সীমন্তোন্নয়ন-এই চারটি সংস্কারের মতো বিবাহ সংস্কারও ঘরের বাইরে মণ্ডপ তৈরি করে অগ্নিস্থাপন করে করা হয়ে থাকে। এই অগ্নিস্থাপন কর্ম গোময় লেপন করে, বালুকায় রেখাকরণ করে, উৎকর নিরসন করে, জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করে করা হয়ে থাকে।[১] বিবাহের অনুষ্ঠান করতে হয় সূর্যের উত্তরায়ণের অন্তর্গত যে কোনও মাসের শুক্লপক্ষে শুভ এক দিনে।[২] *পারস্কর গৃহ্যসূত্র* অনুসারে সূর্যের উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে শুভদিনে অনূঢ়া কন্যার গৃহ্যশাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে পাণিগ্রহণ করতে হবে। উত্তরা থেকে আরম্ভ করে তিন তিন নক্ষত্রে যেমন- উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এবং অশ্বিনী নক্ষত্রে পাণিগ্রহণ কর্ম করতে হবে। কারণ এই সময় পাণিগ্রহণ কর্ম শুভ বলে মনে করা হয়। এছাড়াও স্বাতী, মৃগশিরা এবং রোহিণী নক্ষত্রে পাণিগ্রহণ কর্ম করা হয়ে থাকে।[৩] *কৌশিক গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে কার্ত্তিক থেকে বৈশাখ মাসই বিবাহ করার উপযুক্ত সময়।[৪] *আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে মাঘ, ফাল্গুন, আষাঢ় মাস বিবাহের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।[৫] কৃত্তিকা. স্বাতী এবং পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র এছাড়া রোহিণী, মৃগশিরা, শ্রবণা এবং ধনিষ্ঠা এই নক্ষত্রগুলিতেও বিবাহ সংস্কার করা হয়ে থাকে।[৬]

---

[১]পা. গৃ. সূ ১/৪/৩

[২] আ. গৃ. সূ ১/৪/১, শা. গৃ. সূ ১/৫/৪, বৌ. গৃ. সূ ১/১/১৮

[৩] পা. গৃ. সূ ১/৪/৬-৭

[৪] কৌ. গৃ. সূ ১০/৭৫/৩

[৫] আপ. গৃ. সূ ১/২/১২

[৬] বার. গৃ. সূ ১০/৩-৪, মা. গৃ. সূ ১/৭/৪-৫, কা. গৃ. সূ ১৪/২/২/২, ১০

এই অনুষ্ঠান শুরু করার আগে অগ্নিতে চারটি আজ্যহোম করে নিতে হয়।[১] *কৌশিক গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে বিবাহের জন্য সম্পুট, পাকুড় বৃক্ষের শাখা, কলসী, সর্বৌষধি, দধি, জষ্ঠিমধু, বিষ্টর, অর্ঘপাত্র, মধুপর্কপাত্র, ঘুসর, পালো ইত্যাদি সামগ্রী প্রয়োজনীয়।[২]

বিবাহের প্রকারভেদ : সমাজে ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আর্ষ, গান্ধর্ব, আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস- এই আট প্রকারের বিবাহ প্রচলিত। প্রথম চার প্রকারের বিবাহে বংশের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষ পবিত্র হয়ে ওঠে। এই চার প্রকারের বিবাহ সমস্ত বর্ণের জন্য ধর্মবিহিত।[৩] ব্রাহ্মণদের কাছে এই প্রথম চারটি বিবাহ শ্রেষ্ঠ। আসুর তথা রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয় ধর্মের জন্য অনুকূল। গান্ধর্ব তথা পৈশাচ বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণের জন্য অনুকূল।[৪] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে বিবাহসমূহের মধ্যে ব্রাহ্ম, আর্ষ এবং দৈব বিবাহ প্রশস্ত হয় এবং পূর্ববর্তী বিবাহ পূর্ববর্তী থেকে অধিক উৎকৃষ্ট হয়। দৈব বিবাহ থেকে আর্ষ বিবাহ এবং আর্ষ বিবাহ থেকে ব্রাহ্ম বিবাহকে উত্তম বলা হয়। সন্তানের গুণও বিবাহের গুণ অনুসারে হয়। যে বিবাহের যেমন গুণ সন্তানও সেইরকম গুণাধিকারী হয়। *বিষ্ণু সংহিতাতে* একথাও বলা হয়েছে ব্রাহ্মবিবাহে কন্যা সম্প্রদান করলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, দৈববিবাহে স্বর্গে,

---

[১] আ.গৃ. সূ ১/৪/৩

[২] কৌ. গৃ. সূ ১০/৭৫/১

[৩] আ. গৃ. সূ ১/২৪/৪-৬, বৈখা. গৃ. সূ ৩/১/২-৩, গৌ. ধর্ম. সূ ১/৪/১২, বৌ. ধর্ম. সূ ১/১১/১০

[৪] বৈখা. গৃ. সূ ৩/১/১২,বৌ. ধর্ম. সূ ১/১১/১০-১৩

আর্য বিবাহে বিষ্ণুলোকে, প্রাজাপত্য বিবাহে দেবলোকে এবং গান্ধর্ব বিবাহে গন্ধর্বলোকে গমন করেন।[১]

২.৪.২ গর্ভাধান : যে কর্মের দ্বারা স্ত্রীর গর্ভাশয়ে গর্ভের আধান, বীর্যের স্থাপন এবং স্থিরীকরণ হয়, তাকে গর্ভাধান বলে।[২] *বৈখানস গৃহ্যসূত্রে* এই গর্ভাধান সংস্কারকে নিষেক বলা হয়ে থাকে। এই গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে ঋতুমতী হওয়ার পর দ্বাদশ বা ষোড়শ দিনে এই সংস্কার করা হয়ে থাকে।[৩] *বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে ঋতুমতী হওয়ার চতুর্থ দিনে ঋতুস্নান করার পরে এই গর্ভাধান কর্ম সম্পন্ন হবে।[৪] *আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রা* অনুসারে রজস্ প্রাদুর্ভাব হওয়ার পরে স্ত্রী স্নান করলে তারপর তার সঙ্গে সঙ্গম করতে হবে।[৫] *গোভিল গৃহ্যসূত্র* অনুসারে নববধূর পতিগৃহে আগমনের পর ঋতুমতী হয়ে যখন তার শোণিতের বেগ কমে যাবে তখনই প্রথম পতি এবং পত্নীর সঙ্গমকাল হবে।[৬] *গৌতম ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে যে ঋতুকালের সময় অথবা নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত অন্যদিনে সম্ভোগ করতে হবে।[৭]

গর্ভাধান সংস্কারের প্রক্রিয়া হল প্রথমত পতি "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতি র্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।।" (ম. ব্রা ১/৪/৬) এবং "গর্ভন্ধেহি সিনীবালি

---

[১] আপ. ধর্ম ২/৫/৩-৪, বিষ্ণু. সং ২৪/৩৩-৩৭

[২] আ.গৃ.সূ ১/১৩/১, বিষ্ণু. সং ২/১

[৩] বৈখা. গৃ. সূ ৩/৯/১০

[৪] বৌ. গৃ. সূ ১/৭/৩৭

[৫] আপ. গৃ. সূ ৩/৮/১৩

[৬] গো.গৃ.সূ ২/৫/৭,৮, খা. গৃ. সূ ২/৪/১৫

[৭] গৌ. ধর্ম. সূ ১/৫/১-২

গর্ভন্ধেহি সরস্বতি। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।।" (ম. ব্রা ১/৪/৭)- এই দুটি মন্ত্র দ্বারা পত্নীর যোনিপ্রদেশ অভিমর্শন বা স্পর্শ করার পর উভয়ে সঙ্গম করবেন।[১]

স্ত্রীর কামনা অনুসারে সঙ্গম করা উচিত। বরবধূর মৈথুনের পর বর বধূর ডান কাঁধের উপর দিয়ে হাতটি নিয়ে গিয়ে বধূর হৃদয় স্পর্শ করে "যত্তে সুসীমে হৃদয়ং হিত মন্ত্র প্রজাপতৌ। বেদাহং মন্যে তদ্ ব্রহ্ম মাহং পৌত্র মঘং নিগাম্।।" (মন্ত্র. ব্রা ১/৫/১০)- এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন।[২]

বিবাহিতা গর্ভাভিলাষিনী নারী যদি গর্ভধারণ না করেন তাহলে সেক্ষেত্রে পতি উপবাস করে চন্দ্রের সঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগকালে শ্বেতপুষ্পবিশিষ্ট কণ্টিকারী গাছের মূল উৎপাটন করে রজোদর্শনের চতুর্থ দিনে সেই বিবাহিতা নারী স্নান করে শুদ্ধ হলে রাত্রিতে জলের সঙ্গে পিষে সেই রস পত্নীর নাসারন্ধ্রে ঢেলে দেবে।[৩] *শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে পত্নীর ঋতুকালে অধ্যাণ্ড বৃক্ষের মূল গুঁড়ো করে "উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে। অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি।।" এবং "উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা। অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ।।"- এই দুটি মন্ত্রে (ঋ. বে ১০/৮৫/২১,২২) এই চূর্ণ করা দ্রব্যটি স্ত্রীর ডান নাসারন্ধ্রে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর স্ত্রীর যোনিপ্রদেশ পতি স্পর্শ করবেন।[৪]

---

[১] গো. গৃ. সূ ১/৫/৯.১০

[২] পা. গৃ. সূ ১/১১/৮,৯

[৩] পা. গৃ. সূ ১/১৩

[৪] শা. গৃ. সূ ১/১৯/১, বৌ. গৃ. সূ ১/৭/১-৪৮, বৈখা. গৃ. সূ ৩/৯/১১-১৯, মা. গৃ. সূ ১/১৪/১৫-২০, কা. গৃ. সূ ৩০/৩/৬/৫-৮

২.৪.৩ পুংসবন : পুত্রসন্তান লাভের জন্য করণীয় অনুষ্ঠান হল পুংসবন সংস্কার।[১] *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র* অনুসারে পত্নীর কল্যাণে গর্ভধারণের দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে অর্থাৎ গর্ভে সন্তান স্পন্দিত হতে থাকলে তিষ্যা অথবা পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিনে এই সংস্কার করা হয়। *শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র* অনুযায়ী পুষ্য বা শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত দিনে[২] *গোভিল* ও *খাদির গৃহ্যসূত্রানুযায়ী* যে মাসে গর্ভাধান হবে সেই মাস থেকে হিসাব করে যেটি তৃতীয় মাস তারই প্রথম পক্ষে অর্থাৎ অষ্টমীর মধ্যে এই পুংসবন নামক সংস্কার করতে হবে।[৩] নিজ বর্ণের বাছুর আছে এমন গাভীর দুধে তৈরি দধিতে এবং স্থালীপাকে রাখা দধিতে দুটি মাষকলাই এবং যব রেখে পত্নীকে সেই দধি স্বামী খাওয়াবেন। এরপর স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবেন, "কি পান করছ ?" স্ত্রী তার উত্তরে "পুত্রের জন্ম" এই কথাটি স্বামীকে স্ত্রী তিনবার বলবেন। এই ভাবেই তিন বার তিন অঞ্জলিযুক্ত দই স্ত্রীকে স্বামী খাওয়াবেন। এইভাবেই এই সংস্কার করা হয়ে থাকে।[৪] *পারস্কর গৃহ্যসূত্র* অনুযায়ী গর্ভধারণ করার পর গর্ভসংস্কাররূপ কর্মের নাম পুংসবন। এই গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী যেদিন পুরুষজাতীয় পুষ্যাদি নক্ষত্র চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেদিন স্ত্রীকে উপবাস ও স্নান করিয়ে নূতন বস্ত্র উত্তরীয় পরিধান করিয়ে বটবৃক্ষের নিম্নদেশে উৎপন্ন শাখার অগ্রভাগে মুকুলাকার পল্লবগুলিকে রাত্রিতে জল দিয়ে পিষে "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।"

---

[১] বৌ. গৃ. সূ ১/৯/১-৬, হি. গৃ. সূ ২/১/১-৮, ২/১/৩/১-১১, আপ. গৃ. সূ ৬/১৪/৯-১২, বৈখা. গৃ. সূ ৩/১১/১-৩, বার. গৃ. সূ ১৯/১-১১, কা. গৃ. সূ ৩২/৩/৮/১-৩, শঙ্খ. সং ২/১

[২] শা. গৃ. সূ ১/২০/২

[৩] গো. গৃ. সূ ২/৬/১,খা. গৃ. সূ ২/২/১৭

[৪] আ.গৃ.সূ ১/১৩/১-৪, জৈ. গৃ. সূ ১/৫

(য. বে. সং ১৩/৪) এবং "অদ্ভ্যঃ সংভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্মণঃ সমবর্ততাগ্রে। তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্যস্যদেবত্বমাজানমগ্রে।" (য. বে. সং ৩১/১৭)- এই দুটি মন্ত্র পাঠ করে গর্ভাধান সংস্কারের ন্যায় নাসারন্ধ্রে ঢেলে দেবে। কোনও কোনও আচার্যের মতে বটবৃক্ষের সঙ্গে কুশমূল এবং সোমলতার খণ্ড দিয়ে পেষণ করে নাসারন্ধ্রে দিতে হবে। ভর্তা যদি বীর্যবান পুত্র কামনা করেন, তাহলে পত্নীর কোলে জলপূর্ণ শরা বসিয়ে হাত দিয়ে গর্ভাশয় স্পর্শ করে বিকৃতি ছন্দে নিবদ্ধ "সুপর্ণোঽসি গরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তে শিরোগায়ত্রং চক্ষুর্বৃহদরথন্তরে পক্ষৌ। স্তোম আত্মা ছন্দাংস্যঙ্গানি যজুংষি নাম। সাম তে তনুর্বামদেব্যং যজ্ঞ যজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ। সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্দিবৎগচ্ছ স্বঃ পত।" (যজু. সং ১২/৪)- এই মন্ত্রটি পাঠ করবে। এইভাবেই পুংসবন সংস্কার করা হয়ে থাকে।[১]

খাদির এবং গোভিল গৃহ্যসূত্র অনুসারে নাভিদর্শন কর্মের পর সেই দিন অথবা তার পরবর্তী দিন অথবা পরবর্তী দিনের পরবর্তী দিন বৃক্ষস্বামীকে একবিংশতি যব বা একবিংশতি মাষকলাই প্রদানপূর্বক ঈশান কোণে যে কোনও বটবৃক্ষ থেকে শুঙ্গা অর্থাৎ অস্ফুটিতপত্র সপ্ত মন্ত্র পাঠ করে গ্রহণ করে পরে উপস্থাপন করবে। এই অস্ফুটিত পত্রের উভয়পার্শ্ব ফলযুক্ত থাকবে, শুষ্কপ্রায় হবে না এবং ওই পত্রে পত্রকীট থাকবে না। এরপর ওই পত্রটিকে তৃণাচ্ছাদিত করে বৈহায়সী অর্থাৎ অমরবেল বা সূক্ষ্ম জটামাংসী সংগ্রহপূর্বক তাতে রক্ষা করা হবে। অনন্তর পেষণাধার একখানি শিলা ভালভাবে ধুয়ে তাতে কোনও ব্রহ্মচারী অথবা কোনও পতিব্রতা অথবা ব্রাহ্মণবংশীয়া কোন কুমারী ঐ পত্রটিকে অনবরতভাবে পেষণ করবেন। এরপর বধূ প্রাতঃকালে উত্তরাগ্র কুশাপুঞ্জে অবস্থিত হয়ে সুস্নাতা হয়ে অগ্নির

[১] পা. গৃ. সূ ১/১৪

পশ্চিমভাগে উত্তরাগ্রপাতিত কুশাসনে পূর্বশিরা হয়ে অর্ধশয়ন করবে। পতি তার পশ্চাতে থেকে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই শুঙ্গা অর্থাৎ অস্ফুটিত পত্রের পিষ্ট গ্রহণ করে বধূর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে সেই রস প্রদান করাবেন বা আঘ্রাণ করাবেন। সেইসময় "পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননু জায়তাম্।।" (ম. ব্রা ১/৪/৯)"- এই মন্ত্র পাঠ করে পতি ইষ্ট স্মরণ করবেন। এই সংস্কারকেই বলা হয় পুংসবন সংস্কার।[১]

২.৪.৪ সীমন্তোন্নয়ন : পুংসবনের পরে গর্ভের চতুর্থ মাসে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়।[২] *গোভিল গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে গর্ভবতী হওয়ার পর চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই অনুষ্ঠান হয় এবং বধূ প্রথম বার গর্ভবতী হলেই শুধুমাত্র এই অনুষ্ঠান করতে হবে।[৩]

শুক্লপক্ষে যখন পুরুষবাচক নামের কোনও নক্ষত্রের সঙ্গে অর্থাৎ তিষ্য, পুষ্য, হস্ত ইত্যাদি নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্র যুক্ত হয়, তখন এই সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। অগ্নিতে সমিধ স্থাপন করে এই অগ্নির পশ্চিম দিকে এমনভাবে একটি মহিষের চর্ম বিছিয়ে দেওয়া হবে, যার গ্রীবাটি উত্তর দিকে এবং লোমপূর্ণ অংশটি উপর দিকে থাকে। পত্নী সেখানে উপবেশন করলে বর "দেব বর্হির্বর্ধমানং সুবীরং স্তীর্ণং রায়ে সুভরং বেদ্যস্যাম্। ঘৃতেনাক্তং বসবঃ সীদতেদং বিশ্বে দেবা আদিত্যা যজ্ঞিয়াসঃ।।" (ঋ.সং ২/৩/৪) এবং "প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো

---

[১] গো. গৃ. সূ ২/৬/২-১২, খা. গৃ. সূ ২/২/২১-২৩

[২] আ.গৃ. সূ ১/১৪/১, জৈ.গৃ.সূ ১/৭, বৌ. গৃ. সূ ১/১০/১-১৭, হি. গৃ. সূ ২/১/১/১-৩, আপ. গৃ. সূ ৬/১৪/১-৮, বৈখা. গৃ. সূ ৩/১২/১-৫, মা. গৃ. সূ ১/১৫/১, কা. গৃ. সূ ৩১/৩/৭/১-৩

[৩] গো. গৃ. সূ ২/৭/২

রয়ীণাম্।।" (ঋ.সং ১০/১২১/১০)- এই মন্ত্রগুলির দ্বারা আজ্যাহুতি দেবেন। তারপরে প্রত্যেক মন্ত্রে একটি করে আজ্যহোম করবেন। এরপর কাঁচা ফলের বিজোড়সংখ্যক গুচ্ছ বা স্তবক, তিন স্থানে সাদা এমন সজারুর কাঁটা এবং তিনটি কুশগুচ্ছ দিয়ে "ভুর্ভুবঃ স্বরোম্" (মন্ত্র. ব্রা ১/৬/৩০)- এই মন্ত্রে পত্নীর মাথার চুল আঁচড়ে তিন বার অথবা চার বার উপর দিকে তুলে দিতে হবে। কপাল ও চুলের সন্ধিস্থল থেকে মাথার পিছন দিকে চুলগুলি ছড়িয়ে দিতে হবে। এইভাবে 'সীমন্ত' অর্থাৎ কেশ 'উৎ' অর্থাৎ উপরদিকে 'নয়ন' অর্থাৎ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বলে এই কর্মের নাম সীমন্তোন্নয়ন। সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের দিন দুই জন বীণাবাদককে দিয়ে গান গাওয়াতে হবে। গানে নিজ গ্রামের নদীর নাম উল্লেখ করতে হবে এবং রাজার সম্পর্কে অথবা অন্য কোনও বীরপুরুষের সম্পর্কে গাথা গাইতে নির্দেশ দেওয়া হবে। এছাড়া যে সব ব্রাহ্মণপত্নীদের স্বামী ও সন্তান দুইই জীবিত আছেন তাঁদের পরামর্শমতো চলতে হবে। এই অনুষ্ঠানে দক্ষিণাস্বরূপ বৃষ প্রদান করা হয়ে থাকে। তারপর সমস্ত কাজের শেষে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হবে।[১]

গোভিল ও খাদির গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে প্রাতঃকালে উত্তরাগ্রভাবে পাতা রয়েছে এমন কুশাসনে বধূকে বসিয়ে আমস্তক প্লাবিত করে স্নান করাতে হবে। তারপর সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার করতে হবে। *পারস্কর গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে পত্নীকে উপবাস করে স্নান করিয়ে নূতন বস্ত্র উত্তরীয়রূপে পরিয়ে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার করা করা হয়। পরে অগ্নির পশ্চিম ভাগে পাতিত উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্বাভিমুখী করে সেই বধূকে বসাতে হবে, তার পশ্চাতে তাঁর পতিও বসবেন। এরপর যজ্ঞডুমুরের একটি গুচ্ছ এবং শলাটুর আর একটি গুচ্ছ সেই বধূর

[১] আ.গৃ. সূ ১/১৪/২-৯

আঁচলে বা শরীরের যে কোনও স্থানে বেঁধে দিতে হবে। সেই গুচ্ছদ্বয় বন্ধনকালে "অয় মূর্জাবতো বৃক্ষ ঊর্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা সূয়তাং রয়িঃ।।" (ম. ব্রা ১/৫/১)- এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। তারপর শুষ্ক কুশ দিয়ে তৈরি পিঞ্জুলীর (চিরুনি) দ্বারা সেই বধূর কেশবিন্যাস করবে। *পারস্কর গৃহ্যসূত্র* অনুযায়ী এরপর বীরতরশঙ্কু অর্থাৎ পূর্ণ পাত্র দ্বারা সুতা কাটার তর্কুকে সূত্রপূর্ণ করে 'ভূঃ' মন্ত্রে প্রথমবার, 'ভুবঃ' মন্ত্রে দ্বিতীয়বার এবং 'স্বঃ' মন্ত্রে তৃতীয়বার সীমন্তের কেশগুলি ওই পিঞ্জুলি দ্বারা উন্নীত করে দিতে হবে। এরপর 'যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতির্মহতে সৌভগায়। তেনাহ মস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজা মস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি।' (ম. ব্রা ১/৫/২)- এই মন্ত্রপাঠ করে যে শর দিয়ে বাণ প্রস্তুত হয় সেই শরের দ্বারা শোভিত মস্তকের সিঁথির মধ্যভাগ চিরে কেশগুচ্ছের দ্বারা শোভিত করবে। এরপর 'রাকা মহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা। সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়ুমুখ্যম্ ।' (ম. ব্রা ১/৫/৩)- এই মন্ত্র পাঠ করতে করতে স্থানত্রয়ে শ্বেত এরূপ শজারুর কাঁটার দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশগুলি গুছিয়ে দেবেন। তারপর ঘি দেওয়া অগ্নিতে পক্ক তিলের তণ্ডুল সেই বধূকে দেখানো হবে এবং সেই সময় পতি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তিনি ওই তিল-তণ্ডুলের মধ্যে বধূ কী দেখতে পাচ্ছেন ? তদুত্তরে বধূ বলবেন- "প্রজাং পশুং সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্টঃ্ব পত্যুঃ" (ম. ব্রা ১/৫/৫) অর্থাৎ তিনি এই তিল-তণ্ডুলের মধ্যে পুত্রপৌত্রাদি প্রজা, গো-মহিষী প্রভৃতি গৃহপশু এবং পতির দীর্ঘ জীবন- এই সমস্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছেন। এরপরে সেই দিন বধূ ওই তিল-তণ্ডুলই ভোজন করবেন এবং সেই ভোজনকালে ব্রাহ্মণীগণ বধূ যাতে বীরপ্রসবিনী হন তার জন্য মঙ্গলসূচক বাক্যে ঈশ্বরকে উপাসনা করবেন। এই সংস্কারকে বলা হয় সীমন্তোন্নয়ন।[১]

[১] গো. গৃ. সূ ২/৭/৩-১২, খা. গৃ. সূ ২/২/২৪-২৮, পা. গৃ. সূ ১/১৫/২-৯

২.৪.৫ সূতিকাগৃহের সংস্কার : রাক্ষসদের বিনাশের জন্য কাকাতনী, মচকচাতনী, কোশাতকী, বৃহতী নীল- বৃক্ষের মূলগুলি গুঁড়ো করে যে স্থানে প্রসব করানো হবে সেই স্থানে লেপে দেওয়া হয়। একেই বলা হয় সূতিকা গৃহের সংস্কার।[১]

২.৪.৬ বিষ্ণুবলি : সীমন্তোন্নয়নের পর অষ্টম মাসে বিষ্ণুবলি সংস্কার করা হয়ে থাকে। এই সংস্কারে দেবতা বিষ্ণুকে স্থাপন করার পর উত্তরীয়, বস্ত্র এবং উপবীত দান করে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের মন্ত্র দিয়ে বিষ্ণু দেবতাকে স্তুতি করা হয়ে থাকে। "কেশবায় নমঃ"- এই মন্ত্রের দ্বারা বিষ্ণু দেবতাকে স্তুতি করে দ্বাদশ কুলকে প্রণাম করে এবং পত্নীকে প্রণাম করিয়ে পূজিত সুদর্শন পাঞ্চজন্য অগ্নিতে আহুতি দিয়ে অবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা পত্নীকে প্রাশন করানো হয়।[২]

২.৪.৭ জাতকর্ম : সোষ্যন্তীহোমের পরে হয় জাতকর্ম সংস্কার। নবজাত শিশুকে উদ্দেশ্য করে যে অনুষ্ঠান হয় তাকেই বলা হয় জাতকর্ম। *শাঙ্খায়ন* এবং *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র* অনুসারে নবজাতকের মাতা ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করার আগে "প্র তে দদামি মধুনো ঘৃতস্য বেদং সবিত্রা প্রসূতং মঘোনাম্। আয়ুষ্মান্ গুপ্তো দেবতাভিঃ শতং জীব শরদো লোকে অস্মিন্ ইতি।" (আ.গৃ. সূ ১/১৫/১) "প্র তে যচ্ছামি মধুমন্ মখায় বেদং প্রসূতং সবিত্রা মঘোনা। আয়ুষ্মান্ গুপিতো দেবতাভিঃ শতং জীব শরদো লোকে অস্মিন্।" (শা. গৃ. সূ ১/২৪/৪)- এই মন্ত্র দ্বারা নবজাতকের দীর্ঘায়ু কামনা করে সুবর্ণপাত্রে স্বর্ণচূর্ণমিশ্রিত ঘৃত ও মধু খাওয়ানো হবে। যখনই সুতিকাগৃহস্থ ধাত্রী সন্তানের পিতাকে কুমারের জন্মগ্রহণের সংবাদ দেবেন তখনই পিতা

---

[১] শা. গৃ. সূ ১/২৩/১

[২] বৈখা.গৃ.সূ ৩/১৩/১-৪

নবজাতকের মাতার নাড়ীচ্ছেদন এবং স্তন্যপ্রদানাদির দ্বারা কুমারকে রক্ষার নির্দেশ দেবেন। পূর্বে শুঙ্গা যেভাবে পিষ্ট করা হয়েছে সেভাবেই ধান্যতণ্ডুল এবং যবতণ্ডুল পিষ্ট করে ওই পিষ্ট তণ্ডুল দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা নাড়ীচ্ছেদনের পূর্বেই "ইয়মাজ্ঞেদমন্নমিদমায়ুরিদমমৃতম্" (ম. ব্রা ১/৫/৮)- এই মন্ত্র পাঠ দ্বারা শিশুর জিহ্বাতে লেহন করানো হবে। তখন নাড়ীচ্ছেদনের পর স্তন্যপান করানো হবে। এই হল জাতকর্ম সংস্কার।[১] এই জাতকর্ম সংস্কার প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই নাড়ীচ্ছেদনের পর থেকে দশ দিন সেই প্রসূতি অস্পৃশ্যা থাকবে অর্থাৎ এই দশ দিন বর নিজের পত্নীকে স্পর্শ পর্যন্ত করবেন না।[২]

২.৪.৮ উত্থানবিধি: জাতকর্মের পরে দশম বা দ্বাদশ দিনে গৃহশুদ্ধির জন্য এই উত্থানবিধি অনুষ্ঠিত হয়। লৌকিকাগ্নির দ্বারা এই সংস্কার করা হয়ে থাকে। গর্ভ যোনিটিকে অরণ্যে সমারোপিত করে সঠিকভাবে রক্ষা করার পর সদ্যোজাত কুমারের সমস্ত আচার, যেমন বসা, ওঠা- এই সমস্ত বিধি লৌকিক অগ্নিতে অনুষ্ঠিত করা হয়। ক্ষৌরকর্মের পর স্নান করে শুদ্ধ হয়ে এই কর্ম করতে হয়। ধাতা এবং অন্যান্যদের যজ্ঞকল্পের ভিত্তিতে এই নবজাত কুমারকে যজ্ঞ উত্থানবিধির দ্বারা শুদ্ধ করা হয়। এই পুরো বিষয়টিকেই উত্থানবিধি বলা হয়।[৩]

---

[১] গো. গৃ. সূ ২/৭/১৮-২০,২২, খা. গৃ. সূ ২/২/৩৩-৩৫, পা. গৃ. সূ ১/১৬/১-২, জৈ. গৃ. সূ ১/৮, বৌ. গৃ. সূ ২/১/১-২২, হি. গৃ. সূ ২/১/৪/১-১৮, আপ. গৃ. সূ ৬/১৫/১-৭, বৈখা. গৃ. সূ ৩/২১/১-১৪, ৩/১৫/১-১২, কৌ. গৃ. সূ ২/১০/১৬-২৪, বার.গৃ. সূ ১/১-১০, মা. গৃ. সূ ১/১৬/১-৪, ১/১৭/১-৭, ১/১৮/১-৮, ১/১৯/১-৬

[২] গো. গৃ. সূ ২/৭/২৩

[৩] বৈখা. গৃ. সূ ৩/১৮/১-৭

২.৪.৯ নামকরণ : *শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে জাতকর্ম সংস্কারের দশ দিন পর নবজাতকের মাতা প্রসব শয্যাত্যাগ করেন। এরপর নবজাতকের পিতা ও মাতা স্নাত মস্তকে অধৌত নতুন বস্ত্র পরিধান করবেন। নবজাতক শিশুকেও অধৌত বস্ত্র পরিধান করানো হবে। এরপর নবজাতকের পিতা এই সূতিকাগৃহের অগ্নিতেই স্থালীপাক প্রস্তুত করে, শিশুর জন্মতিথি ও নক্ষত্রের অধিপতি দেবতাসমেত তিন নক্ষত্রের উদ্দেশে আহুতি দিয়ে মাঝখানে সেই নক্ষত্রের উদ্দেশে আহুতি দেবেন যাঁর অধীনে শিশুর জন্ম হয়েছে। এরপর "ত্বূ সোম মহে ভগং ত্বং যূন ঋতায়তে। দক্ষং দধাসি জীবসে।।"(ঋ. বে ১/৯১/৭)- এই মন্ত্র বলে নবজাতকের পিতা দশম আহুতি দেবেন। এইভাবে শিশুর নাম উচ্চৈঃস্বরে উল্লেখ করে, ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবচন করিয়ে, একই ভাবে প্রতিমাসে শিশুর জন্মতিথিতে পিতা আহুতি দেবেন। এক বছর অতিক্রান্ত হলে শিশুর পিতা সাধারণ গার্হস্থ্য অগ্নিতেই আহুতি দেবেন। এইভাবেই নামকরণ সংস্কার করা হয়ে থাকে।[১]

গোভিল ও খাদির গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে জন্মদিন থেকে দশ দিন বা একশত দিন অথবা এক বছর গত হলে একাদশাদি দিনে নবকুমারের নামধেয়করণ হবে। এই নামধেয়করণ কাজটি যিনি করবে তিনি অর্থাৎ পিতা বা পুরোহিত, অগ্নির পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্রে পাতিত কুশাসনে পূর্বাভিমুখ হয়ে উপবিষ্ট হবেন। কুমারের মা পরিষ্কার বস্ত্রের দ্বারা শিশুকে আচ্ছাদিত করে যিনি নামকরণ করতে প্রবৃত্ত অর্থাৎ কুমারের পিতা বা ব্রাহ্মণের দক্ষিণে এসে সেই শিশুকে পিতা বা ব্রাহ্মণকে প্রদান করবেন। শিশুটিকে চিৎ করে রেখে প্রদান করতে হবে। এরপর সেই শিশুর মাতা পিতা বা ব্রাহ্মণের পিছন দিক থেকে এসে বাম দিকে কুশের উপরে বসবেন। এরপর নামধেয়কারী কুমারকে কোলে বসিয়ে প্রথমে

[১] শা. গৃ, সূ ১/২৫/১-১১

প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করবেন পরে যে তিথিতে কুমারের জন্ম হয়েছে সেই তিথির উল্লেখ করে দ্বিতীয় আহুতি প্রদান করবেন। এরপর যে নক্ষত্রে কুমারের জন্ম হয়েছে তার উল্লেখ করে তৃতীয় আহুতি প্রদান করবেন। পরে সেই বালকের মুখে হাত দিয়ে শ্বাস স্পর্শ করে "কোঽসি কতমোঽসি এষোঽস্যমৃতোঽসি। আহস্পত্যং মাসং প্রবিশাসৌ।।" (ম. ব্রা ১/৫/১৪)- মন্ত্রটি পাঠ করবেন। এইভাবেই নামকরণ সংস্কার অনুষ্ঠিত হবে।[১] *পারস্কর গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে প্রসবদিন থেকে আরম্ভ করে একাদশ দিনে সূতিকাগৃহ থেকে সূতিকাকে বাইরে বের করে এনে শিশুর পিতা তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে শিশুর নামকরণ করাবেন। তারপর নামকরণ সংস্কার অনুষ্ঠিত হবে।[২] শিশুর প্রতিষ্ঠা কামনা করে নামকরণ করলে সেই নামটি দুই বা চার অক্ষরযুক্ত হবে। নামের আদিতে ঘোষবর্ণ হবে অর্থাৎ নামের আদিবর্ণ গুলো হবে গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, য, ব, র, ল, হ। নামের মধ্যভাগে অন্তঃস্থ বর্ণ অর্থাৎ য, র ল,ব হবে। নামের শেষ বর্ণ হবে দীর্ঘ এবং বিসর্গযুক্ত। ব্রহ্মতেজ কামনা করলে চার অক্ষরযুক্ত নাম দিতে হবে। নামগুলি কৃদন্তবিশিষ্ট হবে, তদ্ধিতান্ত হবে না। এছাড়াও বলা হয়েছে পুত্রসন্তানের নাম যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট এবং কন্যা সন্তানের নাম অযুক্ত অক্ষরবিশিষ্ট হবে। কন্যার নাম অযুগ্ম অক্ষরবিশিষ্ট হবে অর্থাৎ তিন বা সাত অক্ষর বিশিষ্ট হবে. আকারান্ত হবে এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত হতে পারে। নিত্যব্যবহার্য নাম ছাড়াও উপনয়ন হওয়ার পরে যে নামে বালক নিজের পরিচয় দিয়ে অপরকে অভিবাদন করবেন সেই অতিরিক্ত একটি নামও দেওয়ার কথা গৃহ্যসূত্রকার বলেছেন। কুমারের নামকরণ সংস্কারের পর বর্ণ অনুসারে ব্রাহ্মণকুমারের নামের শেষে শর্মা

---

[১] গো. গৃ. সূ ২/৮/৮-১৩, খা. গৃ ২/৩/৬-১৫

[২] পা. গৃ. সূ ১/১৭/১

অর্থাৎ মঙ্গলপ্রতিপাদক, ক্ষত্রিয়কুমারের নামের শেষে বর্মা অর্থাৎ শৌর্যব্যঞ্জক এবং বৈশ্য কুমারের নামের শেষে গুপ্ত অর্থাৎ ধনবত্তা-প্রতিপাদক এই শব্দগুলি যোগ করা হবে।[১] এইভাবে শিশুর নামকরণের পর যে নামটি সবার প্রথমে দেওয়া হবে সেটি প্রসূতিকে অবগত করানো হবে। নামকরণ সংস্কারের পিতা বা পুরোহিত যিনি এই সংস্কারটি করেছেন তিনি অন্য কার্য করবেন বা বিশ্রাম করবেন। গোভিল গৃহ্যসূত্র অনুসারে, শিশুর এই নামকরণের দক্ষিণা হল একটি গাভী।[২]

২.৪.১০ কর্ণবেধ : শিশুকালেই বালক-বালিকার কান বিদ্ধ করার নিয়ম প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। জন্মের পর দশম, দ্বাদশ বা ষোড়শ দিনে অথবা জন্মের পর প্রথম. সপ্তম, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ মাসে বালক-বালিকার কর্ণবেধ সংস্কার করা হয়ে থাকে। কার্ত্তিক, পৌষ, চৈত্র বা ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের শুভদিনে এই সংস্কার করা হয়ে থাকে। কর্ণবেধের সূচটি স্বর্ণনির্মিত হয় অথবা সামর্থ্য অনুসারে রূপা বা লৌহনির্মিতও হয়ে থাকে।[৩]

২.৪.১১ বর্ষবর্ধন : নামকরণের পর পুত্রের আয়ুষ্য-কামনায় এই বর্ষবর্ধন সংস্কার করা হয়ে থাকে। এই সংস্কারের দ্বারা কুমারের জন্মনক্ষত্র অনুযায়ী অর্থাৎ কুমারের যে নক্ষত্রে জন্ম সেই নক্ষত্রের যে দেবতা সেই দেবতাকে এবং ব্রাহ্মণকে পূজো করা হয়ে থাকে। যেমন কুমারের কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হলে অগ্নিকে, রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম হলে প্রজাপতিকে, মৃগশিরা

---

[১] আ.গৃ.সূ ১/১৫/৫-১০, গো. গৃ. সূ ২/৮/১৪-১৬, জৈ. গৃ. সূ ১/৯, পা. গৃ. সূ ১/১৭/২-৪, বার. গৃ. সূ ২/১-৬, মা. গৃ. সূ ১/১৮/১-৮, ১/২০/১-৬, বৌ. গৃ. সূ ২/১/২৩-৩১, আপ. গৃ. সূ ৬/১৫/৮-১১, বৈখা. গৃ. সূ ৩/২১/১-৭, বার. গৃ. সূ ২/১-৬, কৌ. গৃ. সূ ৭/৫৮/১৩-১৭, কা. গৃ. সূ ৩৪/৩/১০/২-৬, শঙ্খ. সং ২/২-৪

[২] গো. গৃ. সূ ২/৮/১৭-১৮

[৩] বৈখা. গৃ. সূ ৩/২১/৮

নক্ষত্রে জন্ম হলে সোম দেবতাকে, আর্দ্রা নক্ষত্রে জন্ম হলে রুদ্র দেবতাকে, পুনর্বসু নক্ষত্রে জন্ম হলে আদিত্য দেবতাকে, তিষ্য নক্ষত্রে জন্ম হলে বৃহস্পতিকে- এইভাবে যে নক্ষত্রে শিশুর জন্ম সেই নক্ষত্রের সেই দেবতাকে পূজো করতে হবে।[১]

২.৪.১২ নিষ্ক্রামণ : জন্ম হতে তৃতীয় জ্যোৎস্নাপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে প্রাতঃকালে নবকুমারের মস্তক পর্যন্ত আপ্লুত করে স্নান করিয়ে তারপর সূর্যাস্তের পরে (অর্থাৎ সূর্যের লাল রঙ যখন দেখা যাবে না সেই সময়) নবকুমারের পিতা পুত্র গ্রহণের জন্য তার হাত প্রসারিত করে দণ্ডায়মান থাকেন। এরপর নবকুমারের মা সেই কুমারকে পরিষ্কৃত বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে নিজের স্বামীর দক্ষিণ দিকে এসে সেই বালককে চিৎ করে শুইয়ে পিতার হাতে দিয়ে নিজে স্বামীর পিছন দিক দিয়ে এসে বামদিকে অবস্থান করবেন। পরে ওই বালক সহ পিতা "যত্তে সুসীমে" থেকে "যথা অয়ন ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধি" পর্যন্ত (ম. ব্র. ১/৫/১০-১২)- এই ঋক্ তিনটি পাঠ করবেন। তারপর পিতা সেই নবকুমারকে পুনরায় মাতার হাতে প্রদান করে তাঁর প্রয়োজন অনুসারে অন্য কাজ করবেন বা বিশ্রাম করবেন। এরপর তৃতীয় জ্যোৎস্নার পরে যে চতুর্থ জ্যোৎস্নাপক্ষ তার প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পঞ্চদশ রাত্রির যে কোনও রাত্রে সম্ভব হলে চন্দ্রোদয়ে, কুমারের পিতা দণ্ডায়মান হয়ে চন্দ্রাভিমুখ হয়ে "যদদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতম্। তদহং বিদ্বাংস্তৎপশ্যন মাহং পৌত্র মঘং রুদম্।।" (ম. ব্রা ১/৫/১৩)- এই মন্ত্র একবার পাঠ করবেন এবং অপর দুই বার অমন্ত্রক হয়ে, অবশেষে এই তিনটি অঞ্জলিযুক্ত জল ত্যাগ করবেন।[২] শিশুর জন্মের পর থেকে চতুর্থ মাসে মায়ের কোলে করে পিতা শিশুকে ঘরের বাইরে আনবেন। এইভাবে শিশুকে বাইরে এনে

[১] বৈখা. গৃ. সূ ৩/২০/১-৪

[২] গো.গৃ.সূ ২/৮/১-৭, খা. গৃ. সূ ২/৩/১-৫

পিতা "তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরত। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।।" (বাজ. সং ৩৬/২৪)- এই মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে শিশুটিকে সূর্যদর্শন করাবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সূর্যদর্শন কেবলমাত্র নিষ্ক্রামণ সংস্কারের অন্তর্গত। *শঙ্খ সংহিতাতেও* এই নিষ্ক্রামণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] *বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে* এই নিষ্ক্রামণকেই উপনিষ্ক্রমণ বলে।[২]

২.৪.১৩ চূড়াকরণ : চূড়া শব্দের অর্থ হল কেশগুচ্ছ অথবা শিখা। করণ শব্দের অর্থ হল মুণ্ডন তথা স্থাপন। যে সংস্কারের দ্বারা জন্মের পরে প্রথমবার বালকের কেশের মুণ্ডন করা হয় এবং তার মুণ্ডিত মস্তকে শিখা অর্থাৎ কেশগুচ্ছের স্থাপন করা হয় তাকে চূড়াকরণ সংস্কার বলে। *জৈমিনীয়, আপস্তম্ব, বৈখানস গৃহ্যসূত্রে* এই সংস্কারকে চৌল সংস্কার বলে।[৩] চূড়াকরণ নামক সংস্কারটি পুত্র ও কন্যা উভয়েরই হয়। *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র* অনুসারে জন্ম থেকে তৃতীয় বর্ষ বা বংশের নিয়ম অনুসারে অন্য কোনও সময়ে চৌলকর্ম করতে হবে।[৪] *বৈখানস গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে জন্ম থেকে প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ কর্ম করা হয়ে থাকে।[৫] *গোভিল গৃহ্যসূত্রতেও* বলা হয়েছে যে এই চূড়াকরণ কার্য বালক বা বালিকার তিন বছর বয়সে হয়।[৬]

---

[১] পা. গৃ. সূ ১/১৭/৫,৬, কৌ. গৃ. সূ ৭/৫৮/১৮

[২] বৌ. গৃ. সূ ২/২/১-১৩, শঙ্খ. সং ২/৫

[৩] বৌ. গৃ. সূ ২/৪/১-২০, হি. গৃ. সূ ২/১/৬/১-৩, জৈ. গৃ. সূ ১/১১, আপ. গৃ. সূ ৬/১৬/৩-১১, বৈখা. গৃ.সূ ৩/২৩/১-১৩, বার. গৃ. সূ ৪/১-৩১, মা. গৃ. সূ ১/২১/১-১৪, কা. গৃ. সূ ৪০/৩/১৬/১-১০

[৪] আ. গৃ. সূ ১/১৩/১

[৫] বৈখা. গৃ. সূ ৩/২১

[৬] গো. গৃ. সূ ২/৯/১

শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে জন্ম থেকে এক বছর পরে অথবা তৃতীয় বছরে (ব্রাহ্মণের) এই চূড়াকরণ অনুষ্ঠান হয়। এই সংস্কার ক্ষত্রিয়ের পঞ্চম বছরে, বৈশ্যের সপ্তম বছরে অনুষ্ঠিত হয়।[১] *পারস্কর গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে কুমারের জন্ম থেকে এক বছর অতিক্রান্ত হলে চূড়াকরণ নামক সংস্কারটি হবে অথবা জন্ম থেকে তিন বছর হওয়ার কিছু পূর্বে চূড়াকরণ সংস্কারটি অনুষ্ঠিত হবে।[২]

চূড়াকরণ সংস্কারের বিধি হল যে শিশুপুত্রের চূড়াকরণ সংস্কার করা হবে সে অগ্নির পশ্চাতে মায়ের কোলে থাকবে। অগ্নির উত্তর দিকে চাল, যব, মাষ ও তিলের দ্বারা পরিপূর্ণ চারটি পৃথক পৃথক পাত্র রাখতে হবে। নূতন পাত্রে থাকবে ষাড়েঁর বিষ্ঠা এবং অন্য এক নূতন শরায় শাঁই অর্থাৎ শমী গাছের পাতা। যে শিশুপুত্রের চূড়াকরণ বিধি অনুষ্ঠিত হবে সেই শিশুপুত্রের জননীর দক্ষিণ দিকে পিতা একুশটি কুশগুচ্ছ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। "উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি" (মন্ত্র. ব্রা ১/৬/২)- এই মন্ত্রের দ্বারা বালকের পিছনে দাঁড়িয়ে পিতা দুই হাত দিয়ে একই সঙ্গে একটি পাত্রে শীতল ও গরম জল ঢালবেন। সেই জলের কিছুটা এবং তার সঙ্গে মাখন বা দধিবিন্দু নিয়ে বাম থেকে দক্ষিণদিকে "অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দতু বর্চস ইতি" এই মন্ত্রে তিনবার জাতকের মাথায় তা ছিটিয়ে দেবেন। এরপর "ওষধে ত্রায়স্বৈনম্" (মন্ত্র. ব্রা ১/৬/৫)- এই মন্ত্রে দক্ষিণদিকের কেশগুচ্ছে তিনটি কুশগুচ্ছ রেখে দেবেন। এরপর "স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ" (মন্ত্র. ব্রা ১/৬/৬)- এই মন্ত্রে তাম্রনির্মিত ক্ষুরের দ্বারা কুশগুচ্ছগুলো চেপে ধরে "শীতোষ্ণাভির্ অদ্ভির্ অবর্থং কুর্বাণোঽক্ষণ্বন্ কুশলীকুর্বিতি" এই মন্ত্র দ্বারা নাপিত কেশবিন্যাস করবেন। "যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো

[১] শা. গৃ. সূ ১/২৮/১-৪

[২] পা. গৃ ২/১/৩

বরুণস্য বিদ্বান্। তেন ব্রহ্মাণো বপতেদ্মস্যায়ুষ্মাঞ্ জরদষ্টির্যথাসদ্ ইতি" এই মন্ত্রে কেশগুচ্ছ ছেদন করা হবে। কেশচ্ছেদন করে কেশগুচ্ছের অগ্রভাগ পূর্বমুখী করে শমীপর্ণ সমেত তা বালকের জননী ষাঁড়ের বিষ্ঠায় স্থাপন করবেন।[১] বালকের মাথার বামদিকের কেশ তিনবার এবং দক্ষিণ অর্থাৎ ডান দিকের কেশ চারবার ছেদন করতে হবে। কন্যার জন্য বিনা মন্ত্রেই কেশচ্ছেদন করতে হবে। তারপর "যৎ ক্ষুরেণ মর্চতয়া সুপ্তশসা বসো বপসি কেশান্। শুদ্ধি মাস্যায়ুঃ প্রমোষীর ইতি" এই মন্ত্র দ্বারা ক্ষুরের প্রান্তভাগ মুছে নিতে হবে। নাপিতকে দিয়ে কুলাচার অনুসারে বালকের কেশসজ্জা করানো হবে। কেউ একটি, কেউ তিনটি, কেউ বা পাঁচটি শিখা রাখবে। কেউ সামনে, কেউ বা পিছনে শিখা রাখবে।[২]

গোভিল ও খাদির গৃহ্যসূত্রে এই চূড়াকরণ সংস্কারের উপকরণ এবং নিয়ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে যেখানে চূড়াকরণ কার্য করতে হবে সেখানে গোময় লেপন করে পূর্বভাগে যথাবিধি অগ্নিস্থাপন করতে হবে। এরপর একবিংশতি দর্ভপিঞ্জুলী, উষ্ণোদক কাংস্যপাত্র (অর্থাৎ গরম জলপূর্ণ কাঁসার পাত্র), ডুমুরকাঠের ক্ষুর অথবা দর্পণ এবং লৌহক্ষুর এই চারটি বস্তু নাপিত দক্ষিণদিকে রাখবেন। ষাঁড়ের গোবর, অমন্ত্রপক্ক কৃসর অর্থাৎ সিদ্ধ তিলতণ্ডুল নাপিত উত্তরদিকে রাখবেন। পূর্বদিকে একটি পাত্রে ধান ও যব এবং অপর পাত্রে তিল ও মাষ রাখবেন। ওই কৃসর ও ধ্যানাদিপূর্ণ দুটি পাত্র নাপিতকে দেওয়া হবে। পরে পিতা বা পুরোহিত যিনি চূড়াকরণ সংস্কার করতে প্রবৃত্ত হন, তিনি পশ্চাৎ পূর্বাভিমুখ হয়ে অবস্থান করবেন। এরপর পিতা বা পুরোহিত যিনি কার্য করবেন তিনি সেই ক্ষুরহস্ত নাপিতকে দর্শন করে মনে মনে জগৎ প্রসবিতা দেবতাকে ধ্যান করে "আয় মগাৎ সবিতা ক্ষুরেণ" (ম. ব্রা

[১] আ.গৃ.সূ ১/১৭/১-১১

[২] শা.গৃ.সূ ১/২৮/১-২৪

১/৬/১)- এই মন্ত্র পাঠ করবেন। এরপর উষ্ণোদক অর্থাৎ গরম জল সহিত কাংস্যপাত্র দর্শন করে মনে মনে বায়ু দেবতাকে ধ্যান করে "উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি" (ম. ব্রা ১/৬/২)- এই মন্ত্র পাঠ করবেন। এরপর দক্ষিণ হস্তে বালকের দক্ষিণ কপুষ্ঞিকা গ্রহণ করে "আপ উন্দন্তু জীবসে" (ম. ব্রা ১/৬/৩)- এই মন্ত্র পাঠ করে তাতে সেই উষ্ণোদক অর্থাৎ গরম জল ছিটিয়ে দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হবে। "বিষ্ণোর্দংষ্ট্রোঽসি" (ম. ব্রা ১/৬/৪) এই মন্ত্র পাঠ করে ডুমুর কাঠের ক্ষুর বা দর্পণ দেখবেন। "ওষধে ত্রায়স্বৈনম্" (ম. ব্রা ১/৬/৫) এই মন্ত্র পাঠ করে সপ্ত দর্ভপিঞ্জুলী যার নিম্নমূল ঊর্ধ্বাগ্র সেই দক্ষিণ কপুষ্ঞিকাতে ধারণ করানো হবে। পরে সেই দর্ভপিঞ্জুলী সহ দক্ষিণ অর্থাৎ ডান দিকে কপুষ্ঞিকা গুলি শক্ত করে ধরে "স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ" (ম. ব্রা ১/৬/৬) এই মন্ত্র পাঠ করে দক্ষিণ হস্তে সেই ডুমুর কাষ্ঠের ক্ষুর বা দর্পণ নিয়ে সেই কপুষ্ঞিকাতে ভালরূপে ধারণ করবেন এবং সেটিকে পূর্বাভিমুখ করে তিন বার চালনা করবেন। তখন একবার পূষার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করবেন এবং অপর দুবার কোনও মন্ত্রই পাঠ করবেন না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ডুমুরের ক্ষুর বা দর্প চালনে কেশ যদি ছিন্ন না হয় তাহলে লৌহক্ষুরের সেই দর্ভপিঞ্জুলী সহ দক্ষিণ কপুষ্ঞিকা ছেদন করে ষাঁড়ের গোবরে স্থাপন করতে হবে। এই একই ভাবে কপুচ্ছলও (মাথার পেছনের দিকের কেশকে কপুচ্ছল বলে। "ক" শব্দের দ্বারা মাথাকে বোঝানো হয় এবং পুচ্ছল শব্দের দ্বারা পশ্চাৎভাগের কেশকে বোঝানো হয়) ছেদন করতে হবে। উত্তর কপুষ্ঞিকা ছেদনেও এই একই নিয়মই অবলম্বন করতে হবে। এইভাবে কপুষ্ঞিকাদ্বয় এবং কপুঞ্জল ছেদিত হলে দুই হাত দিয়ে বালকের মস্তক ধরে "ত্র্যায়ুয়ং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষ মগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তত্তে অস্তু ত্র্যায়ুষম্ ।" (ম. ব্রা ১/৫/৮) এই মন্ত্র জপ করতে হবে। এইভাবে কপুষ্ঞিকাদ্বয় ও কপুচ্ছল ছেদিত হলে বালক সেখান থেকে সরে অগ্নির উত্তরভাগে গিয়ে বসবে। এরপর

আত্মীয়রা নাপিতের দ্বারা গোত্র ও কুলানুসারে পঞ্চচূড় বা ত্রিচূড় এবং শিখাশূন্য বা সশিখ মুণ্ডন করাবেন। যাঁদের বশিষ্ঠ গোত্র তাঁরা পঞ্চচূড়া রেখে বপন কার্য করবেন, যাঁরা কুণ্ডপায়ী তাঁরা তিনটি চূড়া রাখবেন এবং যাঁদের কৌথুম শাখা, তাঁরা বেদাধ্যয়ন সমাপ্তির পরে সমাবর্তন হওয়া পর্যন্ত শিখা রাখবেন ও মুণ্ডন করবেন। কিন্তু যদি কেউ চিরব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, কারও যদি সমাবর্তনের ইচ্ছা না থাকে- তাহলে তাঁকে শিখা রক্ষাপূর্বক মুণ্ডন করাতে হবে। কন্যার চূড়াকরণও অবিকল এই একই নিয়মে হবে কিন্তু চূড়ার হোম ছাড়া বাকি সমস্ত কার্যই মন্ত্রহীন ভাবেই করতে হবে।[১]

পারস্কর গৃহ্যসূত্রানুযায়ী চূড়াকরণের প্রারম্ভে তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে পুত্রের মাতা পুত্রকে স্নান করিয়ে ধোয়া নতূন কাপড় পরিয়ে কোলে নিয়ে অগ্নির পশ্চিম দিকে বসবেন। ব্রহ্মোপবেশনের পরে আঘারাদি স্বিষ্টকৃৎ হোম পর্যন্ত চোদ্দটি আজ্যাহুতি দিয়ে সংস্রব প্রাশনের পর শীতল জলে "উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি।" (মন্ত্র. ব্রা ১/৬/২) এই মন্ত্রটি পড়ে গরম জল ঢালবেন। তারপর ওই গরম জলের মধ্যে একটু ননী বা ঘৃত অথবা দই দেওয়া হবে। তারপর ওই জল নিয়ে পুত্রের মাথার দক্ষিণ ভাগের চুলগুলিকে "সবিত্রা প্রসূতা দৈব্যা আপ উন্দন্তু তে তনুং দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চস"- এই মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে ভেজানো হবে। তারপর তিনটি শ্বেত-শলাকার দ্বারা চুলগুলিকে তুলে "ওষধে ত্রায়স্বৈনম্" (মন্ত্র. ব্রা ১/৬/৫) মন্ত্রটি বলতে বলতে তিনগাছি কুশ ওই স্থানে দেবেন। এরপর "শিবো মাসি স্বধিতিস্তে পিতা নস্তে অস্তু মা ম হিংসী।" (বাজ. সং ৩/৬৩) এই মন্ত্রটি বলে লৌহময় এবং তাম্রময় ক্ষুরটি ডান হাত দিয়ে কুশাচ্ছাদিত চুলে লাগানো হবে। এরপর "নিবর্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায়

[১] গো. গৃ. সূ ২/৯/১-২৯, খা. গৃ. সূ ২/৩/১৬-৩৩

রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সবীর্যায়।" (বা. সং ৩/৬৩) এবং "যেন বপৎ সবিতা..... যথাসৎ।"- এই মন্ত্রদুটি পাঠ করে পুত্রের কেশগুলিকে কাটা হবে। এরপর কেশ সহ কুশগুলিকে ছেদন করে অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপিত বৃষগোময় পিণ্ডে চুলগুলিকে রাখা হবে।[১]

২.৪.১৪ কেশান্ত বা গোদান : ষোল বছর পূর্ণ হলে কেশান্ত নামক সংস্কারটি অনুষ্ঠিত হবে। এই কেশান্ত সংস্কারকে গোদান সংস্কারও বলে।[২] কেশান্ত সংস্কারেও চূড়াকরণের মত "উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি।" (মন্ত্র. ব্রা ১/৬/২) এই মন্ত্র পাঠ করা হয়।[৩] এই সংস্কারের নিয়ম হল ক্ষুরটিকে একবার অমন্ত্রক অবস্থায় এবং দুইবার মন্ত্র পাঠ করে মোট তিনবার মাথার চতুর্দিকে ঘোরাতে হবে।[৪] এরপর শীতোষ্ণ জল দ্বারা কুমারের মস্তকটি ভালো করে ভিজিয়ে "অক্ষুন্বন্ পরিবপেতি" এই মন্ত্রটি বলে নাপিতের হাতের ক্ষুর দ্বারা ওই পুত্রের কেশ মুণ্ডন করা হবে। এমনভাবে কেশ মুণ্ডন করা হবে যাতে করে মাথায় কোনও রকম যেন ক্ষত না হয়।[৫] এরপর কেশসমেত গোময়পিণ্ডকে ঢাকা দিয়ে নিয়ে গিয়ে গোচারণ ক্ষেত্রে অথবা অল্প জলবিশিষ্ট জলাশয়ের জলের নিকট রেখে দিয়ে আচার্যকে দক্ষিণা দেওয়া হবে। কেশান্ত বা গোদান সংস্কারের পর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। তারপর থেকে ১২ দিন, সম্ভব না হলে ৬ দিন, সেটাও অসম্ভব হলে ৩ দিন মুণ্ডন করতে নেই।[৬]

---

[১]পা. গৃ. সূ ২/১/১-১২

[২] আপ. গৃ. সূ ৬/১৬/১২-১৬, মা. গৃ. সূ ১/২১/১-১৪

[৩] পা. গৃ. সূ ২/১/১,৭

[৪] পা. গৃ. সূ ২/১/১৮

[৫] পা. গৃ. সূ ২/১/২০

[৬] পা. গৃ. সূ ২/১/২১-২৩

২.৪.১৫ অন্নপ্রাশন : শিশুর ষষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে অন্নপ্রাশন নামক সংস্কার করা হয়ে থাকে।[১] কঠিন খাদ্যের প্রথম ভক্ষণ এই সংস্কারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। "যচ্চিদ্ধি তে পুরুষত্রা যবিষ্ঠাচিত্তিভিশ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ। কৃধী ষ্বস্মাঁ অদিতেরনাগান্ষ্যেনাংসি শিশ্রথো বিষ্বগগ্নে।।" (ঋ. বে ৪/১২/৪), "মহশ্চিদগ্ন এনসো অভীক ঊর্বাদ্দেবানামুত মর্ত্যানাম্। মা তে সখায়ঃ সদমিদ্রিষাম যচ্ছা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ।।" (ঋ. বে ৪/১২/৫)- এই দুই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করে, "সোন্যা পৃথিবি ভরানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ।।" (ঋ. বে ১/২২/১৫)- এই মন্ত্রে শিশুকে উত্তরমুখী কুশগুলির উপর বসিয়ে, মহাব্যাহৃতিগুলি দিয়ে শিশুকে ভক্ষণ করানো হবে। এরপর খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করবেন শিশুর মাতা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ভক্ষ্য অন্নপ্রার্থী ব্যক্তি শিশুটিকে ছাগলের মাংস ভক্ষণ করাবেন। ব্রহ্মতেজপ্রার্থী ব্যক্তি তিতির পাখীর মাংস ভক্ষণ করাবেন। তেজঃপ্রার্থী ব্যক্তি ঘৃতমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করান। এছাড়াও দধি, মধু ও ঘৃত দিয়ে প্রস্তুত খাদ্য শিশুকে ভক্ষণ করানো হয়।[২]

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে জন্ম থেকে ষষ্ঠ মাসে পুত্রের অন্নপ্রাশন সংস্কার করার পর চরুপাক করে "দেবীং বাচমজনয়ন্তঃ দেবাস্তাং বিশ্বরূপা পশবো বদন্তি। সা নো মন্দ্রেযমুর্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপসুষ্টুতৈ তু স্বাহেতি।" এবং "বাজো নো অদ্যেতি চ দ্বিতীয়াম্।" এই মন্ত্র দুটি দ্বারা দুটি আজ্যাহুতি দেওয়া হয়। এরপর স্থালীপাক অর্থাৎ চরু দিয়ে "প্রাণেনান্নমশীয় স্বাহা", "অপানেন গন্ধানশীয় স্বাহা", "চক্ষুষা রূপান্যশীয় স্বাহা",

---

[১] বৌ. গৃ. সূ ২/৩/১-৬, হি. গৃ. সূ ২/১/৫/১-৩, আপ. গৃ. সূ ৬/১৬/১-২, বৈখা. গৃ. সূ ৩/২২/১-৫, বার. গৃ. সূ ৩/৩-৬, কৌ. গৃ. সূ ৭/৫৮/১৯-২৫, মা. গৃ. সূ ১/২০/১-৬, কা. গৃ. সূ ৩৯/৩/১৫/১

[২] আ. গৃ. সূ ১/১৬/১-৫, শা. গৃ. সূ ১/২৭/১-১১, জৈ. গৃ. সূ ১/১০

"শ্রোত্রেণ যশোঽশীয় স্বাহা" এই চারটি মন্ত্র দ্বারা চারটি আহুতি দেওয়া হবে। স্বিষ্টকৃৎ হোম থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণান্ত কর্মানুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত সমস্ত রস, সমস্ত লেহ্য, পেয়, চোষ্য খাদ্যগুলি একটি পাত্রে তুলে তারপর কুমারকে ভক্ষণ করানো হয়। কুমারকে খাওয়ানোর সময় কোনও মন্ত্র উচ্চারণ না করে কেবলমাত্র 'হন্ত' কথাটি বলে অথবা "হন্তকারং মনুষ্যা উপজীবন্তি" এই কথাটি বলে খাওয়ানো হবে। পিতা যদি শিশুর বাক্‌প্রসার করাতে চান তাহলে ভারদ্বাজী পক্ষিণীর মাংস শিশুকে খাওয়াবেন, অন্ন ভক্ষণের যোগ্য হওয়ার ইচ্ছা করলে কপিঞ্জল মাংসের সঙ্গে খাওয়াবেন। শিশুকে বেগবান করতে ইচ্ছা করলে মাছ দিয়ে খাওয়াবেন। শিশুকে দীর্ঘায়ু করতে ইচ্ছা করলে কাঁকড়ার মাংস দিয়ে খাওয়াবেন। শিশুকে ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করলে আটী পাখির মাংস খাওয়াতে হবে। আর যদি সমস্ত গুণই শিশুর মধ্যে থাকুক এই কামনা শিশুর পিতা করেন তাহলে সমস্ত প্রকার মাংসই শিশুকে একসঙ্গে খাওয়ানো হবে। কাম্যভেদে সমাংস অন্নপ্রাশন করিয়ে অথবা সাধারণ নিয়মে অন্নপ্রাশন করানোর পর ব্রাহ্মণভোজন করানো হয়ে থাকে।[১]

২.৪.১৬ পিণ্ডবর্ধন : পিণ্ড শব্দের অর্থ শরীর। পুণ্য অর্জনের জন্য দ্বিজের ভোজনের নিমিত্ত এই সংস্কার করা হয়ে থাকে।[২]

২.৪.১৭ উপনয়ন : উপনয়ন শব্দ "উপ" উপসর্গপূর্বক "নী" ধাতুর সাথে ল্যুট প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়। "উপ" শব্দের অর্থ হল সমীপ এবং নয়ন শব্দের অর্থ হল "আনয়ন করা"। যে

[১] পা. গৃ. সূ ১/১৯/১-১৩

[২] বৈখা .গৃ. সূ ৩/২২/১৫

সংস্কারের দ্বারা বালককে বেদাধ্যয়নের জন্য গুরুর সমীপে আনয়ন করা হয় সেই সংস্কারকে উপনয়ন সংস্কার বলা হয়।

বারাহ গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী উপনয়ন সংস্কারেও একটি চূড়াকরণ সংস্কারের কথা বলা হয়েছে যা আমরা পূর্বে যে চূড়াকরণ সংস্কারের কথা পেয়েছি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই চূড়াকরণ সংস্কার কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুমারদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সংস্কারে ব্রাহ্মণকুমারকে কেশচ্ছেদন করে স্নান করাতে হবে। তারপর মাথায় উপস্পর্শন প্রক্রিয়ায় মাখন লাগিয়ে ওই কুমারকে অগ্নির দক্ষিণ ভাগে বসিয়ে "দধিক্রাব্ণো অকারিষমি" এই মন্ত্র পাঠ করে কুমারকে তিন বার দধি প্রাশন (চাটানো) করানো হবে। এরপর "ইয়ং দুরুক্তাব্ণো" এই মন্ত্র পাঠ করে ব্রাহ্মণকুমারকে মেখলা ধারণ করাতে হবে।[১]

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য মেখলা, উত্তরীয় এবং দণ্ড ধারণ করবেন, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবেন, সমিধাদান কর্ম করবেন এবং ভিক্ষাচরণ করবেন।

২.৪.১৮ বেদপারায়ণ অঙ্গভূত ব্রত : উপনয়নের পর এই ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। পতিত পাপের থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এই ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। উপনয়নের দিন থেকে আরম্ভ করে চতুর্থী, পঞ্চমী বা সপ্তমী তিথিতে অথবা কোনও পূর্ণ নক্ষত্রে শিষ্য আচমন করে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে গুরুর সম্মুখে বসে পাপস্খালনের জন্য গুরুর বচন শ্রবণ করে।[২]

---

[১] বার. গৃ. সূ ৫/৯-১১

[২] বৈখা. গৃ. সূ ২/৯/১-৫, ২/১০/১-১০

২.৪.১৯ উপাকর্ম অথবা উপাকরণ : প্রাচীন বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম শুরুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে উপাকর্ম বা উপাকরণ বলা হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান শ্রাবণ মাসের বর্ষা ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[১]

২.৪.২০ উৎসর্জন অথবা উৎসর্গ : বৈদিক অধ্যয়নের বার্ষিক পাঠ্যক্রমের সমাপ্তিকে উৎসর্জন বা উৎসর্গ বলে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।[২]

২.৪.২১ সমাবর্তন : সমাবর্তন শব্দটি "সম্-আ" উপসর্গপূর্বক "বৃৎ" ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে যার অর্থ হল প্রত্যাবর্তন করা বা ফিরে আসা। এই সংস্কারের দ্বারা ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করে গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই সংস্কারের দ্বারা ব্রহ্মচারী নিজের তপোময় জীবন পরিত্যাগ করে সংসারের কর্মের দিকে প্রবৃত্ত হয়। অতএব জীবনের প্রথম অধ্যায়ের অন্ত তথা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভই হল সমাবর্তন সংস্কার।

এই সংস্কারের সময় সম্পর্কে *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে বেদাধ্যয়ন করার পরে অর্থাৎ বিদ্যালাভের শেষে গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করে অথবা তাঁর অনুমতি নিয়ে শিষ্যকে "স্নান" করতে হবে।[৩] *মানব গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর এই স্নানাদি সংস্কার হয় না।[৪]

---

[১] হি. গৃ. সূ ২/৮/১০/১-১৮, বৈখা. গৃ. সূ ২/১২/১-১৭, কা. গৃ. সূ ১/৮/১-৫, মা. গৃ. সূ ১/৪/১-৩, কা. গৃ. সূ ৯/১/৯/১-১২, ১০/১/১০/১-১১, ১১/১/১১/১-৪, ১২/১/১২/১-১৩

[২] মা. গৃ. সূ ১/৪/৭-১০, হি. গৃ. সূ ২/৮/১০/১-১৮

[৩] আ.গৃ.সূ ৩/৯/৪

[৪] মা. গৃ. সূ ১/২/১০

এই গৃহ্যসূত্রানুসারে গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সমাবর্তন সংস্কারের যোগ্য ব্রহ্মচারী নিজের এবং আচার্যের জন্য মণি, দুটি কুণ্ডল, একজোড়া বস্ত্র, ছত্র, একজোড়া পাদুকা, দণ্ড, মালা, গাত্রমর্দনের দ্রব্য, অনুলেপনের দ্রব্য, কাজল ও উষ্ণীষ এই বস্তুগুলি সংগ্রহ করবেন। কোনও কারণবশত শিষ্য যদি এই বস্তুগুলি নিজের জন্য সংগ্রহ করতে না পারেন তবে তিনি কেবলমাত্র আচার্যের জন্যই এগুলি সংগ্রহ করবেন। এরপর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে যজ্ঞের নিমিত্ত ভোজ্য অন্ন, পুষ্টি অথবা শক্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করার জন্য বৃক্ষের শুষ্ক এবং আর্দ্র সমিধ ব্রহ্মচারী আহরণ করবেন। সমিধকে মাটিতে না রেখে ওপরে কোথাও রেখে, ব্রাহ্মণকে গাভী ও অন্ন প্রদান করে ব্রহ্মচারী গৌদানিক কর্ম অর্থাৎ শ্মশ্রু প্রভৃতি ছেদন করবেন।[১]

গোভিল গৃহ্যসূত্র অনুসারে সমাবর্তন সংস্কারের অপর নাম হল গোদান সংস্কার। উপনয়ন থেকে ষোড়শ বছর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে ব্রহ্মচারী তাঁর কর্তব্য এবং বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করে আচার্যকে দক্ষিণাস্বরূপ দুটি গাভী দানপূর্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই জন্য এই সংস্কারকে বলা হয় গোদান সংস্কার।[২] উপনয়ন কাল থেকে ষোড়শ বর্ষে অর্থাৎ গর্ভ থেকে গণনা করলে যার অষ্টমাব্দে উপনয়ন হয়েছে তার গর্ভ হতে চতুর্বিংশাব্দে এবং যার নবমাদি ষোড়শাব্দ বয়সে উপনয়ন হয়েছে তার পঞ্চবিংশাদি দ্বাত্রিংশাব্দ বয়সে গোদান অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার হবে। চূড়াকরণের ন্যায় এই সংস্কারেও কেশবপন করতে হয়। ব্রহ্মচারী

[১] আ.গৃ.সূ ৩/৮/১-৬

[২] গো. গৃ. সূ ৩/১/২৮

অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন আচারযুক্ত আদ্য আশ্রমীকে যখনই কেশান্ত অর্থাৎ গৌদানিক সংস্কার করানো হবে তখনই কক্ষ, বক্ষ, উপস্থ ও শিখা পর্যন্ত রোম ও কেশ বপন করানো হবে।[১]

এই সমাবর্তন সংস্কারকে স্নাতকক্রিয়াও বলে। ব্রহ্মচর্যব্রত সমাপ্ত হলে আচার্যের নিকটে গৃহস্থ হবার অনুমতি নিয়ে ব্রতসমাপ্তিসূচক স্নানবিশেষ সম্পন্ন করে স্বগৃহে গমন করতে হয় বলেই এই সংস্কারকে স্নাতক ক্রিয়া বলে।[২]

মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ সস্বর এবং অর্থবোধ সহ পাঠ শেষ করে ব্রহ্মচারী বিধিপূর্বক স্নান করবেন। অথবা তাঁকে আটচল্লিশ বছর যাবৎ ব্রহ্মচর্য ব্রত অতিবাহিত করে আচার্যের অনুমতি নিয়ে বিধি অনুসারে স্নান বা সমাবর্তন করতে হবে। কোনও কোন আচার্যের মতে বারো বছর যাবৎ একটি অধ্যয়ন শেষ করে স্নান করতে হবে। গুরু অর্থাৎ আচার্যের অনুমতি নিয়ে এই স্নান বিধি পালনীয়। আটচল্লিশ বছর যাবৎ বা বারো বছর যাবৎ বেদাধ্যয়নের সময় যে যে বিষয়গুলি অধ্যয়ন করানো হবে সেগুলি হল 'বিধি' অর্থাৎ বিধায়ক ব্রাহ্মণ, বিধেয়ঃ অর্থাৎ মন্ত্র এবং 'তর্ক' অর্থাৎ অর্থবাদ। কোনও কোনও আচার্যের মতে 'ষড়ঙ্গ' অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ সহ বেদ অধ্যয়ন বিহিত এবং তারপরই স্নান কর্তব্য। তাঁদের মতে কেবল মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ পাঠ করলেই বিহিত কর্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা আসে না। ষড়ঙ্গ সহ বেদাধ্যয়ন করলেই অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অধিকার জন্মায়।[৩]

---

[১] গো. গৃ ৩/১/১-৪, খা. গৃ. সূ ২/৫/১

[২] গো. গৃ. সূ ৩/৪/১, খা. গৃ. সূ ৩/১/১

[৩] পা. গৃ. সূ ২/৬/১-৭

ব্রহ্মচারী স্বহস্ত যুগলে অর্থাৎ ডান ও বাম হাত দিয়ে গুরুর ডান ও বাম চরণ স্পর্শ করবে এবং গুরুর চরণে মাথা ছুঁইয়ে "আমি স্নান করব" এই প্রার্থনা জানালে গুরু স্নান করার অনুমতি দেবেন। তারপর সুতির বস্ত্রাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং জল দ্বারা পরিশ্রিত অগ্নির উত্তরে পূর্বদিকে পূর্বাগ্র করে পাতিত কুশের উপর স্থাপিত জলপূর্ণ আটটি কলশের মধ্যে "যে অন্তস্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্যো মরূকো মনোহাঃ। খলো বিরুজস্তনূদষি রিন্দ্রিয়হা অতি তান্তসৃজামি।। (মন্ত্র. ব্রা ১/৭/১)"- এই মন্ত্রটি বলে একটি কলশ থেকে জল নিয়ে আচার্য ধর্মাদি বৃদ্ধির কামনায়, কীর্তির জন্য, বেদজ্ঞানলিপ্সার জন্য এবং ব্রহ্মতেজ কামনায় ব্রহ্মচারীকে অভিষিক্ত করবেন। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কলশের জল দ্বারা আচার্য ব্রহ্মচারীকে স্নান করাবেন।[১]

এরপর "উদুত্তমমিতি মেখলামুন্মুচ্য দণ্ডং নিধায় বাসোঽন্যৎপরিধায়াদিত্যমুপষ্ঠতে।" এই মন্ত্র পাঠ করে মেখলা খুলে দিয়ে দণ্ড রেখে দিয়ে অন্য একটি বস্ত্র পরে সূর্যোপস্থান করা হবে।[২] এরপর সূর্যোপস্থানের পর দধি বা তিল ভক্ষণ করে জটা, লোম, নখ ছেদন করে "অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজাঽয়মাগমৎ। স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চেতি।"- এই মন্ত্র বলে উদুম্বর অর্থাৎ যজ্ঞডুমুরের কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করবেন।[৩] এরপর সুগন্ধি দ্রব্য (চন্দন) লেপন পূর্বক দেহের ময়লা দূর করে স্নান করে ওই লেপনদ্রব্য মুখ ও নাসিকার নিকট ধরে "প্রাণাপানৌ মে তর্পয় চক্ষুর্মে তর্পয় শ্রোত্রং মে তর্পয়েতি।"- এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন। এরপর "পিতরঃ শুন্ধধ্বমিতি পাণ্যোরবনেজন দক্ষিণানিষিচ্যানুলিপ্য জপেৎ"- এই

[১] পা. গৃ. সূ ২/৫/৯-১২

[২] পা. গৃ. সূ ২/৬/১৫

[৩] পা. গৃ. সূ ২/৬/১৭

মন্ত্রটি বলে দুটি হাত ধুয়ে দক্ষিণ দিকে সেই হাত ধোয়া জলটি ফেলে দিয়ে চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে অঙ্গলেপন করে "সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং ভূয়াসং সুবর্চা মুখেন। সুশ্রুৎকর্ণাভ্যাং ভূয়াসমিতি।"- এই মন্ত্রটি জপ করবেন। এরপর "পরিধাস্যৈ যশোধাস্যৈ দীর্ঘায়িত্বায় জরদষ্টিরস্মি শতং চ জীবামি শরদঃ পুরুচী রায়স্পোষমভিসংব্যয়িষ্য ইতি।" এই মন্ত্রটি পাঠ করে নতুন তথা নিঁখুত একবার মাত্র ধোয়া হয়েছে কিন্তু রজক দ্বারা ধোয়া হয়নি এরকম একটি কাপড় পরবেন।[১] যদি একটিমাত্র বস্ত্র হয় অর্থাৎ পৃথক উত্তরীয় না থাকে তাহলে বস্ত্রেরই অর্ধাংশ দিয়ে উত্তরীয়ের মতো গাত্র আচ্ছাদন করবেন। এরপর "যা আহরজ্জমদগ্নিঃ শ্রদ্ধায়ৈ মেধায়ৈ কামায়েন্দ্রিয়ায়। তা অহং প্রতিগৃহ্ণামি যশসা চভগেন চ ইতি।"- এই মন্ত্র পাঠ করে পুষ্পগ্রহণ করবেন। পুষ্পগ্রহণের পর "যদ্যশোঽপ্সরসামিন্দ্রশ্চকার বিপুলং পৃথু। তেন সংগ্রথিতাঃ সুমনসঃ আবধ্নামি যশোময়ীতি।"- এই মন্ত্রটি পাঠ করে ফুলগুলি নিজের মাথায় পরবেন। এরপর "উষ্ণীষেণ শিরো বেষ্টয়তে যুবা সুবাসা।"- এই মন্ত্র পাঠ করে মাথায় উষ্ণীষ বেষ্টন করবেন। এরপর "অলঙ্করণমসি ভূয়োঽলঙ্করণং ভূয়াদিতি কর্ণবেষ্টকৌ।" এই মন্ত্র পাঠ করে দুই কানে দুটি কুণ্ডল পরবেন। "বৃত্রস্যেত্যঙক্তেঽক্ষিণী" এই মন্ত্র পাঠ করে চোখে কাজল পরবেন। এরপর "রোচিষ্ণুরসীত্যাত্মানমার্দশে প্রেক্ষতে।"- মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে দর্পণে নিজের মুখ দেখবেন। এরপর "বৃহস্পতেশ্ছদিরসি পাপ্মনো মা মন্তর্ধেহি তেজসো যশসো মাঽন্তর্ধেহীতি।"- এই মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে ছাতা নেবেন। এরপর "প্রতিষ্ঠেস্থো বিশ্বতো মা পাতমিত্যুপানহৌ প্রতিমুঞ্চতে।"- এই মন্ত্র পাঠ করতে করতে জুতো পরবেন। এরপর "বিশ্বাভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যস্পরিপাহি সর্বত ইতি বৈণবং দণ্ডমাদত্তে।"- এই মন্ত্রটি পাঠ করে একটি বাঁশের দণ্ড গ্রহণ করবে। দন্ত প্রক্ষালনাদি কর্ম স্নাতক সব সময়

[১] পা. গৃ. সূ ২/৬/১৮-২০

মন্ত্রোচ্চারণপূর্বকই করবেন আর কাপড়, ছাতা, জুতো প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন ধারণের সময় সমন্ত্রক এবং অন্য সময় বিনা মন্ত্রেই এগুলি ধারণ করবেন।[১] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে স্নাতক হওয়ার পর অন্তর্বাস অর্থাৎ নীচের বস্ত্র, অধোবস্ত্র এবং উত্তরীয় ধারণ করবেন। বাঁশের দণ্ড, জলপূর্ণ কমণ্ডলু, দুটি যজ্ঞোপবীত ধারণ করবেন।[২]

স্নাতক তিন প্রকারের হয়ে থাকেন। বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক। যিনি বেদ সমাপ্ত করেন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য ব্রত সমাপ্ত না করে সমাবর্তন স্নান করেন অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রম প্রত্যাবর্তন করেন সেই ব্রহ্মচারী হলেন বিদ্যাস্নাতক। যে ব্রহ্মচারী বারো বছর বা আটচল্লিশ বছর ধরে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেন, কিন্তু যিনি বেদের একটি শাখাও সমাপ্ত না করে সমাবর্তন স্নান করেন তিনি ব্রতস্নাতক। যে ব্রহ্মচারী বেদ এবং ব্রত উভয়ই সমাপ্ত করে সমাবর্তন স্নান করেন তিনি বিদ্যাব্রত স্নাতক।[৩]

২.৪.২২ বেদের চারটি ব্রত : প্রতি বেদের প্রতি শাখার যে অধ্যয়ন তাকে বলা হয় বেদব্রত। বেদ অধ্যয়নের চারটি ব্রত। গৃহ্যসূত্র অনুসারে ব্রতগুলির তাৎপর্য হল একজন ছাত্রকে বেদ অধ্যয়নের জন্য যোগ্য করে তোলা। অন্য কথায়, একটি ছাত্র যথাযথ ব্রতপালন করে বেদের একটি নির্দিষ্ট অংশ অধ্যয়নের অধিকারী হয়।[৪]

---

[১] পা. গৃ. সূ ২/৬/২১-৩২, জৈ. গৃ ১.১৯, বৌ. গৃ. সূ ২/৬/১-২০, হি. গৃ. সূ ১/৩/১/১-১৮, ১/৩/২/১-৭, আপ. ধর্ম ১/২/১-২, বৈখা. গৃ. সূ ২/১৩/১-৬, ২/১৪/১-৩, ২/১৫/১-৯, ২/১৬/১-৮, ২/১৭/১-৪, কা. গৃ. সূ ১/৩/৪-১৬, বৌ. ধর্ম. সূ ১/৩/৬,৭

[২] বৌ. ধর্ম. সূ ১/৩/২-৫

[৩] পা. গৃ. সূ ২/৫/৩২-৩৫

[৪]গৌ. ধর্ম. সূ ১/৮/১৫, বৌ. গৃ. সূ ১/১/১৫-১৬, বৈখা. গৃ. সূ ২/৯/৫

২.৪.২৩ পঞ্চমহাযজ্ঞ : পঞ্চমহাযজ্ঞ বলতে দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞকে বোঝায়। এর দ্বারা নিত্যপূজাকেই বোঝানো হয়। প্রতিদিন বেদের যে অধ্যয়ন করা হয় তাকে বলা হয় ঋষি যজ্ঞ অথবা ব্রহ্ম যজ্ঞ। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে জল এবং ফলাদি অন্যান্য পদার্থ প্রদান করা হয় তাকে বলা হয় পিতৃযজ্ঞ। বিবাহের সময় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা হয় সেই অগ্নিতেই মনুষ্য যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, দেব যজ্ঞ করা হয়ে থাকে।[১] *পারস্কর গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে সমাবর্তনের পর বিবাহিত ব্যক্তির পঞ্চমহাযজ্ঞ সবই করতে হবে। পারস্করের মতে, এই পঞ্চমহাযজ্ঞ হল ব্রহ্মণে স্বাহা ইত্যাদি রূপ হোমাত্মক কর্ম। দেবযজ্ঞ অর্থাৎ সমস্ত দেবতা সম্বন্ধীয় অন্নরাশি থেকে অন্ন নিয়ে গৃহস্বামী অগ্নিকে পর্যুক্ষণ করে "ব্রহ্মণে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, গৃহ্যাভ্যঃ স্বাহা, কশ্যপায় স্বাহা এবং অনুমতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা অন্নাহুতি দেবেন। ত্রীন্ অর্থাৎ "ব্রহ্মণে নমঃ", "অন্তরিক্ষায় নমঃ", "সূর্যায় নমঃ" বলে ভূত গৃহ্যদের উদ্দেশ্যে যে তিনটি বলি দেওয়া হয় তাকেই বলা হয় ভূতযজ্ঞ। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে "পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ" বলে যে বলি দেওয়া হয় তাকে বলা হয় পিতৃযজ্ঞ। অতিথি পূজাদিরূপ মনুষ্যযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। এই সময় দাতা উপবীতী হয়ে মনুষ্যতীর্থে দান করবেন। ভিক্ষুক এবং অতিথিগণকে যথাযোগ্য ভিক্ষা, ভোজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করবেন। এরপর পুত্রাদি বালকদের ভোজন করাবেন, তারপর গৃহস্বামী এবং তার পত্নী ভোজন করবেন।[২]

২.৪.২৪ সপ্তবিধ পাকযজ্ঞ (তিন অষ্টকা, পার্বণশ্রাদ্ধশ্রাবণী, আগ্রহায়ণী, চৈত্রী ও আশ্বযুজী): আগ্রহায়ণীর পর তিনটি অপর পক্ষের অষ্টমী তিথিতে যে পাকযজ্ঞ অথবা হেমন্ত এবং শিশির

---

[১] গৌ. ধর্ম. সূ ১/৫/৩-৮

[২] পা. গৃ. সূ ২/৯/১,২,৭-১৫, আ. গৃ. সূ ৩/১/১-৪

ঋতুর চারটি অপর পক্ষের অষ্টমী তিথিতে যে পাকযজ্ঞ করা হয় তাকে বলা হয় অষ্টকা। বিভিন্ন পার্বণে যে স্থালীপাক করা হয় তাকে পার্বণ বলে। শ্রাদ্ধ বলতে মাসিক শ্রাদ্ধকে বোঝানো হয়েছে। শ্রাবণের পূর্ণিমাতে সূর্যাস্ত হওয়ার পর যে স্থালীপাক যজ্ঞ করা হয় তাকে শ্রাবণী বলা হয়। মার্গশীর্ষ পূর্ণিমাতে যে সর্পবলি উৎসর্গ হোম করা হয় তাকে বলা হয় আগ্রহায়ণী। চৈত্র পূর্ণিমাতে যে শূলগব অথবা ঈশানবলি পাকযজ্ঞ করা হয় তাকে বলা হয় চৈত্রী, আশ্বিন পূর্ণিমাতে পশুপতির উদ্দেশ্যে যে স্থালীপাক হোম করা হয় তাকে বলা হয় আশ্বযুজী।[১]

২.৪.২৫ সপ্তবিধ হবির্যজ্ঞ (অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী) : হবির্যজ্ঞে প্রধান নৈবেদ্য হল দুধ, উদ্ভিজ্জ তেল, তিলের তেল, ঘৃত, মধু এবং অন্যান্য তরল পদার্থ। যে কোনও শ্রৌতযজ্ঞ করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন বিহিত নিয়মে একাধিক কুণ্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে অগ্নির স্থাপন। এই অগ্নিস্থাপনের অনুষ্ঠানকে বলা হয় অগ্ন্যাধেয় বা অগ্ন্যাধান। আধানে গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ- এই তিনটি অগ্নিকে তিনটি বিভিন্ন কুণ্ডে স্থাপন করা হয়। এই তিনটি অগ্নি ছাড়াও সভ্য এবং আবসথ্য নমে আরও দুটি অগ্নিকে পৃথক কুণ্ডে স্থাপন করা যেতে পারে। বৈদিক প্রথানুযায়ী ব্রাহ্মণের বসন্তে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মে এবং বৈশ্যের বর্ষায় অগ্নিস্থাপন করতে হয়।[২]

---

[১] গৌ. ধর্ম. সূ ১/৮/১৯, আ. গৃ. সূ ১/১/২, ৪/৭/১, শা. গৃ. সূ ৩/৩/১২/১-৫, ৩/৩/১৩/১-৭, ৩/৩/১৪/১-৬,১৪, ৪/১৬/১-৫, ৪/১৯/১-৫,৪/১৭/১-৬

[২] কা. গৃ. সূ ৪৫/৪/৫/১-১২, ৪৬/৪/৬/১-১০

আধান যদি হোমপূর্বাধান (অগ্নিস্থাপনের পরে "আমি প্রথমেই অগ্নিহোত্রহোমের অনুষ্ঠান করব" এই অভিপ্রায় নিয়ে অগ্নিস্থাপন করা হয় তাহলে তাকে বলে হোমপূর্বাধান) হয়ে থাকে তাহলে যে দিন পবমানেষ্টির অনুষ্ঠান শেষ হয় সেই দিনই সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়। সূর্যাস্তের আগেই গার্হপত্যের কুণ্ড থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে গিয়ে (প্রণয়ন) বিনা মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নির কুণ্ডে তা রেখে দিয়ে আবার গার্হপত্য থেকে কিছু অঙ্গার নিয়ে এসে মন্ত্রপাঠ করে তা এবার আহবনীয়ের কুণ্ডে রেখে দিতে হয়। এরপর যজমান তিন কুণ্ডেই কয়েকটি কাঠ রেখে দেন। যজ্ঞভূমির ডান দিকে একটি গাভী এনে রাখা হয়। সূর্যাস্তের পরে ওই গাভীর দুধ দুয়ে সেই দুধ একটি কলসীতে ঢেলে রেখে আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ অগ্নির কুণ্ডে জল ছিটিয়ে দিতে হয়। এরপর গার্হপত্য থেকে আহবনীয়ের কুণ্ড পর্যন্ত বেদিতে অবিছিন্ন ধারায় জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। পরে গার্হপত্য থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে নিয়ে তা বায়ু (উত্তর-পশ্চিম) কোণে রেখে তার উপরে দুধের ঐ কলসীটিকে বসিয়ে দিতে হয়। যে পাত্রে দুধ দোহা হয়েছিল সেই পাত্রটি ধুয়ে পাত্রের ওই দুধ ধোওয়া জল অথবা অন্য কোনও বিশুদ্ধ জল স্রুবের সাহায্যে কলসীতে ঢেলে তিনবার কলসীর চারপাশে একটি অঙ্গারখণ্ড ঘুরিয়ে (পর্যগ্নিকরণ) নিতে হয়। আবার ঐ কলসীটি আগুন থেকে নামিয়ে নিয়ে (উদ্বাসন) মাটিতে রেখে মাটি ঘেঁষে পূর্বদিকে তা টেনে আনতে হয়। এমন ভাবে টানতে হয় যাতে মাটিতে কালো দাগ পড়ে। মাটিতে এইভাবে তিনবার করে কলসীটি বসাতে হয়। গার্হপত্য থেকে যে অঙ্গারগুলিকে বায়ুকোণে এনে তার উপরে কলসী রেখে দুধ গরম করা হয়েছিল সেই অঙ্গারগুলিকে এবার গার্হপত্যে আবার রেখে দেওয়া হয়। এরপর স্রুব এবং অগ্নিহোত্রহবনী নামে দুটি হাতা নিয়ে আহবনীয়ে তা সামান্য গরম করে কলসী থেকে স্রুবের সাহায্যে অগ্নিহোত্রহবনীতে চারবার দুধ দিতে হয়। এই

কর্মকে বলে "হবিঃ-উন্নয়ন"। ওই অগ্নিহোত্রহবনী এবার গার্হপত্যের পিছনে রেখে নিজের হাত গরম করে তপ্ত হাতে দুধ স্পর্শ করে নয় আঙুল দীর্ঘ পলাশের একটি, দুটি অথবা তিনটি সমিধ নিয়ে অগ্নিহোত্রহবনীর উপর তা ধরে গার্হপত্যের উপর দিয়ে সমিধসমেত হবনীটি আহবনীয়ের পিছনে এনে রেখে দিতে হয়। তারপর জল স্পর্শ করে ওই সমিধগুলি আহবনীয়ের কুণ্ডে স্থাপন করে দেবতা অগ্নির উদ্দেশ্যে হবনীয় দুধ আহুতি দিতে হয়। এই হল সান্ধ্য অগ্নিহোত্রের প্রথম আহুতি (পূর্বাহুতি)।

এরপর হবনীর মুখের সামনে লেগে থাকা দুধ হাত দিয়ে মুছে হাতটি মাটিতে ঘষে নিয়ে হবনীটি মাটিতে রেখে দিতে হয়। রাখার পরে গার্হপত্যের দিকে তাকিয়ে আবার ওই হবনীটি তুলে নিয়ে এবার আহুতি দিতে হবে দেবতা প্রজাপতির উদ্দেশে ওই আহবনীয়েই। এটি হল অগ্নিহোত্রের দ্বিতীয় আহুতি (উত্তরাহুতি)। এরপর আবার হবনীর মুখের সামনে লেগে থাকা দুধ (লেপ) আগের মতোই হাত দিয়ে মুছে মাটিতে হাতটি ঘষে নিতে হয়। ঋগ্বেদীয় যজমানের ক্ষেত্রে এরপরে যথারীতি হবনীকে মাটিতে রেখে স্রুবের সাহায্যে হবনীতে দুধ ভরে নিয়ে গার্হপত্যে চারবার এবং এই একই পদ্ধতিতে দক্ষিণাগ্নিতে চারবার আহুতি দিতে হয়। গার্হপত্যের ক্ষেত্রে চারটি আহুতিরই দেবতা অগ্নি গৃহপতি। বিকল্পে অগ্নি গৃহপতি, রয়িপতি, পুষ্টিপতি ও কাম অগ্নি চার আহুতির উদ্দিষ্ট দেবতা। দক্ষিণাগ্নিতে আহুতির ক্ষেত্রে দেবতা হলেন যথাক্রমে অগ্নি, অদাভ্য, অন্নপতি, পরিষদ্য। এই সমস্ত নিয়ম সবই সান্ধ্য অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের। এই অনুষ্ঠান হয় যখন সূর্য়ের রশ্মি মাটি ছেড়ে গাছের মাথায় গিয়ে পৌছায় তখন।

প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানরীতি এই একই। সকালে গার্হপত্য কুণ্ড থেকে অগ্নিপ্রণয়ন করতে হয় সূর্যোদয়ের আগেই। মূল অনুষ্ঠানটি হয় সম্প্রদায়ভেদে সূর্যোদয়ের আগে অথবা পরে। যাঁর ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের আগে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা হয় তাঁকে বলে "অনুদিতহোমী" এবং যাঁর ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের পরে অনুষ্ঠান হয় তাঁকে বলা হয় "উদিতহোমী"। হোম সম্পন্ন করার পরে তিন কুণ্ডে জল ছিটিয়ে আহবনীয়ের ডান দিকে দাঁড়িয়ে তিন অগ্নিকে উপস্থাপন করতে হয়। তারপরে বেদিতে হবনীটি রেখে দিয়ে হোমের পরে যা অবশিষ্ট আছে দুধের সেই লেপ ভক্ষণ করে আচমন সেরে দুবার হবনীকে লেহন করতে হয়। এরপর হাত ধুয়ে হবনীতে জল নিয়ে সেই জলে আচমন করে দর্ভ দিয়ে পাত্রটি মেজে নিতে হবে। হবনীতে আবার জল নিয়ে সেই জল উপরে চারদিকে ছিটিয়ে ("ব্যুত্সেচন") দেওয়া হয়। এই প্রোক্ষণ কর্মের দেবতা যথাক্রমে সর্প, সর্পপিপীলিকা, সর্পেতরজন ও সর্পদেবজন। হবনীতে আবার জল নিয়ে আহবনীয়ের পিছনে কিছুটা জল ঢেলে দিয়ে ("নিনয়ন") পাত্রীর অবশিষ্ট জল পত্নীর অঞ্জলিতে ঢেলে দিতে হয়। আবার ওই হবনীতে জল নিয়ে এবার সেই জল ঢেলে দিতে হয় উত্তর দিকে মাটিতে সপ্তর্ষিদের উদ্দেশে। এরপর বেদিতে ফিরে এসে তিন অগ্নিকেই প্রজ্বলিত করতে হয়। কুণ্ডগুলিতে আবার জল ছিটিয়ে অগ্নিহোত্রের স্থালীতে তৃণ বুলিয়ে নিয়ে সেই তৃণটি আহবনীয়ে ফেলে দিতে হয়। এরপরে স্থালীকে ধুয়ে নিয়ে সেই জল যেখানে হবিরুন্নয়ন করা হয়েছিল সেই স্থানে ঢেলে দিতে হয়।[১]

[১] শা. গৃ. সূ ২/১৬/৪,৫, ২/১৭/১

দর্শপূর্ণমাস যাগ যেমন অবশ্যকরণীয় তেমন আবার কোনও বিশেষ কামনা নিয়েও এই অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। অবশ্যকরণীয় হলে সারাজীবন ধরে এই যাগের অনুষ্ঠান করতে হবে। অনেকের মতে বৃদ্ধ বয়সে অথবা ত্রিশ বছর পরে এই যাগ না করলেও চলে। দর্শপূর্ণমাস পরস্পরমিলিত একটি যুগ্ম যাগ। দুটি যাগের মধ্যে একটির নাম "দর্শ" অপরটির নাম "পূর্ণমাস"। প্রথমে পূর্ণমাস যাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তারপর দর্শ যাগের অনুষ্ঠান হয়। পূর্ণিমা ও কৃষ্ণা প্রতিপদে পূর্ণমাস যাগ এবং অমাবস্যা ও শুক্লা প্রতিপদে দর্শ যাগ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দুটি যাগের ক্ষেত্রেই মূল অনুষ্ঠানটি হয় প্রতিপদের দিনেই, তবে তিথিটি যদি সকালে শুরু না হয়ে অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় শুরু হয় তাহলে আসল অনুষ্ঠানটি পরবর্তী দিনেই করতে হয়।[১]

আগ্রয়ণ একটি ইষ্টি যাগ। এই যাগের অপর নাম "নবান্ন ইষ্টি"। বর্ষাকালে নূতন শ্যামাক, শরৎকালে নূতন চাল (ব্রীহি) এবং বসন্তকালে নূতন যব দিয়ে এই যাগ করতে হয়। সাধারণত পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যার দিনই এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বর্ষার অনুষ্ঠানটি শরৎকালের অনুষ্ঠানের সঙ্গে একই সঙ্গে করা চলে। শরতে চালের আগ্রয়ণ ইষ্টিতে অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি, বিশ্বদেবাঃ এবং দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে যথাক্রমে পুরনো চালে প্রস্তুত আট কপালের পুরোডাশ, নূতন চালের বারো কপালের পুরোডাশ, নূতন চালের চরু এবং নূতন চালেরই এক কপালের পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। চাল এবং শ্যামাকের যুগ্ম অনুষ্ঠান হলে এই চারটি আহুতি ছাড়াও শ্যামাকের জন্য নির্দিষ্ট দেবতা সোমের উদ্দেশে নূতন শ্যামাকের চরু আহুতি দেওয়া হয়। বসন্তে যবের আগ্রয়ণে কেবল ইন্দ্র-অগ্নি, বিশ্বদেবাঃ এবং দ্যাবা-

[১] শা. গৃ. সূ ৫/১০/৫, ১/৩/১-১৭

পৃথিবী এই তিন দেবতার উদ্দেশ্যে নূতন যবের আহুতিদ্রব্য প্রস্তুত করে পৃথক পৃথক তা নিবেদন করতে হয়।[১]

চাতুর্মাস্যের অনুষ্ঠান হয় চারটি পর্বে। পর্বগুলোর নাম হল– বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ, ও শুনাসীরীয়। এগুলিকে পর্ব বলা হয় কারণ এদের অনুষ্ঠান হয় পূর্ণিমায়। পূর্ণিমাকে পর্ব বলা হয় কারণ তা শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। অরণিমন্থন এবং মথিত অগ্নিকে আহবনীয়ের কুণ্ডে স্থাপন চারটি পর্বেই করা হয়ে থাকে। আহুতি অনুসারে চাতুর্মাস্য তিন প্রকারের, সেগুলি হল ঐষ্টিক, পাশুক ও সৌমিক। ঐষ্টিক চাতুর্মাস্য একবছর, পাঁচদিন অথবা একদিনে সমাপ্ত হয়। পাশুক চাতুর্মাস্যে প্রত্যেক পর্বে একটি করে পশু আহুতি দেওয়া হয়। এই চারটি পর্বেই চারজন দেবতা থাকেন, তাঁরা হলেন বিশ্বদেবাঃ, বরুণ, মহেন্দ্র এবং শুনাসীর। সৌমিক চাতুর্মাস্যে প্রথম পর্বে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় পর্বে অগ্নিষ্টোম ও উক্থ্য, তৃতীয় পর্বে অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, অতিরাত্র এবং চতুর্থ পর্বে জ্যোতিষ্টোম- এই মোট সাতদিনে সাতটি সোমযাগ হয়ে থাকে। সাতদিনের সবনীয় পশুদের দেবতা যথাক্রমে বিশ্ব দেবাঃ, বরুণ মরুৎ, অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি, ঐকাদশিন এবং বায়ু।[২]

পশুযাগের প্রকৃতিযাগ নিরূঢ়পশুবন্ধ যাগ। বর্ষা ঋতুতে অথবা দুই অয়নের আরম্ভে অথবা প্রত্যেক ঋতুতে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন পশুযাগের অনুষ্ঠান করা হয়। এই পশুযাগের প্রধান কাজ হল অগ্নি, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে একটি ইষ্টিযাগের আয়োজন করা। এই পশুবন্ধ যাগে দুটি বেদি থাকে। একটি দর্শপূর্ণমাসের ন্যায় এবং অপরটি উত্তরবেদি। এই

---

[১] শা. গৃ. সূ ৩/৮/১-৭

[২] বৈ. য চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেদিতে কেবলমাত্র আহবনীয়ের কুণ্ডই থাকে, কিন্তু অপরবেদীতে তিনটি অগ্নির কুণ্ডই থাকে। উত্তরবেদীতে অন্য বেদি থেকে আগুন নিয়ে এসে আহবনীয় কুণ্ডে সেই আগুন প্রজ্জ্বলন করতে হবে। এরপর ওই আগুনে জুহু দিয়ে বারবার আজ্যাহুতি দিতে হবে। একে পূর্ণাহুতি হোম বলে। এরপর যূপে আজ্য মাখিয়ে যূপে কুশের তৈরি দড়ি জড়িয়ে দিতে হবে। এরপর দাঁত আছে এমন একটি ছাগকে ওই যূপের কাছে এনে যাগের প্রধান দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য অথবা প্রজাপতির উদ্দেশ্যে উপাকরণ (দুটি কুশ এবং একটি প্লক্ষশাখা নিয়ে পশুকে স্পর্শ করা) করা হয়। এরপর পশুটিকে যূপে বেঁধে পশুটির গায়ে জল ছিটিয়ে স্রুব দিয়ে আজ্য মাখাতে হয়। এরপর আহবনীয় অগ্নি থেকে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে পশুর চারিদিকে ঘোরাতে হয়, একে বলা হয় পর্যগ্নিকরণ। এরপর পশুঘাতক অর্থাৎ শমিতা শামিত্রভূমিতে গিয়ে পশুটির মাথা পশ্চিম দিকে এবং মাথা উত্তর দিকে রেখে পশুটিকে শ্বাস রোধ করে বধ করবেন। এরপর অধ্বর্যু ওই পশুর বপা অর্থাৎ পেটের উপরে নাভির পাশের মেদ কেটে একটি বপাশ্রপণীতে ছড়িয়ে রেখে অন্য এক বপাশ্রপণী দিয়ে সেটিকে ঢেকে রাখেন। এরপর বপাশ্রমণী সমেত বপাকে আগুনে সেঁকে বেদিতে একটি প্লক্ষশাখার উপরে রেখে দেওয়া হয়। এরপর ওই বপাকে আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বপাশ্রমণীকে আগুনে ফেলে দিতে হয়। এরপর যজমান, তাঁর পত্নী এবং সকল ঋত্বিক নিজেদের হাত ধুয়ে ফেলেন। এরপর পশুর উদ্দেশ্যে পুরোডাশ যাগ করা হয়। এই যাগেরও দেবতা সূর্য, প্রজাপতি, ইন্দ্র এবং অগ্নি। এই পুরোডাশ যাগে পশুর বিশেষ বিশেষ অঙ্গ যেমন পশুর হৃৎপিণ্ড, জিভ, বৃক. যকৃৎ, দুটি বৃক্ক, বাঁ হাতের উপর দিকের অংস, দেহের দুটি পাশ, ডান শ্রোণি, গুহ্যদেশের এক তৃতীয়াংশ অগ্নিতে আহুতি দেবে। এই পশুবন্ধ যাগের উদ্দেশ্য হল

চিরন্তন সুখ। তাই কোনও বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়াই এবং কোনও বিশেষ বস্তু ছাড়াই করতে হবে।[১]

সৌত্রামণী এক ধরনের পশুযাগ। চরক এবং কৌকিল ভেদে এই সৌত্রামণী যাগ দুই রকমের। চরক সৌত্রামণী চয়নযাগেরই অঙ্গ। এই যাগে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে ধুম্রবর্ণের ছাগ এবং সরস্বতী ও ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে একটি করে মেষ আহুতি দিতে হয়। বপাযাগের পরে তিনবার কাঠের কাপে সুরা অথবা দুধ নিয়ে এই তিন দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। কৌকিল সৌত্রামণীতে ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী, ইন্দ্র এবং বায়োধস ইন্দ্র এই পাঁচ দেবতার উদ্দেশ্যে একটি করে মোট পাঁচটি পশু আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে।[২]

২.৪.২৬ সাত প্রকার সোমযাগ (অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, বাজপেয়, অপ্তোর্যাম) : সোমযাগ ব্যক্তি, পরিবার এবং মানবজাতির কল্যাণে দেবতাদের খুশি করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সোমযাগের সময় সোমলতা থেকে নিষ্কাশিত পানীয় দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা হয়। একাহ সোমযাগের প্রকৃতি জ্যোতিষ্টোম। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভেদে এই জ্যোতিষ্টোম সাত প্রকার। সেগুলি হল অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, বাজপেয় এবং অপ্তোর্যাম। সন্ধ্যায় যে সান্ধ্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে অগ্নিষ্টোম নামে সোমযাগের সমাপ্তি সেখানেই হয়। অত্যগ্নিষ্টোমে ধ্রুব গ্রহের পরে ষোড়শী গ্রহের অনুষ্ঠান করা হয়। উক্থ্য যাগে যে পশু দুটির আহুতি দেওয়া হয় সেগুলি একটি অগ্নির এবং অপরটি ইন্দ্র অগ্নির উদ্দিষ্ট। ষোড়শী যাগে হবনীয় পশু তিনটি। অতিরাত্রে সবনীয় পশুযাগে ষোড়শীর পশুগুলি ছাড়াও সরস্বতীর উদ্দেশ্যে একটি মেষীও আহুতি দিতে হয়। বাজপেয় যাগের

[১] বৌ. গৃ. সূ ২/১/১৭-২৭),(আ. গৃ. সূ ১/১১/১-১৫

[২] শত. ব্রা ১৩/৭/৯/১

অনুষ্ঠান হয় শরৎকালে। এই বাজপেয়কে সংস্থা বাজপেয় বলে। এই যাগে পশুরা শৃঙ্গহীন হয়। সবনীয় পশু এখানে সতেরোটি এবং সেগুলোর দেবতা প্রজাপতি। অপ্তোর্যাম অনুষ্ঠানে চার বার স্তোত্র, শস্ত্রপাঠ ও চমসপুঞ্জের আহুতিদান করতে হয়। এই চারটি স্তোত্রকেই "অপ্তোর্যাম স্তোত্র" এবং শস্ত্রগুলোকে "অপ্তোর্যাম শস্ত্র" বলে।[১]

২.৪.২৭ অন্ত্যেষ্টি : অন্ত্যেষ্টি শব্দটি "অন্ত" এবং "ইষ্টি" এই দুটি শব্দের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। এই সংস্কারটি মৃত্যুর পরে শরীর ভস্ম হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত করা হয়ে থাকে। এটি মানবজীবনের ঐহিক সংস্কার যার দ্বারা ঐহিক পথযাত্রার সমাপ্তি হয়ে পারলৌকিক গন্তব্যস্থানের প্রাপ্তি ঘটে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধি সম্পর্কে *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে মৃতদেহ দাহ করার পূর্বে মৃতের কেশ, শ্মশ্রু (দাঁড়ি), নখ কেটে ফেলতে হবে।[২] *আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে* এই বিধি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মৃতকে পূর্বদিকে মাথা করে শয়ন করিয়ে ওই মৃতের চুল, দাড়ি, নখ ও লোম কেটে ফেলে, অন্ত্রের মল নিষ্কাশন করে, নূতন বস্ত্রে মৃতদেহকে আচ্ছাদিত করে, বস্ত্রের পিছন দিকের কিছুটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে অবশিষ্ট বস্ত্র দিয়ে মৃতদেহকে আবৃত করতে হয়। মৃতের দুটি চরণ রাখতে হয় অনাবৃত।[৩] *কৌশিক গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে যদি কোনও ব্যক্তির কাক, পিপীলিকা, সর্প, ব্যাঘ্র, শিংযুক্ত জন্তু দ্বারা বা জন্তুর শিং, নখ, দন্তের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে তাহলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ "যত্তে কৃষ্ণঃ শকুনি" এই তিনটি ঋক্ দ্বারা অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত করে দষ্ট ব্যক্তিকে ওই

---

[১] গৌ. ধর্ম. সূ ১/৮/২১, শত. ব্রা ১৩/৭/৬/১

[২] আ.গৃ.সূ ৪/১/১৫

[৩] আ.শ্রৌ.সূ ৬/১০

আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হবে।[১] গো দ্বারা চালিত শকট অর্থাৎ গাড়িতে করে মৃতদেহকে সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যেতে হয়। অনেকের মতে একটি স্ত্রী পশুকেও ওই মৃতদেহের সঙ্গে আচ্ছাদন করাতে হয়। প্রয়াতের সাথে যে স্ত্রী পশুকে আচ্ছাদন করাতে হয় সেই পশুকে বলা হয় অনুস্তরণী। এই অনুস্তরণী পশু সাধারণত গাভীকে অথবা একবর্ণযুক্ত স্ত্রী ছাগকে অথবা কৃষ্ণ বর্ণ যুক্ত ছাগীকে করা হয়ে থাকে। মৃতের আত্মীয়েরা অনুস্তরণী পশুটির বাম বাহুতে দড়ি বেঁধে তাকে মৃতের পিছন পিছন নিয়ে আসবেন।[২]

শবযাত্রার সময় মৃতের আত্মীয়েরা অগ্নি ও যজ্ঞপাত্রসমূহ নিয়ে যাবেন। এই দুটির পশ্চাতে থাকবে প্রয়াত ব্যক্তি। তারপর ওই প্রয়াত ব্যক্তির পশ্চাতে থাকবে বিজোড় সংখ্যক অমিশ্রিত বৃদ্ধগণ যাঁরা মৃতদেহ বহন করবেন। শবযাত্রায় নারী এবং পুরুষও মিশ্রিত অবস্থায় থাকবেন না। এই শবযাত্রার প্রথমে থাকবেন বয়োজ্যেষ্ঠগণ এবং পিছনে থাকবেন কনিষ্ঠগণ। প্রয়াতের আত্মীয়েরা দেহের নিম্নাংশে যজ্ঞোপবীত রেখে শিখা মুক্ত করে অনুগমন করবেন।[৩]

যে স্থানে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করা হবে সেই শ্মশানের সব দিক হবে উন্মুক্ত এবং বহু ওষধিযুক্ত। শ্মশানে কাঁটাগাছ, দুগ্ধতুল্য রসযুক্ত গাছ এবং অপামার্গ, শাক, তিল্বক, পরিব্যাধ গাছগুলি মূলসমেত কেটে ফেলে দিতে হবে।[৪]

---

[১] কৌ. গৃ. সূ ১১/৮০/৬

[২] আ.গৃ.সূ ৪/২/৩-৮

[৩] আ.গৃ.সূ ৪/২/১-২, ৯

[৪] আ.গৃ. সূ ৪/১/১১-১৩

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র অনুসারে শ্মশানে পৌঁছানোর পর মৃতদেহকে ভূমিতে রেখে মৃতের আত্মীয়েরা দক্ষিণ-পূর্ব অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ভূমির একাংশ খনন করবেন। যে স্থানটি খনন করা হবে সেটি দক্ষিণ দিকে অথবা দক্ষিণ-পূর্বদিকে অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নীচু হবে। মানুষ ঊর্ধ্ববাহু হলে যে পরিমাণ হয় সেই পরিমাণ দীর্ঘ এবং ব্যাস-পরিমিত অর্থাৎ ১২০ আঙ্গুল প্রস্থযুক্ত গভীর হবে এই গর্তটি।[১] এরপর শ্মশানভুমিতে এসে অনুষ্ঠানকর্তা ডানদিকে, বামদিকে তিনবার পরিক্রমা করতে করতে "অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্। অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসনামস্মৈ।।"(ঋ.বে ১০/১৪/৯)- এই মন্ত্র দ্বারা ওই স্থানটিতে তিনবার জলপ্রোক্ষণ করবেন। গর্তের প্রান্তে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আহবনীয়াগ্নি স্থাপন করবেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে গার্হপত্য অগ্নিকে স্থাপন করবেন। গর্তের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দক্ষিণাগ্নিকে স্থাপন করবেন। এরপর যিনি এই বিষয়ে জানেন তিনি অগ্নিগুলির মধ্যে দহনসমর্থ একটি কাষ্ঠস্তূপ নির্মাণ করবেন। এরপর যিনি চিতা সাজাতে সমর্থ তিনি ওই তিন অগ্নির মধ্যে কাঠ দিয়ে চিতা সাজাবেন। গর্তে স্বর্ণচূর্ণ বিছিয়ে তার উপর চিতানির্মাণ করতে হবে। চিতানির্মাণের আগে চমস নামে এক পাত্রে জল নিয়ে পূর্ব দিকে পাত্রটি রেখে দেওয়া হয়। সেই চিতায় বর্হি এবং একটি কৃষ্ণমৃগের চর্ম বিছিয়ে রাখবেন। মৃগচর্মের লোমপূর্ণ দিকটি থাকবে উপরে। মৃতকে গার্হপত্য অগ্নির উত্তর দিকে নিয়ে এসে মৃতের মাথাটি আহবনীয় অগ্নির দিকে মৃগচর্মে শয়ন করানো হবে। মৃত যদি ক্ষত্রিয় বর্ণের হন তাহলে তাঁর ধনুক উত্তর দিকে রাখা হবে। এরপর "ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়। অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম।।"(ঋ.বে ১০/১৮/৯)- এই মন্ত্রে মৃত ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে ধনুক তুলে

[১] আ.গৃ.সূ ৪/১/৬-১০

নেওয়া হবে। এরপর ধনুকের উপর ছিলা আরোপণ করে অন্য দ্রব্যগুলি একত্র করার আগেই এই ধনুকটি ভেঙে দহনস্থানে নিক্ষেপ করতে হবে। প্রয়াতের পত্নীকেও মৃতের উত্তরদিকে শায়িত করানো হবে। এরপর মৃতের পত্নীকে তাঁর দেবর, শিষ্য অথবা বৃদ্ধ ভৃত্য ওই চিতা থেকে "উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ।।" (ঋ. বে ১০/১৮/৮)- এই মন্ত্র পাঠ করে তুলে আনবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে মৃত যদি শূদ্র হন সেক্ষেত্রে মৃতের আত্মীয়দের মধ্যে যিনি এই সৎকারের অনুষ্ঠান করবেন তিনিই জপ করবেন। সেক্ষেত্রে বৃদ্ধ ভৃত্য যদি মৃতের পত্নীকে চিতা থেকে তুলে আনেন তাহলে দাহকর্তাই "উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ।।" (ঋ. বে ১০/১৮/৮)- এই মন্ত্র পাঠ করে তুলে আনবেন। বর্ণভেদে এই সমস্ত কার্য করার পর মৃতের দেহের উপর কাঠ দিয়ে স্তূপ সাজাতে হবে।[১] এরপর যজ্ঞপাত্রগুলি তুলে মৃতের দেহের ওপরে রাখতে হবে। মৃতের ডান হাতে থাকবে জুহু (হাতার মতো দেখতে আহুতিদানের একটি কাষ্ঠনির্মিত পাত্র), বাম হাতে থাকবে উপভৃৎ (অশ্বত্থকাঠে তৈরি হাতলযুক্ত হাতা। পাত্রটি সাড়ে চার আঙুল বিস্তৃত এবং চার আঙ্গুল গভীর হবে)। মৃতের ডান পাশে থাকবে স্ফ্য (খয়েরকাঠের তৈরী ছোট খড়্গ) এবং বাম পাশে থাকবে অগ্নিহোত্রহবনী (যে হাতা দিয়ে দুগ্ধ তুলে অগ্নিহোত্রের আহুতি দেওয়া হয়)। মৃতের বক্ষে থাকবে ধ্রুবা (বিকঙ্কতকাঠে তৈরি হাতলযুক্ত সাড়ে চার আঙ্গুল মুখবিশিষ্ট হাতা), মাথায় থাকবে কপালসমূহ (মাটির পিঠে সেঁকার পাত্র), দন্তে গ্রাবসমূহ (সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশনের ছোট পাথর), দুটি নাসিকায় দুটি স্রুব (খয়ের কাঠের তৈরি চব্বিশ আঙ্গুলবিশিষ্ট দীর্ঘ হাতা) রাখতে হবে। এক্ষেত্রে যদি স্রুব একটি থাকে তাহলে

[১] আ.গৃ.সূ ৪/২/১১-২০,২২

সেটিকে দুভাগে ভেঙে দুটি নাসারন্ধ্রে একটি করে খণ্ড রাখা হবে। মৃতের দুটি কানে দুটি প্রাশিত্রহরণ (গরুর কানের মতো দেখতে ছোট একটি পাত্র) রাখতে হবে। মৃতের দুটি কানে এই পাত্র রাখার কারণ হল একটি অগ্নিহোত্রের জন্য এবং অপরটি অন্যত্র ব্যবহারের জন্য। যদি প্রাশিত্রহরণ পাত্র একটি থাকে সেক্ষেত্রে একটিকে ভেঙে দুটি কানে একটি করে খণ্ড রাখতে হবে। উদরে রাখা হবে হব্যদ্রব্য রাখার পাত্রী এবং যে চমসে ইড়া রাখা হয় সেই চমস। লিঙ্গে রাখা হবে শম্যা (কাঠের তৈরী একটি ছোট খিল), দুটি ঊরুতে রাখা হবে দুটি অরণি এবং দুটি জঙ্ঘায় রাখা হবে হামানদিস্তা। দুটি পায়ে রাখা হবে কুলা। এক্ষেত্রেও কুলা যদি একটি হয় তাহলে সেটিকে দুটি খণ্ডে ভেঙ্গে রাখা হবে। এরপর মুখগহ্বর বিশিষ্ট জুহু প্রভৃতি পাত্র পৃষদাজ্য (জল এবং ঘিয়ের সংমিশ্রণ) দিয়ে পূরণ করে তারপর সেগুলিকে মৃতের অঙ্গে স্থাপন করতে হবে। এরপর মৃতের পুত্র দৃষদুপল (আটা পিষ্ট করার চাকি এবং বেলন অথবা শিল ও নোড়া), লোহা, তামা ও মাটির পাত্র নিজের জন্য নিয়ে যাবেন এবং বাকি উপকরণ মৃতের সঙ্গে রেখে যাবেন। এরপর আচ্ছাদক স্ত্রী পশুটির থেকে বপা অর্থাৎ মাংস বা চর্বি মৃত পশুটির থেকে নিয়ে "অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণূষ্ব পীবসা মেদসা চ। নেত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হষাণো দধৃগ্বিধক্ষ্যং পর্যঙ্খয়াতে।"(ঋ.বে ১০/১৬/৭)- এই মন্ত্র দ্বারা মৃতের মস্তক এবং মুখে আচ্ছাদিত করবেন। এরপর মৃতের অনুষ্ঠানকারী পশুর বৃক্ক দুটিকে "অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা। অথা পিতৃন্তসুবিদত্রাঁ উপেহি যমেন যে সাধমাদং মদন্তি।"(ঋ.বে ১০/১৪/১০)- এই মন্ত্রের দ্বারা পশুর থেকে তুলে নিজের দুই হাতে রাখবেন। অনেকের মতে বৃক্ক ছাড়াও ময়দা বা চালের দুটি পিণ্ড তৈরি করে অনুষ্ঠানকারী তাঁর দুটি হাতে রাখতে পারেন অথবা বৃক্কের পরিবর্তে হৃৎপিণ্ডও অনুষ্ঠানকারী তাঁর দুটি হাতে রাখতে পারেন। এরপর পশুর হৃৎপিণ্ডটি বিনা মন্ত্রেই মৃতের হৃৎপিণ্ডে

রাখবেন। তারপর অনুস্তরণী পশুর সব অঙ্গকে মৃতের শরীরের সেই সেই অঙ্গের উপর স্থাপন করে পশুর চর্ম দ্বারা মৃতের দেহকে আচ্ছাদিত করে প্রণীতা প্রণয়ন জলকে "ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাম্। এষশ্চসো দেবপানস্তস্মিন্দেব অমৃতা মাদয়ন্তে।।" (ঋ.বে ১০/১৬/৮)- এই মন্ত্র দ্বারা অনুমন্ত্রণ করবেন। এরপর সংস্কারকারী অর্থাৎ অনুষ্ঠানকারী বাম হাঁটুকে মাটিতে রেখে দক্ষিণাগ্নিতে "অগ্নয়ে স্বাহা কামায় স্বাহা লোকায় স্বাহানুমতয়ে স্বাহেতি"- এই মন্ত্রে আজ্য আহুতি দেবেন। এরপর "অস্মাদ্ বৈ ত্বমজা যথা অয়ং ত্বদধিজায়তামসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি"- এই মন্ত্রে মৃতের বক্ষে সংস্কারকারী পঞ্চম আহুতি দেবেন।[১] এরপর পরিচারকদের যুগপৎ অগ্নিগুলিকে প্রজ্বলিত করার নির্দেশ দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে আহবনীয় অগ্নি যদি মৃতকে স্পর্শ করে তাহলে বুঝতে হবে মৃত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। যদি মৃতকে গার্হপত্য অগ্নি স্পর্শ করে তাহলে মৃত অন্তরিক্ষলোক লাভ করবেন। যদি মৃতকে দক্ষিণাগ্নি স্পর্শ করে তাহলে বোঝা যাবে মৃত মনুষ্যলোক লাভ করবেন। ব্রহ্মবাদীরা বলেন যে যদি মৃত ব্যক্তিকে তিনটি অগ্নিই একসঙ্গে স্পর্শ করে তাহলে মৃত ব্যক্তি পরলোক গমন করবেন এবং ইহলোকে তাঁর পুত্র পরম সমৃদ্ধিলাভ করবে। এইভাবে মৃত ব্যক্তি যখন দগ্ধ হতে থাকবেন তখন তাঁকে 'প্রেহি প্রেহি' ইত্যাদি ঋগ্বেদের চব্বিশটি মন্ত্রের দ্বারা অনুমন্ত্রণ করতে হবে।[২] এরপর যিনি দাহকর্তা তিনি 'ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্নভূদ্ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য। প্রাঞ্চো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।।" (ঋ.বে ১০/১৮/৩)- এই মন্ত্রটি জপ করবেন এবং শ্মশানে উপস্থিত সকলে ডান দিক থেকে বাম দিকে পরিক্রমণ করে পিছন দিকে না তাকিয়ে স্থির জলের কাছে এসে

[১] আ. গৃ. সূ ৪/৩/১-২৬

[২] ঋ.বে ১০/১৪/৭, ৮, ১০, ১১, ১০/১৬/১-৬, ১০/১৭/৩-৬, ১০/১৮/১০-১৩, ১০/১৫৪, ১০/১৪/১২

একবার মাত্র অবগাহন করবেন। মৃতের গোত্র ও নাম উচ্চারণ করে এক অঞ্জলি করে জল মৃতের উদ্দেশ্যে অর্পণ করবেন এবং জল থেকে উঠে অন্য বস্ত্র পরিধান করে পূর্বপরিহিত জলসিক্ত বস্ত্রগুলি একবার ভালভাবে নিংড়ে বস্ত্রের অগ্রভাগ উত্তরদিকে থাকে এমনভাবে শুষ্ক করার জন্য ছড়িয়ে দিয়ে নক্ষত্র অথবা সূর্যমণ্ডলের সামান্য অংশ দেখা গেলে মৃতের আত্মীয়েরা যাঁরা কনিষ্ঠ তাঁরা প্রথমে এবং যাঁরা জ্যেষ্ঠ তাঁরা পশ্চাতে গৃহে প্রবেশ করবেন।[১]

মৃতদেহের সৎকার করার পর গৃহে প্রবেশ করার আগে প্রস্তর, অগ্নি, গো-বিষ্ঠা, খই, তিল ও জল স্পর্শ করতে হবে। যেদিন মৃতদেহকে দাহ করা হবে সেদিন গৃহে অন্নপাক করা যাবে না। কেনা বা বাইরের খাবার খেয়ে থাকতে হবে। তিন রাত্রি লবণযুক্ত কোনও খাবার ভক্ষণ করা যাবে না। মাতা, পিতা এবং সমগ্র বেদবিদ্যা যাঁর নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছে সেই গুরুর মৃত্যু হলে বারো দিন দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হবে। বেদবিদ্যানকারী সপিণ্ড গুরু প্রয়াত হলে দশ দিন দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হবে এবং অসপিণ্ড গুরু প্রয়াত হলে দশ দিন বা বারো দিন দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হবে। অন্য আচার্যগণ অর্থাৎ বেদের কিছু অংশ যাঁরা পড়িয়েছেন তাঁরা প্রয়াত হলে তিন রাত্রি দান ও অধ্যয়ন বন্ধ থাকবে। সজ্ঞাতির কেউ প্রয়াত হলে তিন রাত্রি অধ্যয়ন বন্ধ থাকবে। অবিবাহিতা নারী প্রয়াত হলে দশ দিন দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হবে। বিবাহিতা নারী প্রয়াত হলে তিন রাত্রি দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হবে। দাঁত ওঠেনি এমন শিশু প্রয়াত হলে তিন রাত্রি দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হবে। গর্ভস্থ পুত্র বিনষ্ট হলে তিন রাত্রি দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হবে। সহপাঠী প্রয়াত

[১] আ.গৃ.সূ ৪/৪/১-১২

হলে একদিন দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হবে। একই গ্রামনিবাসী শ্রোত্রিয় প্রয়াত হলে একদিন দান ও অধ্যয়ন বন্ধ থাকবে।[১]

দাহকর্মের পর মৃতের অস্থির সঞ্চয়ন করতে হবে। কৃষ্ণপক্ষের দশমীর পর একাদশী, ত্রয়োদশী অথবা পঞ্চদশী তিথিতে মৃতের অস্থি সংগ্রহ করতে হবে। পুরুষের অস্থি বিশেষ লক্ষণবিহীন কলসে এবং নারীর অস্থিবিশেষ লক্ষণবিহীন কলসীতে বৃদ্ধ স্ত্রী এবং পুরুষ আলাদা আলাদাভাবে সংগ্রহ করবেন। অস্থিগুলি যিনি সংগ্রহ করবেন তিনি চরণ থেকে মস্তক পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অস্থিগুলি সংগ্রহ করবেন।[২] এরপর দাহকর্তা সেই স্থানটিকে তিনবার ডান থেকে বাম দিকে পরিক্রমা করতে করতে "শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।মণ্ডূক্যা সু সং গইমং স্বগ্নিং হর্ষয়।" (ঋ.বে ১০/১৬/১৪)- এই মন্ত্রে শমীশাখা দিয়ে সেই কলসীতে দুগ্ধমিশ্রিত জল ছিটাবেন (আ. গৃ. সূ ৪/৫/৩)। এরপর ছাঁকনি দিয়ে অস্থি থেকে ভস্ম ছেঁকে নিতে হবে এবং অস্থিসমাধি স্থলে (শ্মশানের যেখানে বর্ষার জল ছাড়া অন্য কোনও জল প্রবাহিত হয় না) "উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম৷ ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতেরুপস্থাৎ" (ঋ.বে ১০/১৮/১০)- এই মন্ত্র দ্বারা অস্থিকলসটিকে রেখে দিতে হবে। (আ. গৃ. সূ ৪/৫/৫)। এরপর "উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সুপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা। মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি।।" (ঋ. বে ১০/১৮/১১)- এই মন্ত্র দ্বারা গর্তটিতে মাটি ছড়াবেন এবং মাটি ছড়াবার পর " উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম৷ তে গৃহাসো ঘতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহমৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র।।" (ঋ.বে ১০/১৮/১২)- এই মন্ত্রের দ্বারা জপ করবেন। "উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং

[১] আ. গৃ. সূ ৪/৪/১৩-২৭

[২] আ. গৃ. সূ ৪/৫/১,২,৪

ত্বৎপরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষম্। এতাং স্থূনাং পিতরো ধারয়তু তেহত্রা যমঃ সাদনা তে মিনেতু।।" (ঋ. বে ১০/১৮/১৩)- এই মন্ত্রে শরা দিয়ে অস্থিকলসটিকে ঢেকে পিছনে না তাকিয়ে প্রত্যাবর্তন করে স্নান করে এই মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করা হবে।

আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র অনুসারে গুরুর মৃত্যুর পর অথবা অন্য দিক থেকে শ্রীহীন হয়ে গেলে অর্থাৎ পুত্র, পশু, হিরণ্য ইত্যাদির বিনাশ হতে থাকলে অমাবস্যাতে শান্তিকর্ম করতে হবে। এই শান্তিকর্ম করার নিয়ম হল সূর্যোদয়ের পূর্বে গার্হপত্য অগ্নিকে (যে অগ্নিকে যাবজ্জীবন সংরক্ষণ করতে হয় অর্থাৎ পাক করা হয় যে অগ্নির দ্বারা) ভস্ম ও পাত্রসমেত "ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ। ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন।।" (ঋ. ১০/১৬/৯)- এই মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণ দিকের চতুষ্পথে, অন্য কোনও দিকের চতুষ্পথে অথবা চতুষ্পথ ছাড়া অন্যত্র যেখানেই অগ্নিকে পাওয়া গেছে সেই স্থানেই ওই অগ্নিকে রেখে বাম হাত দিয়ে বাম উরুতে আঘাত করতে করতে সেই অগ্নিকে ডান দিক থেকে বাম দিকে তিনবার পরিক্রমা করতে হবে। এরপর পিছনে না তাকিয়ে প্রত্যাবর্তন করে, স্নান সেরে কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ কেটে শমীপুষ্পের মালাবিশিষ্ট নতূন ভাঁড়, কলশ ও আচমনের উপযোগী জলপাত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর শমীবৃক্ষের কাষ্ঠ, শমীকাষ্ঠের দুটি অরণি এবং শমীশাখার তিনটি পরিধি, বৃষের বিষ্ঠা ও চর্ম, মাখন, প্রস্তর এবং গৃহে যতজন যুবতী আছে সেই সংখ্যক কুশগুচ্ছও প্রস্তুত রাখতে হবে। এরপর অপরাহ্নে অগ্নিহোত্রের সময়ে শমীকাঠে তৈরি দুটি অরণি ঘর্ষণ করে "ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা ইত্যর্ধর্চেন"- এই মন্ত্র দ্বারা রন্ধনকার্যের জন্য অগ্নি উৎপাদন করতে হবে। সেই অগ্নিকে জ্বালিয়ে রেখে কুলবৃদ্ধদের কাহিনী, মাঙ্গলিক ইতিহাস ও পুরাণসমূহ বর্ণনা করতে হবে। এরপর গভীর রাত্রিতে সহযাত্রীরা গৃহে বা শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে মুখাগ্নিকারী

“তন্তুং তন্বনুজসো ভানুমিন্বিহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্। অনুমল্বণং বয়ত জোগুবামপো মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনম্।” (ঋ. বে ১০/৫৩/৬)- এই মন্ত্র উচ্চারণ করে গৃহের দক্ষিণ দ্বার থেকে উত্তর দ্বার পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় জল ঢালবেন।[১]

এরপর গার্হস্পত্য অগ্নিতে “আরোহতায়ুর্জরসং বৃণানা ইতি” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধ যুক্ত করে একটি বৃষচর্ম বিস্তৃত করতে হবে। এই চর্মের গ্রীবাটি অগ্নির পশ্চিম দিকে এবং লোমপূর্ণ দিকটি অগ্নির পূর্বদিকে থাকবে। তারপর “ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতম্ শতং জীবন্তু শরদঃ পুরুচীরন্তমর্ত্যুং দধতাং পর্বতেন।।” (ঋ. বে ১০/১৮/৪) এই মন্ত্র দ্বারা পরিধি (অগ্নির বা কুণ্ডের পূর্ব ছাড়া অপর তিন দিকে যে কাঠ রাখা হয় তাকে বলা হয় পরিধি) স্থাপন করতে হবে। এই পরিধির কাঠগুলোকে পশ্চিমদিকে রাখতে হবে। এই কাঠগুলির মধ্যে একটি কাঠ উত্তরমুখী এবং বাকি দুটি কাঠ পূর্বমুখী করে রাখতে হবে। অগ্নির উত্তরদিকে “অন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেনেত্যশ্মানম্ ইত্যুত্তরতোঽগ্নেঃ কৃত্বা” এই চরণটি বলে একটি প্রস্তর স্থাপন করে “পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাম্ ইতি চতসৃভিঃ ইতি চতসৃভিঃ প্রত্যচং হুত্বা যথাহান্যনুপূর্বং ভবন্তীত্যমাতান ঈক্ষেত” (ঋ.বে ১০/১৮/১-৪)- এই চারটি মন্ত্রে আহুতি দিয়ে দাহকর্তা গৃহের পরিজনদের দেখবেন। গৃহের যুবতীরা পৃথকভাবে দুটি হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে তরুণ দর্ভঘাসে রাখা মাখন দিয়ে দুটি চোখ অনুলিপ্ত করে, পিছনে না তাকিয়ে এই দর্ভগুলি পিছনে ফেলে দেবেন। যুবতীদের চোখে আজ্য অর্থাৎ ঘি লেপনের সময় মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি “ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু। অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ইক্ষেত” (ঋ.বে

[১] আ.গৃ.সূ ৪/৬/১-৭

১০/১৮/৭)- এই মন্ত্রের দ্বারা ওই যুবতীদের দেখবেন। এরপর দাহকর্তা "অশ্মন্বতীরীয়তে সংরভধ্বম্ ইত্যশ্মানং কর্তা প্রথমোঽভিমৃশেৎ" এই মন্ত্রের দ্বারা প্রথমে (আ.গৃ .সূ ৪/৬/৪) মৃতের দেহ থেকে আনা প্রস্তরখণ্ড স্পর্শ করবেন। তারপর অন্যেরা ওই প্রস্তরখণ্ডটি স্পর্শ করবেন। পরিজনেরা "আপো.....জনয়থা চ নঃ" (ঋ. বে ১০/৯/১-৩)- এই তৃচে বৃষের গোময় ও অবিচ্ছিন্ন জলধারা নিয়ে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকলে দাহকর্তা উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থান করে "পরীমে গামনেষত পর্যগ্নিমহৃষত। দেবেষ্বক্রত শ্রবঃ ক ইমাং আ দধর্ষতি।"(ঋ.বে ১০/১৫৫/৫)- এই মন্ত্রটি জপ করবেন। এরপর স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি অঙ্গের অনুষ্ঠান করতে হবে এবং তার জন্য পিঙ্গলবর্ণের বৃষকে অগ্নির চারিদিকে পরিক্রমা করাতে হবে। তারপর তৃপ্তি পাওয়া যাবে এমন স্থানে একটি নতুন বস্ত্র বিছিয়ে তার উপর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অনিদ্রিত অবস্থায় সকলে বসবেন। এরপর সূর্য উদিত হলে সূর্যসূক্ত ও স্বস্ত্যয়নসূক্ত জপ করে অন্ন প্রস্তুত করে, আহুতি দিয়ে সেই অন্ন থেকেই ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে তাঁদের দিয়ে মঙ্গলবাক্য বলানো হবে। এরপর গাভী, কাঁসার পাত্র এবং নূতন বস্ত্র দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণদের দেওয়া হবে।[১] এইভাবে পরিধিকর্ম সমাপ্ত হয় এবং অন্ত্যেষ্টি সংস্কার সম্পন্ন হয়ে থাকে।[২]

২.৪.২৮ শ্রাদ্ধ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর শ্রাদ্ধকর্ম করা হয়। শ্রাদ্ধ কথার অর্থ হল শ্রদ্ধাপূর্বক দান অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাযুক্তভাবে ব্রাহ্মণদের যা দেওয়া হয় তাকেই শ্রাদ্ধ বলা হয়।[৩] *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র* অনুসারে শ্রাদ্ধ চতুর্বিধ। সেগুলি হল– পার্বণ শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ

[১] আ.গৃ.সূ ৪/৬/৮-১৮, উ.সং ৩/১১৫

[২] কৌ. গৃ. সূ ১১/৮০/১-৪৬, ১১/৮১/১-৪৮, ১১/৮২/১-৪৭

[৩] আ.গৃ.সূ ৪/৭/৮

শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। পার্বণশ্রাদ্ধ কথাটি পার্বণ এবং শ্রাদ্ধ এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক পর্বে যে শ্রাদ্ধ হয় তাকেই পার্বণ শ্রাদ্ধ বলে। কেবল অমাবস্যাতেই এই শ্রাদ্ধ হয়। পিতৃগণ একমাস ব্যাপী চাল, তিল প্রভৃতি শস্য এবং ওষধি, ফল, জল প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্ত হন। এইসব দ্রব্যের অভাবে বন্য ফল, মূল বা ওষধি দ্বারা পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত করা যায় অথবা ছাগাদি খাদ্য ফল, মূল ও ওষধিসমূহের সঙ্গে দান করা যায় তার দ্বারাও তাঁরা তৃপ্ত হন। ছাগ, শিংরহিত ছাগাদি পশু এবং মেষ ক্রয় করে বা লাভ করে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পাক করতে হয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই পশু যেন স্বয়ং অর্থাৎ নিজেই মৃত না হয়। অর্থাৎ মরা পশু পাক করা যাবে না। মাছ দ্বারা দুই মাস, হরিণের মাংস দ্বারা তিন মাস, বন্য পশুর মাংস দ্বারা চার মাস, পক্ষীর মাংস দ্বারা পাঁচ মাস, ছাগমাংস দ্বারা ছয় মাস, কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপের মাংস দ্বারা নয় মাস, মহিষের মাংস দ্বারা দশমাস, চিত্রমৃগের মাংস দ্বারা এগারো মাস এবং সংবৎসর পর্যন্ত দুগ্ধ দ্বারা ও দুগ্ধজাত দ্রব্য দ্বারা অথবা রক্তবর্ণীয় ছাগমাংস দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্ত হন।[১]

নানাবিধ কল্পসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র অনুসারে যাবতীয় সংস্কারের নাম ও তাদের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।

[১] পা. গৃ. সূ শ্রাদ্ধসূত্রকণ্ডিকা-৭

তৃতীয় অধ্যায়:

শিক্ষাবিষয়ক সংস্কাররূপে উপনয়ন ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার

৩.১ ভূমিকা:

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কোনও বিদ্যার্থী উপনয়নের দ্বারা দ্বিজ নামে অভিহিত হতেন। এই সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত না হলে তাঁকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হত না। তাঁদের সমাজ-বহির্ভূত 'ব্রাত্য' রূপে থাকতে হত।

উপনয়ন না হলে শিক্ষার অধিকারও অর্জন করা যায় না। এককথায় বলা যেতে পারে উপনয়নই হল শিক্ষার অধিকারের প্রধান দ্বারস্বরূপ।

প্রাচীন সূত্রসাহিত্য ও স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে পালনীয় যে সব সংস্কারের বিষয় আলোচিত হয়েছে তাদের মধ্যে বিবাহ, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন- এই তিনটিই প্রধানত আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই তিনটির মধ্যে উপনয়ন সংস্কারটি মূলত কিশোর বালকের সংস্কার। উপনয়নের অধিকার কেবল দ্বিজাতির (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য- এই তিন বর্ণের) আছে। এই সংস্কার দ্বারা তাঁরা দ্বিজ বা দ্বিজাতি নাম লাভ করেন। এই উপনয়নরূপ সংস্কারই হল ছাত্রজীবনে প্রবেশের প্রধান দ্বার এবং তখন থেকেই প্রকৃত শিক্ষাচর্চা শুরু হয়।

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নানাবিধ সংস্কারের মধ্যে অন্যতম সংস্কার হল উপনয়ন। উপনয়ন ছাড়া কোনও ব্যক্তি শ্রৌত বা স্মার্ত কর্মের অধিকারী হতে পারেন না। উপনয়ন-সংস্কারকে ব্রতবন্ধ সংস্কার বলা হয়, কারণ এই সংস্কারে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে শিক্ষার্থী বিশেষ বিশেষ ব্রতে নিবিষ্ট হন।

প্রাচীন ভারতীয়দের সমাজে নবীন-বরণরূপ উপনয়ন সংস্কারের প্রবর্তন হয়েছিল। এই সংস্কারের দ্বারা কিশোর বালককে শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত গুরুগৃহে আহ্বান করা হত। কারণ এই উপনয়নের দ্বারাই কোনও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত সমাজে পবিত্রভাবে প্রবেশ করার সুযোগ পেতেন এবং সমাজের একজন নতুন ও অকলুষিত সদস্য হয়ে সামাজিক কর্তব্য পালন করতে পারতেন। সম্ভবতঃ সভ্যতার প্রথম দিকে এই উপনয়ন সংস্কারটি কেবলমাত্র সামাজিক প্রথারূপেই প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে এটিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তৈত্তিরীয় সংহিতা-য় বলা হয়েছে মানবজাতি তিনটি ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন- যথা ঋষিঋণ, দেবঋণ এবং পিতৃঋণ।[১] যজ্ঞোপবীত সংস্কারের পর বিহিত ব্রহ্মচর্যব্রতের পালন করে ঋষিঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শৈশবোত্তীর্ণ উপনয়ন সংস্কারকে ঋষিঋণের পরিত্রাতা বলা হয়ে থাকে। উপনয়নই হল শিক্ষার্থীর জ্ঞানগৃহে প্রবেশের দ্বার। এই জ্ঞানই মানুষকে মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে পৃথক করে। উপনয়নের সঙ্গে বেদপাঠ আরম্ভের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। যজন-পূজনের দ্বারা দেবঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আবার গৃহস্থধর্মের পালনপূর্বক সন্তানোৎপত্তি দ্বারা পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যদি কোনও ব্যক্তি এই যজ্ঞোপবীত সংস্কার না করে থাকেন, তাহলে এই তিন কর্ম করার অধিকার তাঁর থাকে না এবং এই তিনটি ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও পথ থাকে না। অতএব কোনও ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত সংস্কার করা খুবই জরুরি। এই সংস্কারের মাধ্যমেই তিনি ব্রহ্মচর্যব্রত এবং বেদাধ্যয়ন করতে পারেন।

---

[১] ব্রহ্মচর্যেন ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ। (তৈ. সং ৬/৩/১০/৫)

৩.২ উপনয়ন-সংস্কারের লক্ষ্য:

দ্বিজত্ব-সিদ্ধি এবং বেদাধ্যয়নের অধিকার লাভ করাই উপনয়নের প্রধান লক্ষ্য। উপনয়ন ব্যতীত কোনও ব্যক্তি কোনও শ্রৌতকর্ম বা স্মার্তকর্মের অধিকারী হতে পারেন না। এই যোগ্যতা বা অধিকার অর্জন করতে গেলে উপনয়ন সংস্কারের পর যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হয়। উপনয়ন ছাড়া দেবকার্য এবং পিতৃকার্য করা সম্ভব হয় না এবং শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম তথা বিবাহ, সন্ধ্যা, তর্পণ প্রভৃতি কর্মেও বালকের অধিকার থাকে না। উপনয়ন সংস্কার সমন্ত্রক এবং এই সংস্কারে যজ্ঞোপবীত ধারণ তথা গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ এই দুটিই প্রধান কর্ম।

৩.৩ উপনয়ন সংস্কারের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ :

উপনয়ন শব্দটি 'উপ' উপসর্গপূর্বক 'নী' ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়।[১] উপনয়ন শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'সমীপে আনয়ন'। 'উপ' অর্থাৎ আচার্যের সমীপে বা নিকটে গিয়ে 'নয়ন' অর্থাৎ বালককে বিদ্যাধ্যয়নের নিমিত্ত আনয়নকেই 'উপনয়ন' সংস্কার বলা হয়। এই সংস্কারে প্রথম যে বিষয়টি দেখা যায় সেটা হল পিতা নিজের সন্তানকে বিদ্যাধ্যয়নের নিমিত্ত আচার্যের কাছে নিয়ে আসেন। গুরুগৃহে আসার পর বালকের মধ্যে যোগ্যতা যাতে আসে তার জন্য গুরু তাঁকে বিশেষ বিশেষ কর্ম দ্বারা সংস্কৃত করেন। এই সংস্কৃত করার আনুষ্ঠানিক সংস্কারই হল উপনয়ন। বিদ্যার্থী ও আচার্যের মধ্যে ব্যবধান থাকে দুস্তর। সেটি হল- উভয়ের মধ্যে একজন অর্থাৎ বিদ্যার্থী স্নেহভাজন এবং অপরজন অর্থাৎ আচার্য হলেন শ্রদ্ধাভাজন। এই প্রসঙ্গে *পারস্কর গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে, আচার্য মাণবকের

[১] কৃত্যল্যুটো বহুলম্ । (অষ্টাধ্যায়ী ৩/৩/১১৩)

(অর্থাৎ শিক্ষার্থী বালক) ডান কাঁধের উপর দিয়ে ডান হাত নিয়ে গিয়ে হৃদয় স্পর্শ করে বলেন যে তিনি শিষ্যের হৃদয়কে ধারণ করেছেন। শিষ্যের চিত্তবৃত্তি যেন গুরুর অনুকূল হয়। শিষ্য যেন একনিষ্ঠ হয়ে গুরুর বাক্য পালন করেন। বৃহস্পতি যেন গুরুর সঙ্গে শিষ্যকে যুক্ত করেন।[১]

অথর্ববেদে সমাজের চোখে ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বেদবিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে অনেক কাব্যময় মন্ত্র আছে।[২] মাতৃগর্ভে শিশু যেমন সুরক্ষিত থাকে অথবা শাখায় যেভাবে ফল থাকে, গুরুগৃহে শিষ্যের অবস্থানও ঠিক তেমনই। *অথর্ববেদে* বলা হয়েছে- উপনয়মান মাণবককে উপগময়ন (উপনয়ন-করণশালী) আচার্য আপন বিদ্যাময় শরীরের মধ্যে অর্থাৎ গর্ভে স্থাপিত করে তিন রাত্রি পর্যন্ত সেই ব্রহ্মচারী মাণবককে আপন উদরে স্থাপন করেন, চতুর্থ দিবসে সেই বিদ্যাময় শরীর থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মচারী দর্শনের নিমিত্ত তাঁর সম্মুখে আগত হন।[৩]

বীরমিত্রোদয়ের *সংস্কারপ্রকাশ* নামক গ্রন্থে উপনয়ন শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে উপনয়ন শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত, "উপ সমীপে আচার্যাদীনাং বটোর্নীতির্নয়ন প্রাপণমুপনয়নম্", দ্বিতীয়ত, "সমীপে আচার্যাদীনাং নীয়তে

---

[১] অথাস্য দক্ষিণাংসমধি হৃদয়মালভতে। মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি। মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব। বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম।। (পা. গৃ. সূ ২/২/১৬)

[২] অ.বে ১১/৩/১-৩

[৩] আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণাং কৃণুতে গর্ভমেন্তঃ। তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভিসংযন্তি দেবাঃ। অ. বে ১১/৩/১/৩

বটুর্যেন তদুপনয়নামিতি বা"।[১] একটি অর্থ হল- আচার্যের কাছে বটু অর্থাৎ বালককে নিয়ে আসা। যে সংস্কার বা আচার নিয়ম প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বটু বা বালক আচার্যের কাছে আনীত হয় তাকে উপনয়ন বলে। অপর অর্থ হল যে প্রাচীন ভারতে প্রথমে লেখাপড়া শেখার জন্য বালককে আচার্যের কাছে নিয়ে আসা হত এবং এই সময় হয়তো কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান করা হত না অথবা কালক্রমে বালককে গুরুগৃহে বেদশিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া উপলক্ষে শাস্ত্রীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা শুরু হয়েছিল। এই গ্রন্থে একথাও বলা হয়েছে যে বালকের বিদ্যালাভের জন্য যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তার নাম উপনয়ন।[২]

৩.৪ উপনয়ন সংস্কারের বিবিধ নাম:

উপনয়ন সংস্কারকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়- উপায়ন, উপনয়ন, উপনীতি, মৌঞ্জীবন্ধন, বটুকরণ, ব্রতবন্ধ ও যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি। এই সংস্কারকে যজ্ঞোপবীত সংস্কার বলা হয়, কারণ এই সংস্কারে ব্রহ্মচারীকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করানো হয়। যজ্ঞোপবীত বিদ্যাধ্যয়নের উপযোগী এবং আবশ্যক। এই যজ্ঞোপবীত ব্রহ্মচারী নিজ হাতে কার্পাস সুতো কেটে তৈরি করেন অথবা কোনও ব্রাহ্মণকন্যা বা সাধ্বী ব্রাহ্মণী কার্পাস সুতো কেটে তৈরি করেন। কার্পাস সুতোকে তারের মতো নয় ভাগে ভাগ করে তারপর তিনটি তিনটি করে সুতো নিয়ে একটি তার তৈরি করে তিন বৃত্তের একটি মালা তৈরি করা হয়। তারপর ব্রহ্মগ্রন্থি লাগিয়ে গায়ত্রী ও প্রণব মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করার পরে তার যজ্ঞোপবীত নাম দেওয়া হয়। দ্বিজ বালক শ্রৌত এবং স্মার্ত কর্ম করার জন্য আয়ু, কাল অর্থাৎ সময়ের সাথে

---

[১] সং. প্র পৃষ্ঠা-৩৩৪

[২] উপায়নাখ্যং যৎকর্ম বিদ্যার্থ তদুদীরিতম্ । সং. প্র পৃষ্ঠা-৩৩৪

যজ্ঞোপবীত আচার্য বা গুরু দ্বারা ধারণ করে থাকেন। উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে এই যজ্ঞোপবীত ধারণ করার দ্বারা বালকের দ্বিতীয় জন্ম হয়। যজ্ঞোপবীতের দ্বারা উপনীত বালক বিনশ্বর স্থূল শরীর অপেক্ষা অবিনাশী জ্ঞানময় শরীর লাভ করেন। উপনয়ন সংস্কার হওয়ার পর দ্বিজকে এই যজ্ঞোপবীত অখণ্ডরূপে ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যজ্ঞোপবীত সংস্কারের পর ব্রহ্মচারীকে সদাচার, শৌচাচার, ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি নিয়মগুলি সদাচারণপূর্বক পালন করতে হয়। যম-নিয়ম-সংযম পালন করতে হয়।

উপনয়ন সংস্কারকে মৌঞ্জীবন্ধন সংস্কার বলার কারণ হল এই সংস্কারে তিন বর্ণের মানুষকে মৌঞ্জী অর্থাৎ মেখলা ধারণ করতে হয়। প্রথম বার মাতৃগর্ভ থেকে উৎপত্তি এবং দ্বিতীয় বার মৌঞ্জীবন্ধন সংস্কার পুনরায় জন্ম হিসাবে গণ্য হওয়ায় ত্রৈবর্ণিক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) দ্বিজ নামে অভিহিত হন। একে ব্রতবন্ধ সংস্কার বলার কারণ হল যজ্ঞোপবীত ধারণ করে শিক্ষার্থী বিশেষ বিশেষ ব্রতে নিবিষ্ট হন।

৩.৫ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করানোর অধিকারী :

দ্বিজাতি বালকের উপনয়ন হলে শাস্ত্রীয় ভাষায় তাঁকে মাণবক বলা হয়ে থাকে। মাণবককে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করানো হয় গুরু বা আচার্যের দ্বারা। *যাজ্ঞবল্ক্য গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে যিনি গর্ভাধানাদি উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করে বেদের জ্ঞান দান করেন তিনি হলেন গুরু এবং যিনি কেবলমাত্র উপনয়ন সংস্কার করে বেদের জ্ঞান দান করেন তিনি হলেন আচার্য। যিনি বেদের এক ভাগ অর্থাৎ মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ বা বেদাঙ্গের জ্ঞান দান করেন তিনি হলেন উপাধ্যায় এবং যিনি যজ্ঞ করেন তিনি হলেন ঋত্বিক।[১] *মনুসংহিতায়* বলা

[১] যাজ্ঞ.সং আচারাধ্যায় ২/৩৪-৩৫, বিষ্ণু.সং ২৯/১-৩

হয়েছে যে ব্রহ্মচর্যরূপ ধর্মে যে পুত্র খ্যাতিলাভ করেছেন এবং পিতার কাছ থেকে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ এবং দায় অর্থাৎ ধন লাভ করার অধিকারী হয়েছেন, তাঁকে মাল্যদ্বারা অলঙ্কৃত করে এবং উৎকৃষ্ট শয্যায় অর্থাৎ উচ্চাসনে উপবেশন করিয়ে প্রথমে গোসাধন মধুপর্কের দ্বারা পিতা বা তাঁর অভাবে আচার্য তাঁকে সম্মানিত করবেন। প্রসঙ্গত এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে পিতার কাছ থেকে বেদরূপ ধন কীভাবে ব্রহ্মচারী লাভ করবেন? বালককে তো বেদশিক্ষা দেন আচার্য বা গুরু। এই প্রশ্নের উত্তরে মেধাতিথি বলেছেন, যদি ব্রাহ্মণ বালকের পিতা বর্তমান থাকেন তাহলে সেই পিতাই আচার্য হবেন। পিতা জীবিত না থাকলে বা তিনি অসমর্থ হলে অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ আচার্য তাঁকে বেদাধ্যাপনা করাতে পারেন।[১] *পারস্কর গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে মাণবককে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করার অধিকারী হলেন তাঁর পিতামহ, পিতা, পিতৃব্য, সহোদর, বন্ধু-বান্ধব তথা আপন গোত্রের কোনও মানুষ। এই প্রসঙ্গে বলা হয় যে যদি পিতা জীবিত থাকেন তাহলে পিতার পূর্বপুরুষ যাঁরা আছেন অর্থাৎ পিতামহ প্রমুখ তাঁরা উপনয়ন সংস্কার করাতে পারবেন না। এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্যই প্রযোজ্য। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন পুরোহিতই করান। কারণ এই দুই বর্ণের শাস্ত্র অধ্যাপনা করানোর অধিকার নেই। এই প্রসঙ্গে *পারস্কর গৃহ্যসূত্রের* গদাধর ভাষ্যে বৃদ্ধগর্গ বলেছেন যে- "পিতা পিতামহো ভ্রাতা জ্ঞাতয়ো গোত্রজাগ্রজাঃ। উপায়নেঽধিকারী স্যাৎপূর্বাভাবে পরঃ পরঃ।।" তথা– "পিতৈবোপনয়েত্পুত্রং তদভাবে পিতুর্ভ্রাতা তদভাবে তু সোদরঃ। পিতেতি বিপ্রপরং ন ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ। তয়োস্তু পুরোহিত এব উপনয়নস্য দৃষ্টার্থত্বাৎ। তয়োস্ত্বধ্যাপনেঽনধিকারাত্।"[২] দ্বিজাতি বালকের উপনয়ন হলে শাস্ত্রীয় ভাষাতে তাকে মাণবক

[১] মনু.সং ৩/৩

[২] পা. গৃ. সূ গদাধর ভাষ্যে মহর্ষি বৃদ্ধগর্গের বচন ২/২/১

বলা হয়ে থাকে। এই মাণবককে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করার অধিকারী সম্পর্কে *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে যে উপনয়ন সংস্কারে উপনীত ব্যক্তিরাই নতুন কাউকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করতে পারেন। যে আচার্য বা গুরু এই সংস্কারে শিষ্যকে দীক্ষিত করবেন তিনি বেদের নিয়ম অনুসরণ করবেন। গায়ত্রী মন্ত্রের অধ্যয়ন সমস্ত বেদের অধ্যয়ন করতেই প্রয়োজন, সেই কারণে গায়ত্রী মন্ত্রের অধ্যয়নও গুরু বা আচার্যকে অবশ্যই করতে হবে।[১] উপনয়ন সংস্কারে আচার্য এমন একজন ব্যক্তিকে হতে হবে যাঁর জন্ম বেদবিদ্যা অধ্যয়নের অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাযুক্ত কোনও কুলে হয়েছে, যিনি ছয়টি বেদাঙ্গের সঙ্গে বেদের যে উপযুক্ত অর্থজ্ঞান তার সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং যিনি ধর্মমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হননি। যিনি ধর্মের চয়ন করেন এবং ধর্মের জ্ঞান লাভ করেন তিনিই আচার্য হওয়ার যোগ্য। আচার্যের প্রতি কখনো দ্রোহ এবং অপকার করা উচিত নয়। আচার্যই শিষ্যকে বেদবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন।[২] পিতামাতা সন্তানকে উৎপন্ন করেন, কিন্তু আচার্য পুরুষার্থপ্রাপ্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীকে সমর্থ করেন এবং তাঁকে স্বর্গসুখ তথা নিঃশ্রেয়স মোক্ষলাভ করতে সাহায্য করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে পিতামাতার থেকেও শ্রেষ্ঠ হলেন গুরু।[৩] ব্রহ্মচারী অবস্থায় গুরুগৃহে বাস করার সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতি বালকেরা যথাসম্ভব অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করতেন। এই অধ্যয়নপ্রক্রিয়া চলত মুখে মুখে। অর্থাৎ গুরুর দ্বারা উচ্চারিত পাঠ্যবস্তু শুনেই ব্রহ্মচারীরা সেটিকে উচ্চারণ করে পড়তেন। *শতপথব্রাহ্মণে* বলা

[১] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/৯-১১

[২] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/১২-১৬

[৩] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/১৮

হয়েছে- যে শিক্ষার্থী ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকাল ধরে যজ্ঞের ফল লাভ করেন।[১]

৩.৬ উপনয়নের কাল:

বৈদিক যুগে উপনয়ন সংস্কারই হল শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা বা প্রথম ধাপ। এই সংস্কারের মাধ্যমেই একজন বালক শিক্ষার অঙ্গনে প্রথম পদার্পণ করেন। এই উপনয়ন সংস্কারের কাল সম্পর্কে *বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে, বসন্তে ব্রাহ্মণের, গ্রীষ্মে ক্ষত্রিয়ের, শরতে বৈশ্যর এবং বর্ষায় রথকারের উপনয়ন করার কথা বলা হয়েছে এবং সকল বর্ণই বসন্ত কালে উপনয়ন করতে পারেন একথাও বলা হয়েছে।[২] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বসন্ত ঋতুতে ব্রাহ্মণ বালকের, গ্রীষ্ম ঋতুতে ক্ষত্রিয় এবং শরৎ ঋতুতে বৈশ্য কুমারের উপনয়ন হয়- একথা বলা হয়েছে।[৩]

৩.৭ উপনয়নের বয়স :

উপনয়ন সংস্কারের উপযুক্ত বয়স সম্পর্কে নানারকম মতপার্থক্য আছে এবং তা থেকে উপনয়নের সঠিক বয়স নির্ণয় একটি সমস্যাপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে বিভিন্ন রকম মতামত পাওয়া গেছে। উপনয়নের বয়স সম্পর্কে বলা হয়েছে যে গর্ভ থেকে আট বছর বয়সে ব্রাহ্মণ বালকের, ক্ষত্রিয় বালকের এগারো বছর বয়সে এবং

---

[১] দীর্ঘসত্রং বা এষ উপৈতি যো ব্রহ্মচর্যম্ উপৈতি। শ. ব্রা ১১/৩/৩

[২] বৌ.গৃ. সূ ২.৫.৬, বৈখা. গৃ. সূ ২/৩/১-৩

[৩] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/১৯

বৈশ্য বালকের বারো বছর বয়সে উপনয়ন হবে।[১] *শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন গর্ভ থেকে আট বা দশ বছর বয়সে হবে।[২] *হিরণ্যকেশী* গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন সংস্কার গর্ভ থেকে সাত বছর বয়সে হবে।[৩] *মানব গৃহ্যসূত্র* অনুসারে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন সাত বা নয় বছর বয়সে হবে।[৪] *গৌতম ধর্মসূত্র* অনুযায়ী বৈশ্য বালকের ষোলো বছর বয়সে উপনয়ন সংস্কার হয়।[৫]

কাঠক গৃহ্যসূত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন সংস্কার হয় যথাক্রমে সাত, নয় এবং এগারো বছর বয়সে।[৬]

বিদ্যা থেকে উৎকর্ষ লাভ করার ইচ্ছা যাদের আছে তাদের সাত বছর বয়সে, দীর্ঘ জীবন লাভ করার ইচ্ছা যাদের আছে তারা আট বছর বয়সে, তেজ এবং পুরুষশক্তির অভিলাষী যারা তারা নয় বছর বয়সে, যারা অন্ন কামনা করে তারা দশ বছর বয়সে, যারা ইন্দ্রিয় কামনা করেন তারা এগারো বছর বয়সে এবং পশুশক্তি যারা কামনা করেন তারা বারো বছর বয়সে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হবে।[৭] *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, কোনও পিতা

---

[১] আ.গৃ.সূ ১/১৯/১-৪, আপ. গৃ. সূ ৪/১০/২, আপ. ধর্ম ১/১/১৯, হি. গৃ. সূ ১/১/৩, বৈখ. গৃ. সূ ২/৩/১-৩, বার. গৃ. সূ ৫/১-৩, বৌ.ধর্ম. সূ ১/১/৮-১১, মনু.সং ২/৩৬, যাজ্ঞ.সং আচারাধ্যায় ২/১৪, বিষ্ণু. সং ২৭/১৫-১৭, ব্যা.সং ১/১৯-২১

[২] শা. গৃ. সূ ২/১/১-৩

[৩] হি. গৃ. সূ ১/১/৪

[৪] মা. গৃ. সূ ১/২২/১

[৫] গৌ. ধর্ম. সূ ১/১/১২

[৬] কা. গৃ. সূ ৪১/৪/১/১-৩

[৭] বৌ.গৃ ২/৫/৫, আপ. ধর্ম ১/১/২১-২৬

যদি পুত্রের ব্রহ্মবর্চস কামনা করেন অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যয়নের অর্থগত তেজ কামনা করেন, তাহলে ব্রাহ্মণের উপনয়ন গর্ভ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম বছরে অর্থাৎ তিন বছর তিন মাস থেকে চার বছর তিন মাস পর্যন্ত সময়ে হওয়া কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের পিতা যদি তাঁর পুত্রের বিপুল বল প্রার্থনা করেন, তাহলে গর্ভ থেকে ছয় বছর বয়সে অর্থাৎ চার বছর তিন মাস থেকে পাঁচ বছর তিন মাস সময়ের মধ্যে ক্ষত্রিয় বালকের উপনয়ন সংস্কার করাবেন। বৈশ্যের পিতা যদি বালকের বাণিজ্য থেকে অর্থ প্রার্থনা করেন, তাহলে তার উপনয়ন গর্ভ থেকে আট বছর অর্থাৎ ছয় বছর তিন মাস থেকে সাত বছর তিন মাস পর্য়ন্ত সময়ে হবে।[১]

ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় কুমারের উপনয়ন সংস্কারের অতিরিক্ত কাল হল ষোল, বাইশ এবং চব্বিশ বছর।[২] মনু বলেছেন, যদি কোনও অনিবার্য কারণে (যেমন পিতার মৃত্যু বা বালকের ব্যাধিজ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার সম্ভব না হয়, তাহলে ব্রাহ্মণের ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে চোদ্দ বছর তিন মাসের পর পনেরো বছর তিন মাস পর্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কুড়ি বছর তিন মাস থেকে একুশ বছর তিন মাস পর্যন্ত এবং বৈশ্যের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বাইশ বছর তিন মাস থেকে তেইশ বছর তিন মাস পর্যন্ত উপনয়নের কাল অতিক্রান্ত হয় না।[৩]

যদি কোনও কারণে এই উপনয়ন সংস্কারের বয়সের অতিরিক্ত সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে সেই কুমার পতিতসাবিত্রীক হয়ে যায় অর্থাৎ সাবিত্রী মন্ত্রোপদেশের অনুপযুক্ত

---

[১] মনু. সং ২/৩৭

[২] আ. গৃ. সূ ১/১৯/৫-৬, বৈখ. গৃ. সূ ২/৩/৪, বার. গৃ. সূ ৫/৪-৬, গৌ. ধর্ম. সূ ১/১/১৩-১৪, কা. গৃ. সূ ৪১/৪/১/৪, বৌ. ধর্ম. সূ ১/১/১৩, মনু. সং ২/৩৮, বিষ্ণু. সং ২৭/২৬

[৩] মনু.সং ২/৩৮

হয়। এক কথায় বলতে গেলে তাকে গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ দেওয়া হয় না। পতিতসাবিত্রীকদের উপনয়ন সংস্কার হবে না, তারা বেদ অধ্যয়নের, যাজনের অনুপযুক্ত হবে, এমনকী তাদের সঙ্গে কেউ বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করবেন না।[১] তিন পুরুষ ধরে যদি কেউ পতিতসাবিত্রীক হয় তাহলে তাঁদের সন্তান কোনও সংস্কার ও অধ্যাপনা করতে পারে না। সেই কারণে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে নিয়তবিধি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করার পর সংস্কারের উপযুক্ততা জন্মায় অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে প্রায়শ্চিত্ত করে অভিলষিত সংস্কার করা যেতে পারে।[২] পতিতসাবিত্রীক কুমারকে যদি কেউ সংস্কার করাতে ইচ্ছুক হন তাহলে সেই কুমার ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করলে শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তারা অধ্যয়নের অধিকারী হবে এবং অন্যান্য ব্যবহারেরও যোগ্যতা লাভ করবে।[৩]

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, যদি কেউ প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তাহলে তাকে বারো বছর অগ্নিকর্ম, অধ্যয়ন এবং গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত ব্রহ্মচারীর যা যা ব্রত সবই পালন করতে হবে। যারা পতিতসাবিত্রীক তারা দুই মাস তিনটি বেদের অধ্যয়ন করবে। তবে তাকে সম্পূর্ণ বেদের শিক্ষা দেওয়া হবে না। এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত ব্রত পালনের পর উপনয়ন সংস্কার করা যেতে পারে। তার পর পবমান প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা উপনয়নের পর এক বছর প্রতিদিন স্নান করতে হবে।[৪] তারপর সমস্ত কর্ম সেরকম ভাবেই করতে হবে, যেমন উপনয়নে করা

---

[১] পা. গৃ. সূ ২/৫/৩৬-৪০, বার. গৃ. সূ ৪/৪-৮, মনু.সং ২/৩৯-৪০

[২] পা. গৃ. সূ ২/৫/৪১

[৩] পা. গৃ. সূ ২/৫/৪২-৪৩

[৪] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/৬,৮, ১/১/২৭-৩০

হয় থাকে।[১] এই প্রায়শ্চিত্তের পরই সেই কুমার বেদ অধ্যয়ন করতে পারবে।[২] যার নিজের এবং তার পিতা এবং পিতামহের উপনয়ন সংস্কার হয়নি সে এবং তার পিতা এবং পিতামহ সমাজে ব্রহ্মহন্ নামে পরিচিত হবে। এরা কারও সঙ্গেই মেলামেশা করতে পারবে না এবং ভোজন তথা বিবাহ সম্পর্কও স্থাপন করতে পারবে না। এই ব্রহ্মহন্-রা ইচ্ছা করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। সে ক্ষেত্রে দুই মাস অর্থাৎ একটি ঋতুতে যে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলা হয়েছে সেই প্রায়শ্চিত্ত এক বছর ধরে করবে। এরপর তার উপনয়ন সংস্কার হবে।[৩] যতজন পূর্বজ অনুপেত ছিল সকলের জন্য এক এক বছর এবং তার সঙ্গে নিজের জন্যও এক বছর ব্রহ্মচর্য ব্রতের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।[৪] সেই কুমার প্রতিদিন যজুষ্পবিত্র থেকে "যদন্তি যচ্চ দূরকে" এই সাতটি পবমান মন্ত্র দ্বারা, সামপবিত্র থেকে "কয়া নশ্চিত্র আভূবত্" এই মন্ত্র বামদেব সাম থেকে এবং অঙ্গিরসের অন্তর্গত "হংসশশুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা" (তৈ. সং ৪/২/১/৪) ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঞ্জলিতে জল নিয়ে মাথায় দেবে[৫] অথবা পূর্বোক্ত মন্ত্রের সঙ্গে ব্যাহৃতির প্রয়োগ করে অঞ্জলি পূর্ণ জল মাথায় সিঞ্চন করবে।[৬]

গোপথ ব্রাহ্মণের একটি উক্তি থেকে জানা যায়- সম্পূর্ণ চারটি বেদ শিক্ষার জন্য মানুষের ৪৮ বছর সময় লাগে অর্থাৎ চারটি বেদসম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে ৪৮

---

[১] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/১০

[২] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/৩১

[৩] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/৩২-৩৭

[৪] আপ. ধর্ম. সূ ১/২/১

[৫] আপ. ধর্ম ১/১/২

[৬] আপ. ধর্ম ১/১/৩, বৌ.গৃ. সূ ২/৫/১-৬, ৩৪-৪৪

বছর ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রাবস্থায় থাকতে হয়। তবে এতদিন যদি কারও পক্ষে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্ততঃ একটি বেদ শিক্ষার জন্য যে ১২ বছর সময়ের প্রয়োজন সেই সময়টা ব্রহ্মচর্য পালন করতেই হবে। তাই যার যেমন সামর্থ্য সেই অনুসারে ১২ বছর (একটি বেদ), ২৪ বছর (দুটি বেদ), ৩৬ বছর (তিনটি বেদ), ৪৮ বছর (চারটি বেদ) ব্রহ্মচর্যপালনের বিধান দেওয়া হয়েছে। যে কোনও ব্রহ্মচারীকে ইচ্ছামতো একটি বা একাধিক বেদশিক্ষার পরে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রাবস্থা সমাপ্ত করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। (গো. ব্রা পূর্বভাগ ১৫/২/৫)। এই প্রসঙ্গে *ছান্দোগ্য উপনিষদে* দেখা যায়- আরুণিপুত্র শ্বেতকেতু বারো বছর বয়সে গুরুগৃহে গিয়ে চারটি বেদ অধ্যয়ন করে চব্বিশ বছর বয়সে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। অনুমান করা যায় যে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চয়ই বাধ্যতামূলক ছিল না।[১]

অবশেষে বলা যেতে পারে যে উপনয়নের জন্য যে মুখ্য ও গৌণ সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তার কারণ, উপনয়নের পরই বালক ব্রহ্মচারী হয়ে বিদ্যাভ্যাস করবে এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য এমন একটি বয়স দরকার যে বয়সে মন ও স্নায়ু সতেজ থাকে। স্নায়ুর স্বাভাবিক শক্তি থাকলেই বিদ্যাচর্চা সহজতর হয়। অধ্যাপক Arthur Keith তাঁর The Human Body নামক প্রবন্ধে বলেছেন- The human brain has reached its maximum size by the twentieth year. After the twentieth year, or even a little before, it begins to lose in weight and goes on losing until old age, when the decrease becomes more rapid. (Chapter II, Page- 87-88) অর্থাৎ কুড়ি বছর বা তার কিছু আগেই মানব-মস্তিষ্কের গঠন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কুড়ি বছর পরে অথবা তার সামান্য আগে

[১] ছা. উপ ৬.১

মস্তিষ্কের ভার হ্রাস পেতে থাকে। যত বয়স হতে থাকে এই হ্রাসের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানব মস্তিষ্ক গঠনের এইরকম পদ্ধতি সম্ভবত প্রাচীন ঋষিরাই অনুভব করেছিলেন, তাই বিদ্যালাভের দ্বারস্বরূপ উপনয়নের বয়সসীমা অপেক্ষাকৃত কম রাখার প্রতি তাঁরা জোর দিয়েছেন।

৩.৮ উপনয়ন সংস্কারের নিয়মাবলী:

উপনয়নের নিয়ম সম্পর্কে বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে আলোচনা পাওয়া যায়।[১] যে দিবসে মাণবক অর্থাৎ অনুপনীত বালক উপনীত হবে সেই দিন প্রাতঃকালে প্রথমে তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে মাণবককে প্রাতরাশ বা অন্যান্য খাদ্য আহার করানো হবে। এরপরে তার মস্তক মুণ্ডিত করে, স্নান করিয়ে, বস্ত্র অলংকারাদি দ্বারা শোভিত করাতে হবে। মাণবকের বস্ত্রটি হবে অখণ্ড, অক্ষত এবং অব্যবহৃত। ব্রাহ্মণ সন্তান গৈরিক বর্ণের বস্ত্র, ক্ষত্রিয় সন্তান ঈষৎ রক্তবর্ণের এবং বৈশ্য হলুদবর্ণের বস্ত্র পরিধান করবেন। এরপর অগ্নির পশ্চিম দিকে পূর্বমুখ করে কুমারকে দাঁড় করিয়ে "ব্রহ্মচর্যমাগাম" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যকে আশ্রয় করা হচ্ছে এই কথা মাণবককে বলা হবে এবং "ব্রহ্মচার্যসানি" অর্থাৎ "আমি ব্রহ্মচারী হচ্ছি" এই কথা মাণবককে বলার নির্দেশ দেওয়া হবে।[২] *গোভিল গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে যজ্ঞশালার পূর্বভাগে উপলিপ্ত (ঢাকা) স্থানে অগ্নিস্থাপন করে সেই অগ্নিতে আচার্য মাণবকের অর্থাৎ বালকের প্রতিনিধিস্বরূপ "অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি ..... সত্য মুপৈতি স্বাহা।"

---

[১] বৌ. গৃ. সূ ২/৫/৭,৮, হি. গৃ. সূ ১/১/২৩-২৭, ১/২/১-১৮, আপ. গৃ. সূ ৪/১০/৫-৮, বৈখ. গৃ. সূ ২/৫/২, বার. গৃ. সূ ৫/১৫-২০, মা. গৃ. সূ ১/২২/৩-৬

[২] পা. গৃ. সূ ২/২/১-৬, আপ. ধর্ম. সূ ১/১/৪১, কা. গৃ. সূ ৪১/৪/১/৫

(ম. ব্রা ১/৬/৯-১৩) প্রভৃতি পাঁচটি মন্ত্রে পাঁচ বার আহুতি প্রদান করে অগ্নির পশ্চাৎভাগে উত্তরাগ্র কুশসমূহে অবস্থান করবেন। অগ্নি এবং আচার্যের মধ্যবর্তী স্থানে পাতিত উত্তরাগ্র কুশসমূহে আচার্যের দিকে মুখ করে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে মাণবকও অবস্থান করবেন। সেই মাণবকের দক্ষিণ থেকে কোনও অধীতবেদ ব্রাহ্মণ মাণবকের অঞ্জলি জলের দ্বারা পূর্ণ করবেন। তারপরে আচার্যের অঞ্জলি জলপূর্ণ করবেন। এরপর আচার্য সেই মাণবকের দিকে তাকিয়ে "আগন্ত্রা সমগন্মহি..... অগ্নিরাচার্যস্তব।" (ম. ব্রা ১/৬/১৪-১৫)- এই মন্ত্রদ্বয় স্বয়ং পাঠ করবেন, তারপর "ব্রহ্মচর্য মাগা মুপ মা নয়স্ব।।" (ম. ব্রা ১/৬/১৬)- এই মন্ত্রটি মাণবককে পাঠ করাবেন। এরপর "সূর্যস্যাবৃত মন্বাবর্তস্বাসৌ" (ম. ব্রা ১/৬/১৯)- এই মন্ত্রটি পাঠ করে মাণবক প্রদক্ষিণক্রমে পূর্বাভিমুখ হবেন। আচার্য "প্রাণানাং গ্রন্থি রসি মা বিস্রসোঽন্তক ইদং তে পরিদদাম্যমুম্" (ম. ব্রা ১/৬/২০)- এই মন্ত্র পাঠ করে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়ে বস্ত্রাবরণশূন্য নাভি স্পর্শ করবেন। "অহুর ইদং তে পরিদদাম্যমুম্" (ম. ব্রা ১/৬/২১)- এই মন্ত্র দ্বারা আচার্য মাণবকের নাভিপ্রদেশে হাত বোলাবেন। "কৃশন ইদং তে পরিদদাম্যমুম্" (ম. ব্রা ১/৬/২২)- এই মন্ত্র দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করবেন। আচার্য তাঁর দক্ষিণ হস্তের দ্বারা মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করবেন "প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদাম্যসৌ" (মন্ত্র. ব্রা ১/৬/২৩)- এই মন্ত্র দ্বারা। এরপর "দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদাম্যসৌ।" (ম. ব্রা ১/৬/২৪)- এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আচার্য তাঁর বাম হাতের দ্বারা মাণবকের বাম স্কন্ধ স্পর্শ করবেন।[১] এরপর আচার্য অগ্নির উত্তরদিকে পাতিত

[১] গো. গৃ. সূ ২/১০/১৫-৩২, খা. গৃ. সূ ২/৪/৭-১৮

কুশসমূহে পূর্বাভিমুখ হয়ে উপবিষ্ট হবেন। মাণবকও সেই স্থলেই উত্তরাগ্রপাতিত কুশসমূহে নিজের দক্ষিণ জানু ভূমিতে রেখে আচার্যের দিকে মুখ করে উপবিষ্ট হবেন।[১]

এরপর মাণবককে শণাদি বস্ত্র পরানো হবে। বস্ত্র পরানোর সময় "যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্বাসঃ পর্যদধাদমৃতং তেন ত্বা পরিদধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চস ইতি।"- এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। এরপর আচার্য মাণবকের কটিদেশে মেখলা পরাবেন। এই মেখলাবন্ধনের নিয়ম হল- তিন ফের করে মেখলাটি নিয়ে বটুকের কোমরে তিনবার ঘুরিয়ে তিনটি গ্রন্থি দিতে হয়। এই মেখলা পরিধান করার সময় মাণবক "ইয়ং দুরুক্তাৎপরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বল মাহরন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্।।" (ম. ব্রা ১/৬/২৭) এবং "ঋতস্য গোপত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা মা সমন্ত মভি পর্যেহি ভদ্রে ধর্তারস্তে মেখলে মা রিষাম।।" (ম. ব্রা ১/৬/২৮)- এই মন্ত্র দুটি পাঠ করবেন।[২] এরপর "মিত্রস্য চক্ষুর্দ্ধরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমিদ্ধং অনাহনস্যং বসনং জরিষ্ণুঃ পরীদং বাজ্যজিনং দধে২২মিতি।"- এই মন্ত্রটি পাঠ করা হলে উত্তরীয় ধারণ করানো হবে। এরপর আচার্য "যো মে দণ্ডঃ পরাপতদ্বৈহায়সোঽধিভূম্যাং তমহং পুনরাদদ আয়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চসায়েতি"- এই মন্ত্রটি পাঠ করে বেল বা পলাশের দণ্ড মাণবককে দেবেন।[৩] *গোভিল গৃহ্যসূত্র* অনুযায়ী "সুশ্রবসঃ সুশ্রবসং মা কুরু যথা ত্বং সুশ্রবঃ সুশ্রবাঃ। দেবেষ্বেব মহং সুশ্রবঃ সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসম্।।" (ম. ব্রা ১/৬/৩১)- এই মন্ত্র পাঠ করে আচার্য মাণবকের

---

[১] আপ. গৃ. সূ ৪/১০/৬, ১১-১২, বার. গৃ. সূ ৫/২৯-৪২, গো. গৃ. সূ ২/৯/৩৫-৩৬

[২] গো. গৃ. সূ ২/৯/৩৭, খা. গৃ. সূ২/৪/১৯-২০, পা. গৃ. সূ ২/২/৭,৮

[৩] পা. গৃ. সূ ২/২/১১-১২

হাতে পলাশের দণ্ড প্রদান করবেন।[১] এরপর *শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রানুযায়ী* "যজ্ঞোপবীতং কৃত্বা যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীততেনোপ নহ্যামী ইতি",[২] *পারস্কর গৃহ্যসূত্রানুযায়ী* "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলবস্তু তেজঃ। যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি।[৩]- এই মন্ত্র দ্বারা বালক অর্থাৎ বটুককে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হবে।

অতঃপর "অথাস্যাঞ্জিরঞ্জলিনা২ঞ্জলিং পূরয়তি আপোহিষ্ঠেতি।" এই ভাবে তিনটি ঋক্‌মন্ত্র পাঠপূর্বক আচার্য নিজের অঞ্জলিস্থিত জল ব্রহ্মচারীর অঞ্জলিতে দেবেন। এই জলাঞ্জলি দেওয়ার পর আচার্য "সূর্যমুদীক্ষস্ব" বলবেন এবং মাণবক "তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেন শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃস্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।"[৪]- এই মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে সূর্যদর্শন করবেন। *মনুসংহিতায়* সূর্যোপস্থানের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ সূর্যের দিকে মুখ করে আদিত্য যার দেবতা এমন কয়েকটি মন্ত্রের দ্বারা সূর্যের উপাসনা করবেন।[৫] সূর্যদর্শনের পর আচার্য "মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি। মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্টা নিযুনক্তু মহ্যমমিতি।" (মন্ত্র. ব্রা ১/২/২১)- এই মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে মাণবকের ডান কাঁধের উপর দিয়ে ডান হাত দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করবেন।

---

[১] গো. গৃ. সূ ২/৯/৩৮-৪১, খা. গৃ. সূ ২/৪/২১-২৬

[২] শা. গৃ. সূ ২/২/৩

[৩] পা. গৃ. সূ ২/২/১৪

[৪] শু. যজুঃ ৩৬/২৪

[৫] মনু.সং ২/৪৮

হৃদয় স্পর্শ করার পরে মাণবকের ডান হাত ধরে আচার্য সেই মাণবকের নাম জিজ্ঞেস করবেন তার উত্তরে মাণবক বলবে– "অহং ভো।" তারপর আচার্য কুমারকে বলবেন মাণবক কার ব্রহ্মচারী অর্থাৎ কার শিষ্য বা ছাত্র? মাণবক তার উত্তরে বলবে যে যেই আচার্য তাকে প্রশ্ন করছেন সে তাঁরই ছাত্র। তারপর আচার্য মাণবককে সর্বতোভাবে রক্ষা করার জন্য প্রজাপতিকে প্রদানসূচক "প্রজাপতয়েত্বা পরিদদামি দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদাম্যদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ পরিদদামি দ্যাবা পৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিদদামি বিশ্বেভ্যস্ত্বাদেবেভ্যঃ পরিদদামি সর্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্ট্যা ইতি।"- এই মন্ত্র পাঠ করাবেন।[১] এরপর আচার্য মাণবককে বলবেন যে "ব্রহ্মচার্যস্যসৌ (ম. ব্রা ১/৬/২৫)" অর্থাৎ মাণবক আজ থেকে এই নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এইভাবেই মাণবকের নামকরণ করা হবে। নামকরণের পর আচার্য মাণবককে তিনটি উপদেশ প্রদান করবেন। সেগুলো হল- প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় অগ্নিতে সমিধ আধান করতে হবে, শৌচাচার যুক্ত হতে হবে এবং দিনের বেলায় নিদ্রা বর্জন করতে হবে। "সমিধ মাধেহ্যপোশান কর্ম কুরু মা দিবা স্বাপ্সীঃ।" (ম. ব্রা ১/৬/২৬)।[২]

এরপর ব্রহ্মচারী সমিধ আধান এবং সাবিত্রী উপদেশ গ্রহণ করবেন।[৩] মাণবক গুরুর নিকটে হাত জোড় করে নম্রভাবে বেদ অধ্যয়ন এবং সাবিত্রী উপদেশ দান করার কথা বলবেন। তখন আচার্য অগ্নির উত্তর দিকে উপবিষ্ট মাণবককে সাবিত্রীমন্ত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র বলবেন। আবার কোনও আচার্যের মতে অগ্নির দক্ষিণে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট মাণবককে আচার্য সাবিত্রী

---

[১] পা. গৃ. সূ ২/২/১৪-২১

[২] গো. গৃ. সূ ২/৯/৩২-৩৪, বৌ. গৃ. সূ ২/৫/১১,১২, হি. গৃ. সূ ১/৪/১-১৩, ২/১/১-৯, বার. গৃ. সূ ৫/১৬-২৮

[৩] আ.গৃ.সূ ১/২০/৪-১০, ১/২১/২-৭

মন্ত্র শেখাবেন। শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে আচার্য সাবিত্রী মন্ত্রের উপদেশ দেন। সাবিত্রী মন্ত্র শেখানোর বিধি হল- প্রথমে এক একটি পাদ মাণবককে বলানো হবে। যথা- প্রথমে "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" অংশটি বলে তারপর "ভর্গোদেবস্য ধীমহি" অংশটি বলে এবং তারপর "ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ"- এই মন্ত্রটি শেখানো হবে। এরপর অর্ধেকটা করে শেখানো হবে। যেমন প্রথমে "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য"- এই অংশটি শিখিয়ে তারপর "ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ"- এই মন্ত্রটি শেখানো হবে। এরপর সর্বশেষে ওই তিনটি পদকে একসঙ্গে ওঁকার সহ অভ্যাস করানো হবে। সবশেষে "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"- এইভাবে সমস্ত পদটি একসঙ্গে অভ্যাস করানো হবে। আচার্য শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারে শিষ্যকে উপনয়ন থেকে একবছর বা ছয় মাসে বা চব্বিশ দিনে বা বারো দিনে বা ছয় দিনে বা তিন দিনে সাবিত্রী মন্ত্র শেখাবেন। ব্রাহ্মণকে উপনয়নের তৎক্ষণাৎ পরেই গায়ত্রীমন্ত্র শেখাতে হয়। কারণ শ্রুতিতে বলা আছে যে "আগ্নেয় বৈ ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অগ্নির অংশভূত। এই গায়ত্রী মন্ত্রের ছন্দ ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে ত্রিষ্টুভ্, বৈশ্যদের ক্ষেত্রে জগতী। আবার একথাও বলা হয়েছে যে তা সকলের ক্ষেত্রেই

গায়ত্রী ছন্দে নিবদ্ধ হতে পারে।[১] গায়ত্রী মন্ত্রের জপের ফল হিসেবে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, যে ব্রাহ্মণ দ্বিসন্ধ্যায় অর্থাৎ প্রাতঃ এবং সায়ংকালে অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যাকর্মে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, তিনি বেদজ্ঞ বলে পরিচিত হন এবং বেদপাঠজনিত পুণ্যফল তিনি লাভ করেন। যে ব্রহ্মচারী সন্ধ্যার সময় ব্যতীত অন্য সময় এই ত্রিপদা গায়ত্রী লোকালয়-বহির্ভূত নির্জন

[১] পা. গৃ. সূ ২/৩/১-১০, বৌ. ধর্ম. সূ ১/১/১২, বৌ. গৃ. সূ ২/৫/৫৮-৭২, হি. গৃ. সূ ১/৩/১-১৪, ২/২/১-১১, আপ. গৃ. সূ ৪/১১/৭-১৩, বৈখ. গৃ. সূ ২/৪/৫-৬, বার. গৃ. সূ ৫/৪৩, ৪৫,৪৬, মা. গৃ. সূ ১/২০/১২-১৮, কা. গৃ. সূ ৪১/৪/১/৬-১০

প্রদেশে পাঠ করেন তিনি একমাসে 'এনঃ' অর্থাৎ দৈবদোষ, দুরদৃষ্ট, অনিষ্ট, অমঙ্গল প্রভৃতি মহাপাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। যিনি প্রতিদিন আলস্যশূন্য হয়ে তিন বছর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন সেই ব্যক্তি পরম ব্রহ্মের অভিমুখী হন।[১] *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, শিষ্যকে উপনীত করার পর গুরু শিষ্যকে সর্বপ্রথম শৌচক্রিয়া, আচার (গুরুজনদের সম্মান করা), অগ্নিকার্য (সায়ং এবং প্রাতঃকালে অগ্নিপরিচর্যা অর্থাৎ অগ্নিতে সমিধ নিক্ষেপ) এবং সন্ধ্যা উপাসনাদি শিক্ষা দেবেন।[২]

৩.৯ উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি এবং ভিক্ষাদ্রব্যের ব্যবহার:

ব্রহ্মচারী প্রতিদিন অগ্নিকর্ম অর্থাৎ সমিধের দ্বারা হোম এবং ভিক্ষাচরণ করবেন।[৩] ব্রহ্মচারী নিজের এবং আচার্যের আহারের জন্য সন্ধ্যা ও সকালে যে নারী বা পুরুষ প্রত্যাখ্যান করবেন না এমন নারী বা পুরুষের নিকট থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। *গৌতম ধর্মসূত্রতে* বলা হয়েছে, পতিত এবং পাতকী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা যাবে না।[৪] *পারস্কর গৃহ্যসূত্রতে* বলা হয়েছে, যে নারী ভিক্ষা দান করতে প্রত্যাখ্যান করবেন না- এমন তিনজন নারীর কাছ থেকে ব্রহ্মচারী ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। তারপর ছয় বা বারো বা তারও অধিক নারীদের থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।[৫] ব্রহ্মচারী প্রথমে মায়ের থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।[৬]

---

[১] মনু. সং ২/৭৮-৭৯,৮২

[২] মনু. সং ২/৬৯

[৩] গৌ. ধর্ম. সূ ১/২/১২

[৪] গৌ. ধর্ম. সূ ১/২/৪১, মনু.সং ২/১৮৫

[৫] পা. গৃ. সূ ২/৫/৫-৬

[৬] পা. গৃ. সূ ২/৫/১-৭

তারপর মায়ের দুই সুহৃদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। ব্রাহ্মণকুমার "ভবৎ" শব্দটি বাক্যের পূর্বে যোগ করে ভিক্ষা করবেন। যথা- পুরুষকে "ভবান্ ভিক্ষাং দেহি" এবং স্ত্রীকে "ভবতী ভিক্ষাং দেহি" এই শব্দ বলে ভিক্ষা করবেন। ক্ষত্রিয়কুমার "ভবৎ" শব্দটি বাক্যের মধ্যে যোগ করে ভিক্ষা করবেন। যথা- পুরুষের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণের সময় "ভিক্ষাং ভবান্ দেহি" এবং স্ত্রীর কাছ থেকে ভিক্ষা নেওয়ার সময় "ভিক্ষাং ভবতী দেহি"- এই শব্দ বলে ভিক্ষা নেবেন। বৈশ্যকুমার "ভবৎ" শব্দটি বাক্যের শেষে যোগ করে ভিক্ষা করবেন। যথা- পুরুষের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণের সময় "ভিক্ষাং দেহি ভবান্" স্ত্রীর কাছ থেকে ভিক্ষা নেওয়ার সময় "ভিক্ষাং দেহি ভবতী" এই শব্দ বলে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।[১] অবশেষে ব্রহ্মচারীকে গুরুর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ব্রহ্মচারী প্রতিদিন সেই সমস্ত গৃহস্থের নিকট থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন যারা বেদযজ্ঞে অহীন অর্থাৎ বেদাধ্যয়নযুক্ত এবং সর্বদা নিজ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকেন।[২]

অন্যত্র যদি ভিক্ষা না পাওয়া যায় তাহলে ক্রমানুসারে স্বগৃহ, গুরুজন, সপিণ্ড কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এরপর ব্রহ্মচারী ভিক্ষা দ্রব্যগুলি আচার্যকে নিবেদন করে বাক্ সংযত করে অর্থাৎ মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, বসবেন বা শয়ন করবেন।[৩]

---

[১] মনু.সং ২/৪৯, যাজ্ঞ.সং আচারাধ্যায় ২/২৯-৩০, বিষ্ণু. সং ২৭/২৫

[২] মনু.সং ২/১৮৩

[৩] পা. গৃ. সূ ২/৫/৮-১০, বৌ. গৃ. সূ ১/৫/৪৫-৫৪, হি. গৃ. সূ ২/৪/১-১৬, বৈখ. গৃ. সূ ২/৮/১-৮, বার. গৃ. সূ ৫/৫০-৬৩, মা. গৃ. সূ ১/২০/২০-২১, গৌ. ধর্ম. সূ ১/২/৪২-৪৪, বৌ. ধর্ম. সূ ১/১/১৭-২০, মনু.সং ২/১৮৪

এরপর গুরু আদেশ করলে ওই খাদ্য গ্রহণ করবেন। যদি গুরু কখনও বাইরে যান তাহলে তাঁর কুলের যাঁরা সদস্য তাঁদের কাছে ব্রহ্মচারী অর্জিত ভিক্ষা দান করবেন অর্থাৎ গুরুর পত্নী, পুত্র অথবা অন্য ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাদ্রব্য দান করে তাঁদের অনুমতি নিয়ে সেই খাদ্য ভোজন করবেন। ভোজন করার সময় মৌন ও প্রসন্ন থাকবেন, লোভ করবেন না। খাদ্য ভোজন করার সময় ব্রহ্মচারী জলের পাত্র নিজের কাছে রাখবেন। যদি গুরু নিজের পরিবারকে নিয়ে অন্যত্র যান, তাহলে ব্রহ্মচারী তাঁর অর্জিত ভিক্ষা দ্বিতীয় কোনও শ্রোত্রিয়কে দেবেন। যদি অপর কোনও শ্রোত্রিয় না থাকেন, তাহলে ব্রহ্মচারী তাঁর অর্জিত ভিক্ষার অংশ কিছুটা অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। ভোজন করার পর ব্রহ্মচারী ভোজনপাত্রকে নিজেই পরিষ্কার করবেন। উচ্ছিষ্ট খাদ্য ভোজনপাত্রে রাখবেন না, যতটা ভোজন করতে পারবেন ততটুকুই খাদ্য তিনি ভোজনপাত্রে নেবেন। কোনও কারণে ব্রহ্মচারী যতটুকু খাদ্য ভোজন পাত্রে নেওয়া হয়েছে সেইটুকু খাদ্যও যদি গ্রহণ করতে না পারেন, তাহলে সেই উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে মাটির তলায় পুঁতে দেবেন অথবা জলে সমর্পণ করবেন অথবা একটি পাত্রতে রেখে তিন বর্ণের যে কোনও একজন ব্যক্তিকে যাদের উপনয়ন হয়নি এমন ব্যক্তিকে দান করবেন বা আচার্যের পরিচারক হিসেবে নিয়োজিত যে শূদ্র- তাকে ওই উচ্ছিষ্ট খাদ্য দান করবেন। যদি শিষ্যকে গুরুর কর্ম বা নিজের কর্মের জন্য কোথাও যেতে হয়, তাহলে যাত্রাপথেই ওই ভিক্ষা দ্বারা অর্জিত অন্নের অংশ অগ্নিতে হবন করে ভোজন করবেন। ব্রহ্মচারী যে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন তাকে যজ্ঞীয় অন্ন বলা হয়ে থাকে এবং সেই ব্রহ্মচারীদের জন্য গুরুই দেবতা।[১] *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে যিনি আয়ুবৃদ্ধি কামনা করেন তিনি পূর্বদিকে মুখ করে ভোজন করবেন, যশোবৃদ্ধি কামনাকারী ব্রহ্মচারী দক্ষিণমুখে, সম্পদ্‌কামনাকারী ব্রহ্মচারী পশ্চিমমুখ হয়ে এবং

[১] আপ. ধর্ম ১/১/২৫-৪৩, গৌ. ধর্ম. সূ ১/২/৪৫-৪৭

ঋত অর্থাৎ সত্যফলকামী বা স্বর্গ কামনাকারী ব্যক্তি উত্তর দিকে উপবেশন করে ভোজন করবেন। মনু একথাও বলেছেন যে ত্রৈবর্ণিক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্যের পরও প্রতিদিন উপস্পর্শন আচমন করে অর্থাৎ হাত, পা, মুখ ধুয়ে একনিবিষ্ট মনে ভোজন করবেন। ভোজন অবসানে জল দ্বারা হাত, পা ধৌত করে ইন্দ্রিয়স্থান অর্থাৎ চোখ, কান ও নাক স্পর্শ করবেন।[১] *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন অন্নকে পূজা করবেন বা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। অন্নকে পূজা করে ভোজন করলে তা প্রতিদিন বল এবং ঊর্জ (বীর্য, জীবনীশক্তি, উৎসাহ) দান করে। অশ্রদ্ধার সঙ্গে অপূজিত অন্ন ভোজন করলে সেই অন্ন মানুষের সামর্থ্য ও বীর্য উভয়কেই বিনাশ করে। অন্নকে ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবেন। অন্ন দেখে আনন্দিত হবেন এবং মনে প্রসন্নতা আনবেন। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* বিপরীত কথা *মনুসংহিতাতে* বলা হয়েছে। আপস্তম্ব বলেছেন যে ব্রহ্মচারীর উচ্ছিষ্ট অন্ন আচার্যের পরিচারক হিসেবে নিযুক্ত শূদ্রাদি জাতির ব্যক্তিকে দান করা যাবে। কিন্তু মনু বলেছেন যে শূদ্রাদি জাতির ব্যক্তি বা তাদের কুকুর বিড়ালকেও উচ্ছিষ্ট অন্ন দান নিষিদ্ধ। অতিমাত্রায় ভোজন করবেন না এবং উচ্ছিষ্টমুখে অন্য কোথাও যাবেন না।[২]

ভোজন ছাড়া আর যে সমস্ত বস্তু শিষ্য ভিক্ষা দ্বারা অর্জন করেন সেগুলো সবই গুরুর দক্ষিণা হিসেবে কাজে লাগে। গরু, রথ, যজ্ঞ করার জন্য জ্বালানি প্রভৃতি যদি ভিক্ষা হিসেবে ব্রহ্মচারী লাভ করেন সেই দ্রব্যগুলি সবই দক্ষিণা হিসাবে গুরুকে দান করবেন।[৩]

---

[১] মনু.সং ২/৫২-৫৩

[২] মনু.সং ২/৫৪-৫৬

[৩] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/১-৩

৩.১০ উপয়ন পরবর্তী ব্রহ্মচারীর সমিধ আধান কর্ম:

সাবিত্রী গ্রহণের পরই ব্রহ্মচারীর নিত্য অবশ্যকর্তব্য হল সমিধ আধান।[১] বৃক্ষের যে সমস্ত শাখা প্রাকৃতিক নিয়েমে স্খলিত হয়েছে এমন শাখা বন থেকে আহরণ করে সেই কাষ্ঠ বা সমিধ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে ব্রহ্মচারী তার মৌনতা ত্যাগ করবেন। *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র* অনুযায়ী ব্রহ্মচারী সকালে ও সন্ধ্যায় সমিধ স্থাপন করে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করে আনা দ্রব্যগুলি ব্রহ্মৌদন পাক করবেন।[২] সূর্যাস্ত হলে "অগ্নয়ে সমিধ মাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে। যথা ত্ব মগ্নে সমিধা সমিধ্যস্যেব মহমায়ুষা মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন ধনেনান্নাদ্যেন সমেধিষীয় (স্বাহা)।" (ম. ব্রা ১/৬/৩২)- এই মন্ত্র পাঠ করে ওই মাণবক অগ্নিতে একখানি সমিধকাষ্ঠ প্রদান করবেন।

পারস্কর গৃহ্যসূত্র অনুসারে ব্রহ্মচারী উপনয়নাঙ্গ হোমাধিকরণ অগ্নিতে ডান হাতে করে শুষ্ক গোময় খণ্ডাদি ইন্ধন দিয়ে "অগ্নে সূশ্রবঃ সূশ্রবসং মা কুরু যথা ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা অস্যেবং মাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু যথা ত্বমগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপা অস্যেবহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসমিতি।" (মন্ত্র. ব্রা ১/৬/৩১)- এই মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে হোমের অগ্নিকে প্রজ্বলিত করবেন। এরপর মাণবক ডান হাতে করে জল নিয়ে অগ্নির চতুর্দিকে ঘুরিয়ে জলসেক করে দাঁড়িয়ে "অগ্নয়ে সমিধমহার্য়ং বৃহতে জাতবেদসে। যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস এবহামায়ৃষা মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন সমিন্ধে জীবপুত্রো সমাচার্যো মেধাম্যহমসান্যনিরাকারিষ্ণুর্যশস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চসেন ধনেনান্নাদ্যেন সমেধিষীয়(স্বাহা)।।" (মন্ত্র.

---

[১] বৌ. গৃ. সূ ২/৫/৯-১০, হি. গৃ. সূ ২/১/১০-১৪,২/৩/১-২২, বার. গৃ. সূ ৫/৬৯-৭২

[২] আ.গৃ.সূ ১/২২/৫-১০

ব্রা ১/৬/৩১)- এই মন্ত্রটি পাঠ করে অগ্নিতে একটি সমিধ দান করবেন। এই ভাবে পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমিধ নিক্ষেপ করবেন।[১] এরপর ব্রহ্মচারী অগ্নির চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ করে জলসেক করে অর্থাৎ জল ছিটিয়ে দিয়ে হাত দুটিকে আগুনে ভালো করে তাতিয়ে নিয়ে "তনূপা অগ্নেঽসি ত্বন্ব মে পাহ্যাযুর্দা।। অগ্নেঽ স্যায়ুর্মে দেহি বর্চোদা। অগ্নেঽসি ব্বর্চো মে দেহি। অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্ম আপৃণ।।"- এই মন্ত্রটি পড়তে পড়তে মুখমার্জন করবেন।[২]

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে, উপনয়নের দিন থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মচারী তিন দিন ও তিন রাত বা বারো দিন ও বারো রাত অথবা পুরো এক বছর লবণবর্জিত খাবার গ্রহণ করবেন।[৩] *বারাহ গৃহ্যসূত্রতে* বলা হয়েছে, ব্রহ্মচারী উপনয়নের দিন থেকে আরম্ভ করে বারো দিন ক্ষারলবণ-বর্জিত খাদ্য গ্রহণ করবেন।[৪] *খাদির গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে এই তিন দিন ব্রহ্মচারী দুধও পান করবেন না।[৫] এরপর ব্রহ্মচারী চরুপাক করে সবিতা দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করবেন। তারপর অনুপ্রবচনীয় হোম করে ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে ব্রহ্মচারী বেদসমাপ্তি ঘটাবেন এবং নিজে লবণবর্জিত খাদ্য গ্রহণ করে তিন রাত্রি, দ্বাদশ রাত্রি বা এক

---

[১] (পা. গৃ. সূ ২/৪/১-৪)

[২] (পা. গৃ. সূ ২/৪/৬,৭)

[৩] (আ. গৃ. সূ ১/২২/১৭)

[৪] বার. গৃ. সূ ৫/৭৩

[৫] খা. গৃ. সূ ২/৪/৩৩

বছর ভূমিতে শয়ন করবেন। এইভাবে উপনয়ন সংস্কার শেষ হলে যথা প্রয়োজন অন্য কার্য করবেন। এই উপনয়ন সংস্কারের দক্ষিণা হিসাবে একটি গাভী আচার্যকে দান করতে হবে।[১]

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে ব্রহ্মচারী দূরস্থান থেকে সমিধ কাষ্ঠ সংগ্রহ করে কুটীরের চালে অথবা কোন আবৃত স্থানে সমিধ কাষ্ঠগুলি রাখবেন এবং নিরলসভাবে প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় সমিধ কাষ্ঠ দিয়ে হোম করবেন। ব্রহ্মচারী যদি অনাতুর অর্থাৎ রোগাক্রান্ত না হন অথচ তিনি সাতদিন ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ অন্নের আহার না করেন এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সমিধ কাষ্ঠ দিয়ে হোমও না করেন, তাহলে সেই রকম ব্রহ্মচারীর ব্রতের লোপ হয় এবং তাকে অবকীর্ণী প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।[২]

৩.১১ ব্রহ্মচারীর সংজ্ঞা:

ব্রহ্মচারী বলতে আমরা ছাত্রই বুঝি। ছাত্র কথাটি এসেছে ছত্র অর্থাৎ ছাতা থেকে অথচ ব্রহ্মচারীরা ছাতা ব্যবহার করতে পারতেন না। ব্রহ্মচারীর নিষিদ্ধ ব্যবহার্য বস্তুর তালিকায় ছত্র অর্থাৎ ছাতা ছিল। তাই মনে করা হয় এখানে 'ছত্র' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল রক্ষা করা। যাঁর ছায়ায় ব্রহ্মচারী পালিত হন এবং যিনি ব্রহ্মচারীকে রক্ষা করতেন তাঁকেই অর্থাৎ সেই গুরুকে এখানে 'ছত্র' কথাটির দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। 'ছত্র' কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে *শব্দকল্পদ্রুমে* বলা হয়েছে যে- "ছত্রং গুরো র্দোষাণাম্ আবরণম্। তৎ শীলম্ অস্য ইতি ছাত্রঃ।"[৩] অর্থ হল শিক্ষার্থী গুরুর দোষত্রুটি ছাদন করে সদগুণসমূহের

---

[১] খা. গৃ. সূ ২/৪/১-৭,২৭-৩৩, আ.গৃ.সূ ১/২২/১১-১৭, শা. গৃ. সূ ২/১/১-৩০,২/২/১-১৫, ২/৩/১-৫, ২/৪/১-১২, গো. গৃ. সূ ২/১০/১-১৪

[২] মনু.সং ২/১৮৬-১৮৭

[৩] শ. ক. দ্রু খন্ড ৩, পৃ ৪৪৪

অনুকরণ করতেন বলে 'ছত্র' কথাটি ছাদন করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্রহ্মচারী বা ছাত্র হওয়ার জন্য বিদ্যার্থীর পক্ষে উপনয়ন সংস্কার অবশ্যকরণীয় কার্য বলা হত। ব্রহ্মচারী শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে যে অর্থ পাওয়া যায় তা হল বিদ্যার্থী। বেদের একটি নাম হল ব্রহ্ম। এই বেদের চর্চাকে অর্থাৎ পাঠ ও অভ্যাসকে ব্রহ্মচর্য বলা হত। যে বালক ব্রহ্মের বা বেদের চর্চা করতেন তিনিই ব্রহ্মচারী।

৩.১২ ব্রহ্মচর্যের সূচনা:

অট্টালিকাস্বরূপ চতুরাশ্রমে বিভক্ত প্রাচীন ভারতীয় জীবনের প্রধান ভিত্তি হল এই উপনয়ন সংস্কার। জীবনের প্রথম আশ্রমের সূচনা এই উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। উপনয়নের পরই একজন শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী বা ছাত্র হতে পারে। এই ব্রহ্মচর্যের উপরেই নির্ভর করে জীবনের ক্রমবিকাশ। অট্টালিকার ভিত্তি যেমন মৃত্তিকার তলদেশে দৃঢ়বদ্ধ থাকে এবং সেটি তার মজবুত হওয়ার প্রধান কারণ, সেরকম ব্রহ্মচর্যও একজন শিক্ষার্থীর জীবনের প্রধান ভিত্তি যা সেই শিক্ষার্থীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে সাহায্য করে। উপযুক্ত বিকাশের প্রয়োজনে জীবনের প্রারম্ভে এই শৃঙ্খলা অত্যাবশ্যক একটি বিষয়। এককথায় বলা যেতে পারে যে জীবনের প্রারম্ভে যে শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়, তা এই ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমেই আরম্ভ হয়। *ঋগ্বেদে* বৃহস্পতিকে ব্রহ্মচারী বলা হয়েছে। তিনি ব্রহ্মচারী হয়ে দেবতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের একটি অবয়ববিশেষ হয়েছিলেন।[১]

[১] ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্। ঋ. বে ১০/১০৯/৫

৩.১৩ ব্রহ্মচারীর প্রকারভেদ:

শাস্ত্রে উপকুর্বাণ এবং নৈষ্ঠিকভেদে ব্রহ্মচারীকে দুভাগে ভাগ করা হয়।[১] নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাস করবেন এবং দেহমুক্তি পর্যন্ত গুরুশুশ্রুষাদি করে জীবন অতিবাহিত করবেন। যাঁরা উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী তাঁরা নির্দিষ্ট বেদশাখা অধ্যয়নের পর গুরুর নির্দেশে ব্রতসমাপ্তি স্নান করে গুরুকে দক্ষিণা দান করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে গার্হস্থ্যাশ্রম পালন করবেন।[২] *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে স্নাতক অর্থাৎ উপকুর্বান ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্যব্রতে অবিচ্যুত থেকে নিজ বেদশাখা এবং স্ববেদাতিরিক্ত তিনটি বা দুটি বা একটি বেদশাখা অধ্যয়ন করে কৃতদার হয়ে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবেন।[৩] *গৌতম ধর্মসূত্রে* নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে এই ব্রহ্মচারী আশ্রমের যা নিয়ম সেই নিয়ম পালন করবেন। আচার্য, মাতা, পিতার সেবা করবেন এবং শেষ সময়ে জপ করবেন। এই ব্রহ্মচারীর গুরু যদি না থাকেন তাহলে গুরুর প্রতি যা কর্তব্য কর্ম ছিল তা আচার্যের পুত্রের প্রতি করবেন। আচার্যের পুত্রের অভাবে কোনও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি করবেন। তাঁর অভাবে সহাধ্যায়ী ব্রহ্মচারীর প্রতি করবেন। সহাধ্যায়ীর অভাবে অগ্নিতে সমিধের হবনাদি কর্ম দ্বারা এই কর্তব্যকর্ম পালন করবেন। ইন্দ্রিয়ের উপর বিজয়লাভ করে এই প্রকার ব্রহ্মচারী ব্রহ্মলোক লাভ করবেন।[৪] *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়* বলা হয়েছে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আচার্যের অভাবে তাঁর পুত্রের কাছে থাকবেন। আচার্যপুত্র যদি না থাকেন তাহলে আচার্যের পত্নীর নিকটে থাকবেন।

---

[১] মা. গৃ. সূ ১/২/১০ অষ্টাবক্রের টীকা

[২] মনু. সং ৩/১, হা. সং ৩/১২

[৩] মনু. সং ২/২

[৪] গৌ. ধর্ম. সূ ১/৩/৪-৮

আচার্যপত্নীর অভাবে অগ্নিহোত্রের অগ্নির নিকটে থাকবেন। এইভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিজিতেন্দ্রিয় হয়ে ব্রহ্মলোক লাভ করেন।[১] *ব্যাস সংহিতাতে* বলা হয়েছে যে উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ গুরুগৃহে থেকে বেদব্রত পালন করবেন।[২]

৩.১৪ ব্রহ্মচারীর পরিধেয় সামগ্রী ধারণ এবং ধারণের তাৎপর্য :

ব্রহ্মচারীর পরিধেয় বস্ত্র, উপবীত এবং দণ্ডধারণ আবশ্যিক। উপনয়নের দ্বারা সংস্কৃত ব্রহ্মচারীর পোশাক, দণ্ড ও উপবীত ধারণ সম্পর্কে বিবিধ শাস্ত্রকার বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। ব্রহ্মচারীর পোশাককে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়- একটিকে ব্রহ্মচারী শরীরের ঊর্ধ্বাংশে পরিধান করতেন যেটি অজিন বা চামড়া দিয়ে তৈরি হত, অপরটি শরীরের নিম্নাংশে পরিধান করতেন যেটিকে বলা হত মেখলা বা কোমরবন্ধ বা রশনা। এছাড়া তাঁরা আরও একটি পোশাক ব্যবহার করতেন, সেটি হল অন্তর্বাস যেটি শণ বা লিনেনের তৈরি।[৩]

৩.১৪.১ বস্ত্র:

গোভিল গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণকুমার এণী অর্থাৎ কৃষ্ণমৃগের চর্ম দ্বারা তৈরি, ক্ষত্রিয়কুমার রুরুমৃগের চর্ম দ্বারা তৈরি এবং বৈশ্যকুমার ছাগচর্ম চর্ম দ্বারা তৈরি বস্ত্র ধারণ করবেন। ব্রাহ্মণের অন্তর্বসন হবে ক্ষৌম বা তসরের অথবা শাণ বা শণের, ক্ষত্রিয়ের কার্পাস বা তুলোর, বৈশ্যের ঔর্ণ বা উনীর। তিন বর্ণের ব্রহ্মচারীর মেখলা তিন রকম ছিল। ব্রাহ্মণ মুঞ্জঘাসের, ক্ষত্রিয় কাশতৃণের এবং বৈশ্য শণের অর্থাৎ পাটের মেখলা পরিধান করতেন।

---

[১] যাজ্ঞ. সং ২/৪৯-৫০, হা. সং ৩/১৩-১৬

[২] ব্যা.সং ১/৪০

[৩] জৈ. গৃ. সূ ১/১২

এই গৃহ্যসূত্রে একথাও বলা হয়েছে যে যদি কোনও কারণে প্রত্যেক বর্ণের ক্ষেত্রে যে যে বসন নির্দিষ্ট আছে তা লভ্যমান না হয়, তাহলে সকলেই সকল প্রকার বসন এবং অজিন পরিধান করতে পারবেন।[১] *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে, জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্রেও গোভিল গৃহ্যসূত্রের* ন্যায় বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যথাক্রমে কৃষ্ণমৃগ, রুরুমৃগ এবং ছাগের চামড়া পরিধান করবেন। যদি কোনও অজিনের অভাব দেখা যায় তাহলে তিন বর্ণের মানুষই কৃষ্ণমৃগের চর্ম ব্যবহার করবেন। তবে অন্তর্বাস হিসেবে তিন বর্ণই শণের তৈরি বস্ত্রই ধারণ করবেন। মেখলা হিসেবে ব্রাহ্মণ মুঞ্জঘাসের, ক্ষত্রিয় মুর্বঘাসের এবং বৈশ্য তমাল গাছের ছালের সঙ্গে মুঞ্জঘাস মিশিয়ে পরিধান করবেন।[২] *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যথাক্রমে কৃষ্ণমৃগ, রুরুমৃগ এবং ছাগের চামড়া পরিধান করবেন। তবে এখানে একথা বলা হয়নি যে যদি কোনও কারণে এই তিন বর্ণের জন্য যে অজিন নির্ধারিত হয়েছে তা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তাঁরা যে চর্ম লভ্যমান হবে সেটিই পরিধান করতে পারবেন। আশ্বলায়ন বলেছেন, যদি বস্ত্র পরিধান করতেও হয় তাহলে নতুন বস্ত্র ধারণ করবেন তিন বর্ণের ব্রহ্মচারীই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যথাক্রমে গৈরিক, ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং হলুদ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করবেন। তবে এটি অন্তর্বাস হিসেবে পরবেন কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। বিকল্পে শ্বেতবর্ণের বস্ত্রও তাঁরা পরিধান করতে পারবেন। এই তিন বর্ণের মেখলা হবে যথাক্রমে মুঞ্জঘাসের, ধনুর ছিলা এবং মেষের লোম দিয়ে তৈরি।[৩] *আশ্বলায়ন সংহিতার* ন্যায় *উশন সংহিতাতেও* বলা হয়েছে, শুক্ল এবং অচ্ছিদ্র বস্ত্র

---

[১] গো. গৃ. সূ ২/১০/১২-১৪

[২] জৈ. গৃ. সূ ১/১২

[৩] আ. গৃ. সূ ১/১৯/৮-১১

ব্রহ্মচারী পরিধান করবেন।[১] *শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে* অজিন, অন্তর্বাস এবং বস্ত্রের বর্ণ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। শুধুমাত্র বলা হয়েছে, সকল বর্ণের ব্রহ্মচারীই অধৌত এবং নতুন বস্ত্র পরিধান করবেন এবং কটিবন্ধ হিসেবে তিন বর্ণের ব্রহ্মচারী যথাক্রমে মুঞ্জতৃণের, ধনুকের ছিলার এবং পশমি সুতোর পোশাক পরবেন যা পূর্বে *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও* এই একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] *পারস্কর গৃহ্যসূত্র* অনুসারে অন্তর্বাস হিসেবে ব্রাহ্মণকুমার পট্টবস্ত্র অর্থাৎ পাটের তৈরি কাপড়, ক্ষত্রিয় রেশমি বস্ত্র এবং বৈশ্য মেষচর্ম পরিধান করবেন। উত্তরীয় অর্থাৎ ঊর্ধ্বাংশের বস্ত্র হিসেবে ব্রাহ্মণকুমার কৃষ্ণমৃগীর চর্ম, ক্ষত্রিয়কুমার রুরুমৃগের চর্ম এবং বৈশ্য ছাগচর্ম অথবা বৃষচর্মে পরিধান করবেন। যদি এই সমস্ত চর্ম না পাওয়া যায় তাহলে সব বর্ণের ব্রহ্মচারীরাই বৃষচর্ম ব্যবহার করবেন। ব্রাহ্মণকুমারের মেখলা মুঞ্জ দ্বারা নির্মিত, ক্ষত্রিয়ের ধনুর জ্যা এবং বৈশ্যের সরু তৃণ দ্বারা নির্মিত হবে। মুঞ্জঘাস যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ব্রাহ্মণকুমার কুশনির্মিত, ক্ষত্রিয়কুমার বশ্মন্তকের তৈরি এবং বৈশ্যকুমার বাল্বজীনির্মিত মেখলা ধারণ করবেন।[৩] *বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য উত্তরীয় হিসেবে কৃষ্ণমৃগ, রুরুমৃগ এবং বস্তাজিন ব্যবহার করবেন অথবা সব বর্ণের মানুষই কৃষ্ণমৃগের চর্ম ব্যবহার করতে পারেন। তবে এখানে অন্তর্বাস এবং মেখলা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।[৪] *বৈখানস গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যথাক্রমে মুঞ্জ, মৌর্বী অর্থাৎ ধনুর জ্যা এবং শণের মেখলা ব্যাবহার করবেন। ঊর্ধ্বাংশের বস্ত্র হিসেবে তিন

---

[১] উশ. সং ১/৭

[২] শা. গৃ. সূ ২/১/১০-১৭

[৩] পা. গৃ. সূ ২/৫/১৬-২৪

[৪] বৈ. গৃ.সূ ২/৫/১৬

বর্ণের ব্রহ্মচারী যথাক্রমে কৃষ্ণাজিন, রুরুমৃগের চর্ম এবং বস্তাজিন ধারণ করবেন, তবে এখানে অন্তর্বাস সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।[১] *কাঠক গৃহ্যসূত্র* অনুযায়ী উত্তরীয় হিসাবে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণমৃগের চর্ম, ক্ষত্রিয় ব্যাঘ্রচর্ম এবং বৈশ্য রুরুমৃগের চর্ম পরিধান করবে। মেখলা এবং অন্তর্বাস সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।[২] *হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ মৌঞ্জ ঘাসের, ক্ষত্রিয় ধনুকের জ্যা এবং বৈশ্য মেষের লোম দিয়ে মেখলা ব্যবহার করবেন।[৩] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* অনুযায়ী ব্রাহ্মণ মুঞ্জঘাসের, ক্ষত্রিয় ধনুকের ছিলার এবং বৈশ্য ঊণী সুতোর তৈরি মেখলা ধারণ করবেন। বৃষকে যে রজ্জু দিয়ে বাঁধা হয় সেটি দ্বারা তৈরি মেখলাও বৈশ্য ব্রহ্মচারী পরিধান করতে পারেন। বর্ণক্রমানুসারে ব্রাহ্মণ শণের. ক্ষত্রিয় অতসী এবং বৈশ্য কোনও পশুচর্মের অন্তর্বাস ব্যবহার করবেন। *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের* ন্যায় এই ধর্মসূত্রেও বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ কাষায় অর্থাৎ গৈরিক বর্ণের বস্ত্র, ক্ষত্রিয় ঈষৎ লাল বর্ণের বস্ত্র এবং বৈশ্য হলুদ বর্ণের বস্ত্রও পরতে পারেন। *পারস্কর গৃহ্যসূত্রের* ন্যায় এই গৃহ্যসূত্রেও বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণমৃগীর চর্ম উত্তরীয় হিসেবে ধারণ করবেন।[৪] ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য রুরুমৃগ এবং অজের চর্ম উত্তরীয় রূপে ধারণ করবেন। এখানেও বলা হয়েছে সব বর্ণের জন্যই অজের চর্ম উত্তরীয় রূপে ধারণ করা যেতে পারে।[৫] কৃষ্ণবর্ণের চর্ম উপবেশন বা শয়নের জন্য ভূমিতে

---

[১] বৈখা. গৃ. সূ ২/৫/১-৩

[২] কা. গৃ. সূ ৪১/৪/১/১৩

[৩] হি. গৃ. সূ ১/১/১৭

[৪] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/৩

[৫] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/৫-৭

বিছানো যাবে না- এই কথাও আপস্তম্ব বলেছেন।[১] *গৌতম ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যথাক্রমে কৃষ্ণমৃগের চর্ম, রুরুমৃগের চর্ম এবং ছাগের চর্ম উত্তরীয় রূপে ব্যবহার করবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অন্তর্বাস হিসেবে শণ, অতসী এবং উণীর উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের* ন্যায় এখানেও বলা হয়েছে যে প্রত্যেক বর্ণের ব্রহ্মচারী বর্ণহীন সুতির বস্ত্র উত্তরীয় রূপে পরিধান করতে পারেন অথবা গৈরিক, ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং হলুদ বর্ণের সুতির বস্ত্রও তারা ধারণ করতে পারেন।[২]*বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে মেখলা হিসেবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী যথাক্রমে মুঞ্জ, ধনুর জ্যা এবং পট্ট বস্ত্র ধারণ করতে পারেন এবং উত্তরীয় হিসেবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীরা কৃষ্ণমৃগ, রুরুমৃগ এবং অজের চামড়া উত্তরীয় হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।[৩] এই ব্রহ্মচারীর অন্তর্বাস সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণের মেখলা মুঞ্জতৃণ নির্মিত হবে, ক্ষত্রিয়ের মেখলা হবে মূর্ব্বা নামক তৃণ দ্বারা নির্মিত যার আকৃতি ধনুকের ছিলার মতো হবে এবং বৈশ্যের মেখলা তিন গাছি শণতন্তু দ্বারা নির্মিত হবে। মনু বলেছেন, এই তিন বর্ণের মেখলার মধ্যে সম (সমগুণত্রয়নির্মিত অর্থাৎ তিনটি রজ্জু সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট), শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ), ত্রিবৃৎ- এই তিন গুণ থাকা আবশ্যক।[৪] *বিষ্ণু সংহিতাতে* বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ মুঞ্জাঘাসের মেখলা, ক্ষত্রিয় ধনুকের জ্যা এবং বৈশ্য বল্বজজাতীয় তৃণবিশেষ মেখলা হিসাবে ব্যবহার করবেন। ব্রহ্মচারীর বস্ত্র ত্রৈবর্ণিকের ক্ষেত্রে যথাক্রমে

---

[১] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/৪

[২] গৌ. ধর্ম. সূ ১/১/১৬-২০

[৩] বৌ. ধর্ম. সূ ১/৩/১৪-১৫

[৪] মনু.সং ২/৪২

কার্পাসময়, শণময় এবং মেষলোমজাত হবে। উত্তরীয় হিসাবে এই ত্রৈবর্ণিকেরা যথাক্রমে মৃগের, ব্যাঘ্রের এবং ছাগের চর্ম ব্যবহার করবেন।[১]

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে একটি বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও ব্রহ্মচারীর পিতা বা গুরু বালকের ব্রহ্মশক্তির বৃদ্ধি কামনা করেন, তাহলে তাকে মৃগচর্মের উত্তরীয় পরাবেন। যদি কোনও ব্রহ্মচারীর পিতা বা গুরু ক্ষত্রিয়ের শক্তিবৃদ্ধি অর্থাৎ ক্ষাত্রতেজ কামনা করেন তাহলে তাকে সুতোর তৈরি কাপড় উত্তরীয়রূপে পরিধান করাবেন এবং বালকটি যদি ব্রহ্মশক্তি এবং ক্ষাত্রতেজ এই উভয় বিষয়ই লাভ করতে চায়, তাহলে হরিণের চামড়া ও সুতোর কাপড় উভয়ই ধারণ করাবেন।[২]

৩.১৪.২ দণ্ড:

গোভিল গৃহ্যসূত্র অনুসারে তিন বর্ণের ব্রহ্মচারীর হাতে যথাক্রমে পার্ণ অর্থাৎ পলাশ কাঠের, বৈল্ব অর্থাৎ বেল কাঠের এবং অশ্বত্থ কাঠের দণ্ড থাকবে।[৩] *জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী পলাশ কাঠের, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী ন্যগ্রোধ কাঠের এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী উদুম্বর কাঠের দণ্ড ব্যবহার করবেন। এখানে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে পলাশ কাঠের দণ্ড নাসিকা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। অন্য বর্ণের দণ্ডের পরিমাপ প্রসঙ্গে কোনও কিছু বলা হয়নি।[৪] *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে, তিন বর্ণের দণ্ড হবে যথাক্রমে পলাশ, ডুমুর এবং

---

[১] বিষ্ণু. সং ২৭/১৯-২০

[২] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/৯

[৩] গো. গৃ. সূ ২/১০/১১

[৪] জৈ. গৃ. সূ ১/১২

বেল কাঠের। এঁদের দণ্ডের পরিমাণ হবে যথাক্রমে কেশ, কপাল এবং নাসিকা পর্যন্ত দীর্ঘ।[১] *শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যথাক্রমে পলাশ বা বেল কাঠের, ক্ষত্রিয় ন্যগ্রোধ কাঠের এবং বৈশ্য ডুমুর কাঠের দণ্ড ব্যবহার করবেন। এঁদের দণ্ডগুলো যথাক্রমে নাসিকা, কপাল এবং চুল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের* ঠিক বিপরীত কথাই এখানে বলা হয়েছে। এই গৃহ্যসূত্রে একথাও বলা হয়েছে যে সব ধরণের যষ্টি সকলেই ব্যবহার করতে পারেন।[২] *পারস্কর গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী পলাশ কাঠের, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী ন্যগ্রোধ কাঠের এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী উদুম্বর কাঠের দণ্ড ব্যবহার করবেন। তিন বর্ণের দণ্ডের পরিমাপ হবে যথাক্রমে মাথার চুল, কপাল এবং নাসিকা পর্যন্ত।[৩] *বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে পারস্কর গৃহ্যসূত্রের* ন্যায় একই কাষ্ঠের দণ্ড ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং যদি কোনও কাষ্ঠের অভাব হয় তাহলে সকল বর্ণের ব্রহ্মচারীই সকল কাষ্ঠ ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু এখানে দণ্ডের পরিমাপ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।[৪] *বৈখানস গৃহ্যসূত্র* অনুসারে ব্রাহ্মণ পলাশ বা বেলের দণ্ড, ক্ষত্রিয় ন্যগ্রোধ এবং বৈশ্য উদুম্বর কাষ্ঠের দণ্ড ব্যবহার করবেন। এই দণ্ডের পরিমাপ হবে যথাক্রমে কেশ, ললাট এবং নাসিকা পর্যন্ত।[৫] *হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ বেল বা পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় ন্যগ্রোধের এবং বৈশ্য উদুম্বরের

---

[১] আ. গৃ. সূ ১/১৯/১৩

[২] শা. গৃ. সূ ১/১/১৮-২৪

[৩] পা. গৃ. সূ ২/৫/২৫-২৭

[৪] বৌ. গৃ. সূ ২/৫/১৭

[৫] বৈখা. গৃ সূ ২/৪/১-৩

দণ্ড ব্যবহার করবেন।[১] *আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রতে* বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী ন্যগ্রোধের নিম্নের যে শাখা আছে সেটির তৈরি দণ্ড এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী উদুম্বর শাখার দণ্ড ব্যবহার করবেন।[২]

গৌতম ধর্মসূত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বিল্ব অথবা পলাশের, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পীপল অথবা পীল্লু কাঠের দণ্ড ধারণ করবেন।[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সময়ানুসারে বর্ণ অনুযায়ী যে বর্ণের যে রকম দণ্ডের কথা বলা হয়েছে, তা যদি না পাওয়া যায় তাহলে যে কোনও যজ্ঞীয় বৃক্ষের দণ্ড এই তিন বর্ণের ব্রহ্মচারী ধারণ করতে পারেন। ব্রাহ্মণের দণ্ড মাথার চুল অবধি দীর্ঘ হবে, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর দণ্ড কপাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং বৈশ্যকুমারের দণ্ড নাসিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।[৪] গৌতম তাঁর ধর্মসূত্রে বলেছেন কীট-পতঙ্গাদির দ্বারা বিনষ্ট হয়নি এবং যজ্ঞের কাষ্ঠের ন্যায় বক্র ও ছালযুক্ত দণ্ডই ব্রহ্মচারী ব্যবহার করবেন।[৫] অপরদিকে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির দণ্ড হবে সরল, ক্ষতবিহীন, বিশুদ্ধ এবং কণ্টকবিহীন, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর নিকটে ত্রাসবিহীন এবং বজ্রাগ্নি বা দাবাগ্নির দ্বারা অদূষিত বা অস্পৃষ্ট।[৬] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* দণ্ড কোন বর্ণের কোন কাষ্ঠের হবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, তবে একথা বলা হয়েছে যে তিন বর্ণের ব্রহ্মচারী

---

[১] হি. গৃ. সূ ১/১/১৭

[২] আপ. ধর্ম. সূ ১/১/৩৩-৩৭

[৩] গৌ. ধর্ম. সূ ১/১/২১-২২

[৪] গৌ. ধর্ম. সূ ১/১/২৩,২৫

[৫] গৌ. ধর্ম. সূ ১/১/২৪

[৬] মনু.সং ২/৪৭, বিষ্ণু. সং ২৭/২৪

যথাক্রমে শির, ললাট এবং নাসিকা পর্যন্ত দণ্ড ধারণ করবেন।[১] *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর দণ্ড বেল বা পলাশ কাঠের হবে, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর দণ্ড বট বা খদির কাষ্ঠের এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীর দণ্ড পিলু বা উদুম্বর কাঠ দিয়ে নির্মিত হবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর দণ্ডের উচ্চতা হবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের দণ্ডের উচ্চতা হবে ললাট পর্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসাগ্র পর্যন্ত। সকলের জন্য সকল প্রকার দণ্ড ব্যবহার অনুমোদিত।[২]

৩.১৪.৩ যজ্ঞোপবীত:

যজ্ঞোপবীতের উৎপত্তি এবং তার ধারণ করার পরম্পরা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমেই দ্বিজ বালককে যজ্ঞোপবীত ধারণ করানো হয়ে থাকে। উপনয়ন ও যজ্ঞোপবীত এই দুটির মধ্যে সম্বন্ধ প্রাচীন যুগ থেকেই বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই আজও আজীবন যজ্ঞোপবীতকে শরীরের সঙ্গে যুক্ত রাখেন। এটি ব্রহ্মতেজকে ধারণ করে এবং সমস্ত দেব ও পিতৃ কর্মকে সম্পাদিত করার যোগ্যতা প্রদান করে বলে এটিকে ব্রহ্মসূত্র ও দেবসূত্রও বলা হয়ে থাকে। যজ্ঞোপবীত শব্দ 'যজ্ঞ' আর 'উপবীত' এই দুই শব্দের যোগে তৈরি হয়েছে, যার অর্থ হল যজ্ঞের দ্বারা পবিত্র হওয়া সূত্র। সাকার পরমাত্মাকে যজ্ঞ আর নিরাকার পরমাত্মাকে ব্রহ্ম বলা হয়। যাঁরা দ্বিজ তাঁরা এই দুই সাকার ও নিরাকার পরমাত্মার অধিকার প্রাপ্ত হন এই যজ্ঞোপবীত সংস্কারের মাধ্যমে।

বৈদিক গ্রন্থে এই যজ্ঞোপবীতের উল্লেখ আছে। এটি কোনও ঋষি দ্বারা নির্মিত সূত্র নয়। যজ্ঞোপবীত নির্মাণের বিশেষ প্রক্রিয়া শাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে।

---

[১] বৌ. ধর্ম. সূ ১/৩/১৬

[২] মনু.সং ২/৪৫-৪৬, বিষ্ণু. সং ২৭/২১-২৩

৩.১৪.৩.১ যজ্ঞোপবীতের নির্মাণ বিধি:

মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁর *কাত্যায়নপরিশিষ্ট* গ্রন্থে যজ্ঞোপবীত নির্মাণ সম্পর্কে বলেছেন যে যজ্ঞোপবীত নির্মাণের জন্য গ্রামের বাইরে কোনও তীর্থস্থান বা গোশালাতে গিয়ে অনধ্যায় রহিত যে কোনও দিবসে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম তথা একশো আট অথবা এক হাজার আট বার অথবা যথাশক্তি গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করে এমন সুতো দিয়ে যজ্ঞোপবীত তৈরি করতে হবে, যেটির সুতো স্বয়ং অথবা কোনও ব্রাহ্মণ দ্বারা অথবা ব্রাহ্মণকন্যা দ্বারা অথবা সধবা ব্রাহ্মণী দ্বারা কেটে তৈরি করা হয়েছে। এই সুতোকে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথম শব্দ 'ভূঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ৯৬ আঙ্গুল পরিমাণ সুতো চারটি আঙুলের মূলে জড়িয়ে নিতে হবে এরপর দ্বিতীয় বার 'ভূবঃ' শব্দের উচ্চারণ করে এবং তৃতীয়বার 'স্বঃ' শব্দের উচ্চারণ করে একইভাবে তিনবার এই ক্রিয়া করে তারপর সেই সুতোকে আঙুল থেকে তুলে পলাশ গাছের পাতার উপর রাখতে হবে। এরপর 'আপো হি ষ্ঠা', 'শং নো দেবী' 'তৎসবিতুঃ'- এই তিন মন্ত্রের দ্বারা ওই তিনটি তারকে জলে ভালো মতো ভিজিয়ে বাঁ হাতে নিয়ে তিন বার জোরে আঘাত করতে হবে। আবার ওই তিনটি ব্যাহৃতির দ্বারা সুতো তিনটিকে একসঙ্গে করে নিতে হবে। আবার একই মন্ত্রের দ্বারা এটিকে ত্রিগুণিত করে প্রণবের দ্বারা এটিতে ব্রহ্মগ্রন্থি লাগিয়ে নিতে হবে। এই যজ্ঞোপবীতের নয়টি তন্তুতে ওঙ্কার, অগ্নি, অনন্ত, চন্দ্র, পিতৃগণ, প্রজাপতি, বায়ু, সূর্য এবং সমস্ত দেবতা অর্থাৎ নয় জন দেবতাকে ক্রমশ আবহন ও স্থাপন করতে হবে। 'উদ্বয়ং তমসস্পরি'- এই মন্ত্রদ্বারা ওই সুতোকে সূর্যের সম্মুখ করে 'যজ্ঞোপবীতম্' মন্ত্র বলে এই যজ্ঞোপবীতকে ধারণ করে নিতে হবে।[১]

---

[১] কাত্যা.পরি,সংস্কারপ্রকাশ

কাত্যায়ন সংহিতাতে বলা হয়েছে যে তিনটি করে তার একসঙ্গে করে মোট নয়টি তার দিয়ে উপবীত তৈরি করা হয়ে থাকে এবং অবশেষে একটি একটি গিঁট দিতে হয়। এইভাবেই উপবীত তৈরি হয়ে থাকে।[১]

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাস সূত্রের দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের উপবীত শণ সূত্রের দ্বারা এবং বৈশ্যের উপবীত মেষলোম দ্বারা নির্মিত হবে। উপবীতটি তিন গাছি সুতোর দ্বারা নির্মিত হবে এবং ঊর্ধ্ব থেকে নিম্ন দিকে লম্বিত হবে।[২] *বিষ্ণু সংহিতাতে* বলা হয়েছে ব্রহ্মচারীর উপবীত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে মনুসংহিতায় কথিত উপবীতের ন্যায় বস্তু দিয়ে তৈরি হবে কিন্তু বৈশ্যের ক্ষেত্রে এটি মেষলোমজাত হবে।[৩]

৩.১৪.৩.২ যজ্ঞোপবীতের তিনটি অবস্থা:

তৈত্তিরীয় সংহিতায় যজ্ঞোপবীত অর্থাৎ উপবীতের উল্লেখ পাওয়া যায় । এখানে বলা হয়েছে "নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণাম্ উপবীতং দেবানাম্।" (তৈ. সং ২.৫.১১.১) অর্থাৎ তিনটি বিশেষ কাজের সময় যজ্ঞোপবীত তিনটি বিশেষ নামে প্রসিদ্ধ হয় অর্থাৎ এই যজ্ঞোপবীত তিন ভাবে ধারণ করা যায় এবং এই তিন স্থিতির তিনটি নাম আছে, সেগুলো হল- ১.উপবীতী (সব্য) ২. নিবীতী (কণ্ঠী অথবা মালার মতো) ৩. প্রাচীনাবীতী (অপসব্য)।

উপবীতী: যজ্ঞোপবীত বা উপবীত ধারণের রীতি হল বাম কাঁধ থেকে ডান দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া। এই বিষয়ে বলা হয়েছে- উপনীত বালক ডান হাত উত্তোলন করে, মাথাটি

---

[১] কা. সং ১/২

[২] মনু. সং ২/৪৪

[৩] বিষ্ণু. সং ২৭/১৯, উশ. সং ১/৬

যজ্ঞসূত্রের অর্থাৎ উপবীতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সূত্রটি এমন ভাবে বাম কাঁধের উপর স্থাপন করবেন যাতে সেটি ডান দিকে ডান হাতের কক্ষের উপর ঝুলে থাকে। এইভাবে উপবীত ধারণকারী ব্যক্তি যজ্ঞোপবীতী নামে অভিহিত হবেন। এমন ব্যক্তিকে উপবীতীও বলা হয়। সামান্য স্থিতিতে যজ্ঞোপবীত এইরকমই পরে থাকতে হয় এবং সমস্ত মাঙ্গলিক এবং দেবকার্যও এই উপবীতধারণের মাধ্যমেই হয়। তখন তাকে উপবীতী বা সব্যবস্থা বলা হয়। সামান্য স্থিতিতে যজ্ঞোপবীত এইরকমই পরে থাকতে হয় এবং সমস্ত মাঙ্গলিক এবং দেবকার্যও এই উপবীত ধারণের মাধ্যমেই হয়। তখন তাকে উপবীতী বা সব্যবস্থা বলা হয়।[১]

নিবীতী: যে সময় পিতৃকার্য বা দৈবকার্য কিছুই করা হবে না, সেই সময় অথবা মলমূত্র ত্যাগ করার সময় উপবীতটিকে নিবীতরূপে ধারণ করতে হয়। মনু বলেন, নিবিতী কণ্ঠমঞ্জনে।[২] যজ্ঞোপবীতকে যখন গলায় কণ্ঠীর মত অর্থাৎ মালার মতো ধারণ করতে হয় তখন তাকে নিবীতী বলা হয়।[৩]

প্রাচীনাবীতী : প্রাচীনাবীতী হলেন যাঁরা ডান হাত তুলে মাথাটি যজ্ঞসূত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে যজ্ঞসূত্র বা উপবীতটিকে ডান কাঁধের উপর স্থাপন করে বাম দিকের হাতের কক্ষের নীচে ঝুলিয়ে দেন। এইভাবে যজ্ঞসূত্র ধারণ করলে তাঁকে প্রাচীনাবীতী নামে অভিহিত হয়। একে অপসব্যাবস্থা বলা হয়ে থাকে। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির সময় এইরকম প্রাচীনাবীত ব্যবহৃত হয়। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির সময় এইরকম প্রাচীনাবীতী হয়ে যজ্ঞ করতে

---

[১] গো. গৃ. সূ ১/২/২, উশ. সং ১/৯

[২] মনু.সং ২/৬৩

[৩] গো. গৃ. সূ ১/২/৪,উশ. সং ১/৯

হয়। আর দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সময় পূর্বোক্ত যজ্ঞোপবীতী অবস্থায় থাকতে হয়।[১] অগ্নি গৃহে অর্থাৎ সাগ্নিকদিগের হোমগৃহে, গাভীর গোষ্ঠে, হোমের সময়, জপের সময়, নিজ বেদের অধ্যয়নকালে, ভোজনকালে ব্রাহ্মণ দিগের নিকটে থাকার সময়, গুরুর উপাসনা সময় ও সন্ধ্যাহ্নিকের সময় অবশ্যই ব্রহ্মচারীকে উপবীত হয়ে হবে।[২]

৩.১৪.৩.৩ যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ কটি অর্থাৎ কোমর অবধি রাখার কারণ:

পৃথিবীতে প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতা সমান হয় না। কোনও ব্যক্তির উচ্চতা বেশি, আবার কোনও ব্যক্তির উচ্চতা কম হয়। কেউ স্থূলশরীর-বিশিষ্ট হয়, আবার কেউ শীর্ণকায় হয়। এই কারণে শাস্ত্রকাররা যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ ৯৬ আঙ্গুল অর্থাৎ কোমর পর্যন্ত রাখার কথা বলেছেন। মানুষের শরীরের উচ্চতা ৮৪ আঙ্গুল থেকে ১০৮ আঙ্গুল অবধিই হয়। ৯৬ আঙ্গুল পরিমাণ যজ্ঞোপবীত তৈরি করলে এবং সেটিকে ধারণ করলে তার উচ্চতা কাঁধ থেকে কোমর অবধিই হবে অর্থাৎ এটি পুরুষের বাঁ কাধের উপর থেকে এসে নাভিকে স্পর্শ করে কোমর অবধি পৌঁছাবে। সেটি তার উপরেও থাকবে না এবং নীচেও থাকবে না। *কাত্যায়ন সংহিতাতে* এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে- পৃষ্ঠদেশে চ নাভ্যাঞ্চ ধৃতং যদ্বিন্দতে কটিম্। তদ্ধার্যমুপবীতং স্যান্নাতিলম্বং ন চোচ্ছিতম্।।[৩]

বসিষ্ঠ তাঁর ধর্মসূত্রে বলেছেন যে উপবীত যদি নাভির উপরে থাকে তাহলে আয়ুর হানি হয় এবং নাভির নীচে থাকলে তপস্যার ক্ষয় হয়। তাই বিচক্ষণ ব্যক্তি নাভির সমান

---

[১] গো.গৃ ১/২/৩-৪, উশ. সং ১/১০

[২] উশ. সং ১/১১-১২

[৩] ক্যা. স্মৃ ১/৩

থাকে এইরকম উপবীত ধারণ করবেন। নাভে রুর্দ্ধমনায়ুষ্যম্ অধো নাভেস্তপঃক্ষয়ঃ। তস্মাৎ নাভিসমং কুর্ষাৎ উপবীতং বিচক্ষণঃ।।[১]

৩.১৪.৩.৪ যজ্ঞোপবীততে তিনটি সূত্র থাকার কারণ এবং ত্রিবৃৎ বলার কারণ:

বেদমন্ত্র তিন প্রকার- ঋক্, সাম এবং যজুঃ। পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রধান দেবতাও তিনজন। যথা- ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। কালও তিনটি- ভূত অর্থাৎ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। গুণ তিনটি- সত্ত্ব, রজ, তমঃ। গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত- এই তিনটি ঋতু। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক- এই তিনটি লোক। এই সব ত্রিগুণাত্মক ভাবকে আধার বানিয়েই ত্রিগুণাত্মক তন্তুর দ্বারা যজ্ঞোপবীতের নির্মাণ এবং ত্রিবৃৎকরণ করা হয়েছে। এই তিনটি সুতোর মধ্যেই মানবত্ব, দেবত্ব এবং গুরুত্ব ভাব নিহিত আছে। যজ্ঞোপবীতের প্রেরণার দ্বারাই মার্গদর্শন এবং শিক্ষার দ্বারা মৃত্যুলোক থেকে দ্যুলোক এবং ঊর্ধ্বগমনের জন্য উপাসনা, ধ্যান এবং সৎ কর্মের ভাব মানুষ গ্রহণ করে। এটিই নির্বাণের মার্গকে অর্থাৎ পথকে প্রশস্ত করে।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে মেখলা, উত্তরীয় চর্ম, দণ্ড, যজ্ঞোপবীত এবং কমণ্ডলু ছিন্ন হলে বা ভগ্ন হলে এগুলোকে জলে নিক্ষেপ করে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নতুন মেখলাদি ধারণ করতে হয়।[২]

৩.১৪.৩.৫ পুরানো যজ্ঞোপবীত ত্যাগ এবং নতুন যজ্ঞোপবীত ধারণ করার পদ্ধতি:

পুরনো উপবীতটিকে মন্ত্রের দ্বারা কণ্ঠীর মতো ধারণ করে মাথা দিয়ে পিঠের দিক থেকে আলাদা করে দিতে হবে। এরপর ত্যাজ্য যজ্ঞোপবীতটিকে জলে প্রবাহিত করে দিতে হবে অথবা কোনো পবিত্র স্থানে রেখে দিতে হবে। এরপর যথাশক্তি গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করে

---

[১] সং.রত্ন.মা, ১ম ভাগ, উপ. প্র পৃ ১৮৩

[২] মনু.সং ২/৬৪, বিষ্ণু. সং ২৭/২৮-২৯

অথবা কমপক্ষে দশবার গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করে "ওঁ তত্সৎ শ্রীব্রহ্মার্পণমস্তু" এই মন্ত্র বলে হাত জোড় করে ভগবানের স্মরণ করতে হবে। উপবীত সংস্কৃত ব্রহ্মসূত্র, তাকে সংস্কারের দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শরীর থেকে আলাদা করা যায় না। এই নিয়ম যদি কোনও কারণবশতঃ দ্বিজ বালক পালন না করতে পারেন অর্থাৎ যদি কোনও অবসর আসে, তখন পূর্বের যজ্ঞোপবীতকে অশুদ্ধ মনে করে নবীন যজ্ঞোপবীত ধারণ করা আবশ্যক। যদি অসাবধানতাবশত যজ্ঞোপবীত বাঁ কাঁধ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়ে বাঁ হাতের নীচে চলে আসে অথবা সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে কোমরের নীচে চলে আসে, অথবা বস্ত্রাদি খোলার সময় ওই বস্ত্রাদির সঙ্গে শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায় অথবা যজ্ঞোপবীতের কোনও সুতো ছিড়ে যায়, তাহলে নবীন প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করা দরকার। "বামহস্তে ব্যতীতে তু তত্ ত্যক্ত্বা ধারয়েত্ নবম্।" যদি মলমূত্র ত্যাগ করার সময় যজ্ঞোপবীত কানে জড়াতে ভুল হয়ে যায় অথবা কানে জড়ানো সুতো যদি কান থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখনও নতুন যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হবে। উপাকর্ম, জননাশৌচ, মরণাশৌচ, শ্রাদ্ধকর্ম, সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ, অস্পৃশ্যের স্পর্শ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথা শ্রাবণীতে যজ্ঞোপবীতকে অবশ্যই পরিবর্তন করা দরকার। যজ্ঞোপবীত শরীরের ময়লার দ্বারা দূষিত হলে অথবা জীর্ণ হয়ে গেলে প্রতি তিন, চার মাসে নতুন যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হবে।

শ্রাবণী উপকর্মের দিনে সারা বছরের জন্য যজ্ঞোপবীতকে অভিমন্ত্রিত করে রাখা দরকার, কিন্তু যদি কোনও কারণবশত যজ্ঞোপবীতকে অভিমন্ত্রিত না করা যায়, তাহলে ওই সময়ের মধ্যে সর্বপ্রথম শুদ্ধ আসনের উপর পূর্বাভিমুখ হয়ে বসে আচমন করার পর নিজের সামনে পলাশের পাত্র অথবা কোনও পাত্রে নবীন যজ্ঞোপবীত রেখে জলের দ্বারা প্রক্ষালিত করে তারপর কিছু মন্ত্র পড়ে এক একটি ফুল অথবা জলকে যজ্ঞোপবীতের উপর ছাড়া হয়।

এরপর "প্রণবাদ্যবাহিতদেবতাভ্যো নমঃ" মন্ত্রের দ্বারা "যথাস্থানং ন্যাসামি"- এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আবার সেই সেই তন্তুতে ন্যাস করে চন্দনাদি দিয়ে পূজন করে যজ্ঞোপবীতটিকে দশবার গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করা হয়। এইভাবে নূতন যজ্ঞোপবীতের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর এই উপবীত দ্বিজের ধারণযোগ্য হয়।

৩.১৫ ব্রহ্মচারীর কর্তব্য ও অকর্তব্য:

ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের জন্য কিছু নিয়মের উপদেশ রয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য- এই তিন শ্রেণীর ব্রহ্মচারীর পক্ষে পালনীয় বেশ কিছু ব্রত নিয়মাদির নির্দেশ আছে। আচার্যের প্রতি ব্রহ্মচারীর অবশ্যকর্তব্য এবং অকর্তব্য কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে- আচার্য ব্রহ্মচারীকে আহ্বান করলে ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তর দেবে, শুয়ে থাকলে দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে থাকলে মুখোমুখি হয়ে এবং মুখোমুখি থাকলে দৌড়ে গুরুর নিকটে গিয়ে প্রত্যুত্তর দেবে।[১] গুরুকে অথবা বিদ্বান কোনও ব্যক্তিকে ব্রহ্মচারী নিজের গোত্র এবং নাম নম্রভাবে জানাবে। গুরু আজ্ঞা দিলে তবেই ব্রহ্মচারী শয্যা, আসন অথবা যে স্থানে আছে সেই স্থান থেকে উঠে গুরুর কথার উত্তর দেবে এবং যদি গুরু দূর থেকে কিছু কথা শিষ্যকে বলেন তাহলে শিষ্য গুরুর নিকটে গিয়ে তার উত্তর দেবে।[২]

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। বারো বছর করে এক একটি বেদ অধ্যয়ন করতে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে- যতদিন বেদ পড়বে ততদিনই ব্রহ্মচর্য পালনীয়। যদি কোনও ব্রহ্মচারী তিনটি বেদ পড়তে

---

[১] পা. গৃ. সূ ২/৫/২৯-৩০, মনু.সং ২/১৯৬-১৯৭

[২] গৌ. ধর্ম. সূ ১/২/২৮-৩১

ছত্রিশ বছর সময় নেন তাহলে তাঁকে ওই ছত্রিশ বছরই ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।[১] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে উপনীত বালক ব্রহ্মচারী হয়ে আচার্যকুলে বসবাস করবেন। প্রত্যেক বেদ অধ্যয়নকারী বারো বছর করে আটচল্লিশ বছর অথবা নয় বছর করে ছত্রিশ বছর অথবা তিন বছর করে বারো বছর বেদ অধ্যয়ন করবেন। সুতরাং গুরুকুলে নিবাস করার সর্বনিম্ন সময় হল বারো বছর।[২]

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে উপনয়ন সংস্কারে দীক্ষিত করবেন যে আচার্য বা গুরু তার সম্পর্কে বলা হয়েছে- এই সংস্কার বেদের নিয়ম অনুসারে করা হয়ে থাকে। গায়ত্রী মন্ত্রের অধ্যয়ন সমস্ত বেদের অধ্যয়ন করতেই প্রয়োজন। উপনয়ন সংস্কারে উপনীত ব্যক্তিরাই নতুন কাউকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করতে পারেন।[৩] উপনয়ন সংস্কারের ক্ষেত্রে আচার্য এমন একজন ব্যক্তিকে হতে হবে যাঁর জন্ম বেদবিদ্যা অধ্যয়নের অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাযুক্ত কোনও কুলে হয়েছে, ছয়টি বেদাঙ্গের সঙ্গে বেদের উপযুক্ত অর্থজ্ঞান যাঁর সঙ্গে যুক্ত আছে এবং যিনি ধর্মমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। যিনি ধর্মের চয়ন করেন এবং ধর্মের জ্ঞান লাভ করেন তিনিই আচার্য হওয়ার যোগ্য। এই আচার্যের প্রতি কখনও দ্রোহ এবং অপকার করা উচিত নয়। এই আচার্য শিষ্যকে বেদবিদ্যার দ্বারা পারদর্শী করেন। পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে উৎপন্ন করেন[৪] কিন্তু আচার্য পুরুষার্থপ্রাপ্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীকে সমর্থ করেন এবং তাকে

---

[১] পা. গৃ. সূ ২/৫/১৩-১৫

[২] আপ. ধর্ম ১/১/১১-১৬

[৩] আপ. ধর্ম ১/১/৯-১১

[৪] আপ.ধর্ম ১/১/১২-১৬

স্বর্গসুখ তথা নিঃশ্রেয়স মোক্ষ লাভ করতে সাহায্য করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে পিতামাতার থেকেও শ্রেষ্ঠ হলেন গুরু।[১]

ব্রহ্মচারীর অবশ্যকর্তব্য কর্ম হল সর্বদা দণ্ড, যজ্ঞোপবীত, মেখলা, অজিন ধারণ করা এবং অগ্নিপরিচর্যা, গুরুসেবা ও ভিক্ষাচরণ করা। মধু. মাংস, জলাশয়ে স্নান, জলক্রীড়া ইত্যাদি বর্জন, শরীরমার্জনপূর্বক স্নান পরিত্যাগ, তাম্বুল, উবটন, কাজল, দর্পণ, ছাতা, জুতো তথা কাঁসার পাত্রে ভোজনত্যাগ- এই সমস্ত নিয়ম পালন করতে হবে। ব্রহ্মচারী খাটে শয়ন করবেন না এবং দিনে শয়ন করবেন না। স্ত্রীগমন, মিথ্যাভাষণ এবং একজনের দান করা দ্রব্য অন্যকে দান- এই কাজগুলি তিনি করবেন না।[২] বিদ্যাগ্রহণের অভিলাষযুক্ত ব্রহ্মচারীকে গুরুকুলে সর্বদা আচার্যের নিকটেই থাকতে হবে। অন্য কোথাও একদিনের জন্য বসবাস করা যাবে না।[৩] ব্রহ্মচারী গুরুর কাছে ভূমিতে সজ্জা তৈরি করে শয়ন করবেন। ব্রহ্মচারী গুরুর শয্যার থেকে নীচু শয্যায় শয়ন করবেন ও বসবেন। গুরুর শয্যাত্যাগ করার পূর্বে শয্যাত্যাগ করবেন এবং গুরু শয়ন করার পরই নিজে শয়ন করবেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অথবা দেবতাকে দেওয়া দ্রব্য ভোজন করবেন না। সুগন্ধিদ্রব্য সেবন ও লেপনও করবেন না। সকল প্রকার মৈথুনসুখ বর্জন করবেন। যদি শরীরের অঙ্গ অপবিত্র বস্তুর দ্বারা লিপ্ত হয়, তাহলে মাটি অথবা জল দিয়ে শরীরের সেই অঙ্গ ধুতে হবে এবং এমন এক জায়গায় ধুতে হবে যেখানে তাঁকে গুরু দেখতে পাবেন না। সমস্ত কেশকে জটাকারে বেঁধে রাখতে হবে অথবা শিখাকেই

---

[১] আপ. ধর্ম ১/১/১৮

[২] পা. গৃ. সূ ২/৫/১১-১২, গো. গৃ. সূ ২/৯/৪২-৪৪

[৩] আপ.ধর্ম ১/১/১৭

জটা বানিয়ে ধারণ করতে হবে।[১] ব্রহ্মচারীদের নিষিদ্ধ কর্মগুলি হল এইরূপ- তাঁরা নৃত্য দেখবেন না। দ্যুতাদি সভা অথবা উৎসবাদির ভিড়ে যাবেন না। ইন্দ্রিয়ের অনুচিত বিষয়ে ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করবেন। নিজের কর্তব্যপালনে তৎপর হবেন। তিনি লজ্জাশীল হবেন। ধৈর্য অথবা আত্মসংযম দ্বারা যুক্ত হবেন। তিনি কারও প্রতি ক্রোধ অর্থাৎ রাগ করবেন না। কারও ভালো দেখে হিংসা করবেন না।[২] আচার্য শিষ্যকে এমন কোনও বস্তু দান করবেন না যেগুলি শাস্ত্র দ্বারা নিষিদ্ধ। যেমন- সুস্বাদু লবণজাতীয় খাদ্য, মধু, মাংস প্রভৃতি। এছাড়া সুগন্ধিত লেপন, মালা প্রভৃতি।[৩]

ব্রহ্মচারী গুরুর জন্য প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় ঘড়া করে জল নিয়ে আসবেন। প্রতিদিন বন থেকে যজ্ঞের জন্য কাঠ সংগ্রহ করবেন এবং সেটিকে আচার্যের গৃহের নীচে রাখবেন। সূর্যাস্তের পরে বন থেকে যজ্ঞের কাঠ সংগ্রহ করতে যাবেন না। অগ্নি প্রজ্বলন করে, অগ্নির চারদিকের ভূমি নিজের হাতে পরিষ্কার করে কোনও সম্মার্জনী দ্বারা তা পরিষ্কার করবেন না। তারপর গৃহ্যসূত্রে উক্ত বিধির দ্বারা সন্ধ্যা এবং সকাল বেলায় সমিদাধান করবেন। কিন্তু অগ্নিতে সমিধ দেওয়ার আগে ইচ্ছানুসারে সম্মার্জনী ব্যবহার করতে পারবেন। যে জলে হাত দেওয়া হয়েছে অথবা যেই জলকে এক হাত দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই জল দিয়ে আচমন করা যাবে না। অর্থাৎ দুই হাত দিয়ে আনা জলের দ্বারা আচমন করতে হবে। বাঁ হাত দিয়ে আনা জল দ্বারা আচমন করা যাবে না।[৪] দিনের বেলা শয়ন করা নিষিদ্ধ

---

[১] আপ. ধর্ম ১/১/১৯-৩২

[২] আপ. ধর্ম ১/১/১১-২৪

[৩] আপ. ধর্ম ১/১/৪-৭, বৌ. গৃ. সূ ২/৫/৫৬, গৌ. ধর্ম. সূ ২৬

[৪] আপ. ধর্ম ১/১/১৩-১৬, ১৮-২১

তো বটেই, এমনকী রাত্রিতে গুরু শয়ন না করা অবধি শয়ন করা যাবে না।[১] জাগার পর অর্থাৎ ঘুম থেকে ওঠার পর প্রতিদিন ধর্মার্থ কর্মের দ্বারা গুরুর রক্ষা করতে হবে। এইভাবে গুরুর সহায়তা করার পর শয়ন করতে যাওয়ার সময় "ধর্মগোপায়মাজগুপমহম্"- এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। যদি গুরু জেনে বুঝে অথবা ভুলবশত কোনও নিয়মের উল্লঙ্ঘন করে এবং তার প্রতিকার না করে তাহলে যে কর্মটি গুরুর করার কথা ছিল সেই কর্মটি ব্রহ্মচারী স্বয়ং করবে।[২]

"তপঃ" শব্দের প্রয়োগ ব্রহ্মচারীর নিয়মের জন্য বলা হয়েছে। যে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্যের নিয়মের উল্লঙ্ঘন করে বেদের অধ্যয়ন করে তাঁর দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ তথা অন্য ধর্মকৃত্যতে উচ্চারিত বেদমন্ত্রের কোনও পুণ্যফল হয় না। এছাড়াও সেই ব্রহ্মচারী নরকলাভ করেন এবং তাঁর আয়ু কমে যায়।[৩] নিয়মের পালন করে ব্রহ্মচারী বেদের অতিরিক্ত যা কিছু গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন তার ফল বেদাধ্যয়নের ফলের সমানই হয়।[৪] ব্রহ্মচারীর কর্তব্য ধর্ম হল গুরুকে প্রসন্ন করার জন্য তাঁকে কর্ম করতে হবে, কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য কর্ম করতে হবে তথা বেদের পরিশ্রমপূর্বক অভ্যাস করতে হবে।[৫] অধ্যয়নের সময় এবং গুরুর সেবা করার সময় অন্যদিকে মন দেওয়া যাবে না। যখন অধ্যয়ন করবে না তখনও অধ্যয়নের বিষয় চিন্তা করবেন। গুরু যখন বলবেন তখনই গুরুর নিকটে অধ্যয়নের জন্য যাবেন, নিজের থেকে

---

[১] আপ. ধর্ম ১/১/২২

[২] আপ.ধর্ম ১/১/২৩-২৬

[৩] আপ.ধর্ম ১/২/১-৩

[৪] আপ.ধর্ম ১/২/৭

[৫] আপ.ধর্ম ১/২/৯

অধ্যয়নের জন্য কখনই গুরুর নিকটে যাবেন না।[১] প্রতিদিন রাত্রিতে গুরুর শয়ন করার আগে গুরুর চরণ ধুয়ে তাঁর শরীর মর্দন করবেন ব্রহ্মচারী। তারপর গুরুর আজ্ঞা পেয়ে তিনি নিজে শয়ন করবেন। নিজের পা গুরুর দিকে দিয়ে শোবেন না। কোনও কোনও ধর্মজ্ঞের মতে যদি গুরু খাটে শয়ন করেন তাহলে তাঁর দিকে পা দিয়ে শোওয়াতে কোনও দোষ নেই। আচার্যের সামনে ব্রহ্মচারী অর্থাৎ শিষ্য সুখপূর্বক বসে বার্তালাপ করবেন না। আচার্যের সঙ্গে শিষ্য বসে বা শুয়ে বাক্যালাপ করবেন না। যদি গুরু স্বয়ং শুয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে গুরুর সঙ্গে শিষ্য বসে বার্তালাপ করতে পারবেন। যদি গুরু দাঁড়িয়ে কথা বলেন, তবে শিষ্যও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন। গুরু হাঁটাচলা করলে বা দৌড়লে শিষ্য সদাসর্বদা তাঁর পিছনেই চলবেন এবং দৌড়বেন, গুরুর সামনে জুতো পরে অথবা হাতে কোনও উপকরণ নিয়ে আসবেন না, কিন্তু যাত্রার সময় অথবা কার্য করার সময় তিনি জুতো পরতে পারেন এবং হাতে উপকরণও নিতে পারেন। গুরুর কাছাকাছি কোনও জায়গায় বসবেন না। নিজের আরাধ্য দেবতাকে যেমন শ্রদ্ধা করা হয়, গুরুকেও সেভাবে শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁর সামনে কোনও খারাপ কথা বলা যাবে না এবং মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতে হবে। গুরুর সামনে পায়ের উপর পা তুলে বসা যাবে না।[২] যদি ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী দুটি বস্ত্র ধারণ করেন, তাহলে উপরের বস্ত্রটি যজ্ঞোপবীতের মতো গায়ে জড়িয়ে নেবেন। যদি একটি বস্ত্র ধারণ করেন, তাহলে তাকে অধোবস্ত্র হিসেবেই ধারণ করবেন।[৩] ব্রহ্মচারী গুরুর খুব কাছেও থাকবেন না, আবার খুব দূরেও অবস্থান করবেন না। যেখানে বসলে গুরুর দুই হাত স্পর্শ

---

[১] আপ.ধর্ম ১/২/২৩-২৬

[২] আপ. ধর্ম ১/২/১-১৪

[৩] আপ. ধর্ম ১/২/১৮-২১

করা যাবে সেইরকম দূরত্বেই শিষ্য উপবেশন করবেন। যদি একজন শিষ্য অধ্যয়ন করেন, তাহলে তিনি গুরুর ডান দিকে বসবেন। যদি অনেক শিষ্য অধ্যয়ন করেন, তাহলে তাঁরা তাঁদের সুবিধা অনুসারে যেখানে জায়গা পাবেন সেখানেই বসবেন।

যেখানে গুরুর বসার জন্য আসন থাকবে না, সেখানে শিষ্য নিজেই বসবেন না।[১]

গৌতম ধর্মসূত্র অনুযায়ী যজ্ঞোপবীত সংস্কার হওয়ার আগে ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয়সংযম করবেন এবং স্ত্রী সম্পর্কিত কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে কোনও আলোচনা করবেন না।[২] কিন্তু উপনয়ন সংস্কারে উপনীত হয়ে যাওয়ার পরে সত্য কথাই বলতে হবে। ব্রহ্মচারী জলের দ্বারা প্রতিদিন স্নান করবেন।[৩] প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাতে নক্ষত্র যখন দেখা যায় সেই সময় থেকে সূর্যোদয়ের সময় পর্যন্ত ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে থাকেন এবং সন্ধ্যাকালে যখন সূর্যের জ্যোতি দেখা যাবে সেই সময় থেকে নক্ষত্র দেখার সময় অবধি ব্রহ্মচারী বসবেন এবং মৌন হয়ে সন্ধ্যাপোসনা করবেন। ব্রহ্মচারী কখনওই সূর্যদর্শন করবেন না। ব্রহ্মচারী পিতা, আচার্য এবং গুরুর দিকে পা বাড়িয়ে বসবেন না, দেওয়াল বা স্তম্ভের সাহায্য নিয়েও তাঁর বসা যাবে না। মৈথুনের শঙ্কা থাকলে ব্রহ্মচারী কোনও নারীর অঙ্গের দিকে কামুকতাপূর্বক দৃষ্টিপাত করবেন না এবং স্পর্শ করবেন না। কিন্তু যদি মৈথুনের শঙ্কা না থাকে, তাহলে সেই ব্রহ্মচারী ছোট কন্যা শিশু, বৃদ্ধা এবং রোগিণীকে দেখতে এবং স্পর্শ করতে পারবেন। ব্রহ্মচারী যে সব

---

[১] আপ.ধর্ম ১/২/ ২২, ২৪, ২৫, জৈ. গৃ. সূ ১/১২, হি. কে. গৃ ১/১/১-২৭, ১/১/১-১৮, ১/৩/১-১৪, ১/৪/১-১৩, ১/৫/১-১৫, ১/৬/১-১১, ১/৭/১-২২, ১/৮/১-১৬, আপ. গৃ. সূ ৪/১১/১৭-২৪, বৈখা. গৃ. সূ ২/৮/৯-১৬, বার. গৃ. সূ ৬/১-৫৩, মা. গৃ. সূ ১/১/১-২৪, ১/২২/১-২১

[২] গৌ. ধর্ম. সূ ১/২/১-৩

[৩] গৌ. ধর্ম. সূ ১/২/১৩-১৪

করতে পারবেন না তার তালিকায় আছে- পাশা খেলা, নিম্নজাতির ব্যক্তিদের সেবা করা, যে বস্তু দান করা হয়নি এমন বস্তুর গ্রহণ, প্রাণীদের প্রতি হিংসা। তিনি ব্রাহ্মণকে বা অন্য কাউকে অশ্লীল বাক্য বলবেন না। আবার তিনি কখনওই মদ্যপান করবেন না।[১]

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে ব্রহ্মচারীর কর্তব্যকর্ম বিষয়ে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে- "ব্রহ্মচারী এতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ।"[২] *অথর্ববেদের* এই মন্ত্রে 'দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ' থেকে একথাও মনে করা হয় যে, তখনকার দিনে দীর্ঘশ্মশ্রুর উদ্গম হলে অর্থাৎ বেশি বয়সেও মানুষের উপনয়নসংস্কার হত।

গোপথব্রাহ্মণেও একথা উল্লিখিত হয়েছে যে উপনয়নে দীক্ষিত হয়ে ব্রহ্মচারীরূপে গুরুগৃহে বাসকালে প্রতিদিন উপনীত ব্যক্তিকে আগুনে আহুতি দেওয়ার জন্য সমিধ সংগ্রহ এবং ভিক্ষা করতে হবে। ব্রহ্মচারী পর পর সাতদিন যদি এই কাজ না করেন, তাহলে তাঁকে আবার উপনয়ন সংস্কারের মধ্য দিয়ে পবিত্র হতে হবে। ব্রহ্মচারী কোনও খাট প্রভৃতি উন্নত শয্যায় শয়ন করবেন না, নাচ-গানের অনুশীলন থেকে নিবৃত্ত থাকবেন, বিনা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াবেন না, যেখানে সেখানে থুতু ফেলবেন না এবং শ্মশানে যাবেন না।[৩]

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বিদ্যাগ্রহণের জন্য বাস করার সময় ইন্দ্রিয়সংযমন-পূর্বক নিজের তপস্যাজনিত অদৃষ্টবৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ অধ্যয়নবিধির অনুষ্ঠান থেকে যে আত্মসংস্কার হয় তার জন্য যে নিয়মগুলোর কথা বলা হয়েছে তা পালন করবেন। প্রতিদিন স্নান করে শুদ্ধ হয়ে দেবতা, ঋষি এবং পিতৃপুরুষদের তর্পণ করবেন, দেবতাদের

---

[১] গৌ. ধর্ম. সূ ১/২/১৭-২৫, বৌ.ধর্ম. সূ ১/১/২১-৪০

[২] অ.বে ১১.৩.১.৬

[৩] গো.ব্রা পূর্বভাগ ২.৭

অর্চনা করবেন এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সমিধ দ্বারা হোম করবেন। ব্রহ্মচারী মধু (মৌমাছি থেকে যা পাওয়া যায় এবং মদ), মাংস, গন্ধ (অত্যন্ত সৌরভপূর্ণ কর্পূর, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি এবং ঘি, দারু প্রভৃতি যে সব পদার্থের গন্ধ চিত্তে উন্মাদনা সৃষ্টি করে না, সেগুলোর গন্ধ নিষিদ্ধ নয়), মালা, গুড় প্রভৃতি রসপদার্থ, স্ত্রী-সংসর্গ, শুক্ত (যে সব বস্তু স্বাভাবিক মধুর, কিন্তু কারণবশত অম্ল। যথা- দই প্রভৃতি) এবং প্রাণিহিংসা ব্রহ্মচারীর নিষিদ্ধ কর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়। ব্রহ্মচারী অভ্যঙ্গ রূপে (মাথায় এমন ভাবে তেল দেবেন না যে তেল সর্বাঙ্গে লেগে যায়) তেল ব্যবহার করবেন না, চোখে কাজল দেবেন না, চর্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করবেন না, বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ, লোভ পরিত্যাগ করবেন এবং নাচ, গান, বাজনা বর্জন করবেন। পাশা প্রভৃতি খেলা, জনবাদ অর্থাৎ লোকের সাথে বাক্‌কলহ, পরিবাদ অর্থাৎ অসূয়াবশত পরের দোষ উদ্‌ঘাটন, অণৃত অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা, অসৎ অভিপ্রায়ে স্ত্রীদের অবলোকন ও আলিঙ্গন করা এবং পরের অপকার করা- এগুলি সমস্তই ব্রহ্মচারীর বর্জনীয়। শ্রাদ্ধে ভক্ষণ, কৃত্রিম লবণ ভোজন- এগুলোও ব্রহ্মচারীর বর্জনীয় কর্ম।[১] ব্রহ্মচারী সবসময় একাকী শয়ন করবেন। ইচ্ছাপূর্বক কখনও রেতঃপাত করবেন না, কারণ স্বেচ্ছায় শুক্রস্খলন করলে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যব্রত নষ্ট হয়ে যায়। ব্রহ্মচারী যদি অনিচ্ছাবশতঃ স্বপ্নাবস্থায় রেতঃস্খলন করেন, তাহলে তিনি স্নান করে গন্ধ পুষ্পাদির দ্বারা সূর্যদেবের অর্চনা করে "পুনর্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং পুন পুনর্ভগঃ। পুনরগ্নির্ধিষ্ণ্যা যথাস্থানং কল্পন্তামিত্যনামিকা।।" (বৃ.উ ৬/৪/৫)- এই মন্ত্রের দ্বারা তিনবার জপ করবেন।[২]

---

[১] মনু.সং ২/১৭৫-১৭৯, যাজ্ঞ. সং আচারাধ্যায় ২/৩৩, বিষ্ণু.সং ২৮/১০-১৩

[২] মনু.সং ২/১৮০-১৮১

ব্রহ্মচারী কলসীপূর্ণ জল, ফুল, গোবর, মৃত্তিকা ও কুশ- এগুলি যে যে পরিমাণ হলে আচার্যের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই সমস্ত কিছুই সংগ্রহ করবেন এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করবেন।[১] গুরুর অনুমতি অনুসারে বা অনুমতি ব্যতীতই ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বেদাধ্যয়নে ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্নবিধান করবেন। ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং মনোবৃত্তি সংযত করে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকবেন। গুরুর অনুমতি ছাড়া উপবেশন করবেন না।[২] গুরু যে রকম ভোজন গ্রহণ করবেন ও বসন-ভূষণাদি ব্যবহার করবেন, শিষ্য তার তুলনায় নিম্নমানের ভোজন গ্রহণ করবেন এবং বসন-ভূষণাদি ব্যবহার করবেন। গুরু শয্যাত্যাগ করার আগেই ব্রহ্মচারী শয্যাত্যাগ করবেন এবং গুরু শয়ন করার পরেই ব্রহ্মচারী শয়ন করবেন। গুরু যখন শিষ্যকে আহ্বান করবেন বা কোনও আদেশ করবেন, তখন শিষ্য তা পালন করবেন। গুরুর সঙ্গে কথোপকথন বসে, শুয়ে, ভোজনরত অবস্থায়, নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় অথবা পিছন ফিরে থাকা অবস্থায় করবেন না।[৩] যে স্থানে গুরুর পরিবাদ অর্থাৎ বিদ্যমান দোষের উদ্‌ঘাটন এবং নিন্দা অর্থাৎ অবিদ্যমান দোষের আরোপ বিষয়ক আলোচনা চলতে থাকে, শিষ্য সেখানে থাকলে হস্তাদির দ্বারা নিজের কান দুটি আচ্ছাদন করবেন অথবা সেখান থেকে অন্যস্থানে গমন করবেন।[৪] শিষ্য গোশকটে, অশ্বযানে, উষ্ট্রযানে, প্রাসাদের উপরিস্থিত আসনে, তৃণসঞ্চয়ের উপর বা

---

[১] মনু.সং ২/১৮২

[২] মনু.সং ২/১৯২

[৩] মনু. সং ২/১৯৪-১৯৫

[৪] মনু.সং ২/২০০

তৃণাদিনির্মিত আসনে এবং নৌকায় গুরুর সঙ্গে উপবেশন করতে পারেন।[১] বিদ্যা ও তপস্যায় যাঁরা বড়- এমন ব্যক্তিগণের প্রতি, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুপুত্রের প্রতি এবং গুরুর পিতৃব্য প্রভৃতি জ্ঞাতিদের প্রতি সর্বদা গুরুর মতো আচরণ করবেন। গুরুপুত্র যদি কোনও বেদাংশ অধ্যাপন করেন অথচ তিনি ব্রহ্মচারীর থেকে বয়সে ছোট হন বা সমবয়সী হন বা যদি যজ্ঞকর্মে ব্রহ্মচারীর শিষ্য হন, তাহলে সেই গুরুপুত্রকে ব্রহ্মচারী গুরুর মতো সম্মান করবেন।[২]

দিনের বেলায় এবং সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মচারী কানে ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ধারণ করে দিনে উত্তর দিকে মুখ করে এবং রাত্রিতে দক্ষিণ দিকে মুখ করে মল-মূত্র ত্যাগ করবেন।[৩] তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান করার সময় "আপো হি ষ্ঠা ময়োভূবস্তা ন ঊর্ধ্বে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে।।" (ঋ. বে ১০/৯)- এই মন্ত্রের দ্বারা জলদেবতাকে উদ্দেশ্য করে স্নান করবেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যে নটি মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মচারী মার্জন করবেন, প্রাণসংযম, সূর্যের উপস্থাপন এবং গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করবেন।[৪] ব্রহ্মচারী প্রাতঃকালে পূর্বাভিমুখ হয়ে বসে প্রাণায়াম করবেন। তখন তিনি তৃচ মন্ত্র অর্থাৎ "আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবন্তা ন ঊর্ধ্বে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে।। "যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়েতেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ।। এবং তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ।। " (ঋ. বে ১০/৯/১-৩)- এই তিনটি মন্ত্র দ্বারা জল মাথায় ছিটিয়ে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করবেন। সন্ধ্যায় এই একই মন্ত্রের দ্বারা নক্ষত্রের উদয়

---

[১] মনু.সং ২/২০৪

[২] মনু.সং ২/২০৮

[৩] যাজ্ঞ. সং আচারাধ্যায় ২/১৬

[৪] যাজ্ঞ. সং আচারাধ্যায় ২/২২

না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখ হয়ে উপবেশন করে প্রাণায়াম করবেন। তারপর দুটি সন্ধ্যাতেই (অহোরাত্রের সন্ধিকে সন্ধ্যা বলা হয়) অগ্নিকার্য অর্থাৎ অগ্নিহোত্র করবেন।[১] *বিষ্ণু সংহিতায়* বলা হয়েছে যে মাতা, পিতা এবং আচার্য- এই তিনজন হলেন মহাগুরু, তাই তাঁদের সর্বদা সেবা করা উচিত। তাঁদের যাতে ভালো হয়, সেইরকম আচরণ করাই কর্তব্য। তাঁদের অনুজ্ঞা ছাড়া কোনও কাজ করা যাবে না, কারণ তাঁরাই হলেন তিন বেদ, সৃষ্টিকর্তারূপ তিন দেবতা, তিন অগ্নির সমতুল্য। এঁদের সেবা করলে ব্রহ্মচারী দেবলোক এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হবেন।[২] রাজা, ঋত্বিক্, শ্রোত্রিয়, অধর্ম নিষেধক, উপাধ্যায়, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং তাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধকারী স্ত্রীকে আচার্যা এবং আচার্যপত্নীরূপে মান্য করবেন। ব্রহ্মচারী হীনবর্ণা গুরুপত্নীদের অভিবাদন দূর থেকে করবেন, পাদস্পর্শ করবেন না। পরস্ত্রী অপরিচিত হলেও তাঁকে ভগিনী, কন্যা বা মাতা বলে সম্বোধন করতে হবে।[৩]

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় উপনীত হয়ে গুরুকুলে বাস করবেন এবং কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা গুরুকুলের মঙ্গল করবেন এবং গুরুর জলকুম্ভাহরণ, কাষ্ঠাহরণ ও ভিক্ষার মাধ্যমে গুরুর খাদ্যাহরণ করবেন। ব্রহ্মচারী বিধি অনুসারে বেদাধ্যয়ন করবেন। ব্রহ্মচারী আহার্য বস্তু লাভের নিমিত্ত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ভিক্ষাচরণ করবেন। ব্রহ্মচারী স্নানরূপ আচমনের পরে কখনও দন্তধাবন করবেন না।[৪] সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হস্তী এবং অশ্বে আরোহণ পরিত্যাগ করবেন। প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচারী নিয়মানুসারে সন্ধ্যা ঘোষণা করবেন, সন্ধ্যাকর্ম সমাপন হলে

---

[১] যাজ্ঞ. সং আচারাধ্যায় ২/২৫

[২] বিষ্ণু. সং ৩১ অধ্যায়

[৩] বিষ্ণু. সং ৩২/১-৩,৫,৭

[৪] হা. সং ৩/২,৭

গুরুর পাদদ্বয়ের অভিবাদন করে ভক্তিসহকারে পিতা এবং মাতার বন্দনা করবেন।[১] *সংবর্ত সংহিতাতে* বলা হয়েছে, ব্রহ্মচারী সমাহিতচিত্তে দণ্ডায়মান হয়ে প্রাতঃসন্ধ্যাকালীন গায়ত্রী জপ করবেন এবং নিরালক্ষ্য হয়ে উপবেশনপূর্বক শয়নকালীন গায়ত্রী জপ করবেন। উপাসনার পর প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে বুদ্ধিমান ব্রহ্মচারী হোমকার্য সম্পন্ন করবেন। এরপর গুরুদেবের মুখ নিরীক্ষণ করে বেদ অধ্যায়ন করবেন। ব্রহ্মচারী সর্বপ্রথম প্রণব উচ্চারণ করে তারপর ব্যাহৃতিত্রয় এবং তদনন্তর আনুপূর্বিক ত্রিপদা গায়ত্রী পাঠ করে বেদপাঠ আরম্ভ করবেন। জানুদ্বয়ের উপর হস্তদ্বয় রেখে সুসংযত ও অনন্যমতি হয়ে গুরুদেবের অনুমতি অনুসারে ব্রহ্মচারী বেদপাঠ করবেন।[২] দ্বিজগণের দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে- এই দুই সময়ে দুইবার মাত্র ভোজন করার কথা বেদে নির্দিষ্ট হয়েছে। দ্বিজগণ ভোজনের পূর্বে আচমন করবেন এবং ভোজনান্তে আচমন করবেন। আচমন না করে ভোজন করলে তাঁকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একশো আট বার গায়ত্রী জপ করে শুদ্ধ হতে হবে।[৩] *ব্যাস সংহিতা, শঙ্খ সংহিতা* এবং *গৌতম সংহিতাতে* উপনয়ন এবং ব্রহ্মচারীর কর্তব্যকর্ম নিয়ে কোনও পৃথক্ মতামত প্রকাশ করা হয়নি।

৩.১৬ কন্যার উপনয়নসংস্কার:

কন্যার উপনয়ন বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে নানা রকম মতবাদ আলোচিত হয়। উপনয়ন সংস্কারের শাস্ত্রীয় বর্ণনার কালানুসারী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নারীর উপনয়নের দ্বারা সংস্কৃত হওয়ার ব্যাপারটি সকল সময় সমান গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হতে দেখা যায় না।

---

[১] হা. সং ৩/৯-১০

[২] সংব. সং ৫-১০

[৩] সংব. সং ১২-১৪

সংস্কারপ্রকাশ গ্রন্থে স্মৃতিকার যম বলেন যে পুরাকালে (এটি অর্থবাদ মাত্র) কুমারীদের মৌঞ্জীবন্ধন (অর্থাৎ উপনয়ন) হত, তাঁদের বেদপাঠ শিক্ষা দেওয়া হত এবং সাবিত্রী (গায়ত্রী) মন্ত্র উচ্চারণের পদ্ধতি শেখানো হত। কুমারীগণ তাঁদের পিতা, পিতৃব্য বা ভ্রাতার কাছ থেকে সাবিত্রীপাঠ শিখতেন, কিন্তু কোনও অপিরিচিত ব্যক্তির কাছে বেদাধ্যয়ন করতেন না। কুমারীরা উপনীতা হয়ে কেবলমাত্র নিজের বাড়ির লোকজনের কাছ থেকেই ভিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং তাঁরা ব্রহ্মচারীর পরিধেয় মৃগচর্ম বা বল্কল পরিধান এবং জটাধারণে অধিকারী ছিলেন না।[১]

অথর্ববেদে কন্যার উপনীত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখান থেকে স্পষ্টভাবেই জানা যায়- কন্যা বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে কিছুকাল কাটিয়ে যৌবনে মনোমত পতিকে বরণ করতেন।[২]

গোভিল গৃহ্যসূত্রে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত যজ্ঞোপবীতধারিণী কন্যাকে বিবাহমণ্ডপে আনয়নের প্রথা ছিল। এই গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে, যজ্ঞোপবীত ধারণ করে এবং নতুন কাপড়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করে বধূ বিবাহের আসরে বরের দিকে এগিয়ে যাবেন।[৩] গোভিলের এই মন্তব্য থেকে মনে করা হয়, তাঁর সময়ে মেয়েদের উপনয়ন সংস্কার ও উপবীত ধারণের রীতি প্রচলিত ছিল।

---

[১] সং. প্র পৃ.৪০৩

[২] ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। অ. বে ১১/২৪/১৮

[৩] গো.গৃ ২/১/১৯

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কার। বিবাহ সংস্কারের দ্বারাই স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কার সিদ্ধ হয়। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা যে তাঁদের পতিদের সেবা করেন, তা-ই হল তাঁদের গুরুগৃহে বাসস্বরূপ। স্বামীর গৃহস্থালীর কাজই হল স্ত্রীলোকের পক্ষে গুরুগৃহে অগ্নিপরিচর্যার সমতুল্য।[১]

পরবর্তী কালে দেখা গেছে কখনও কন্যার উপনয়ন প্রক্রিয়াকে স্বীকার করা হয়েছে, কখনও বা এই অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মনে হয়, সামাজিক ও পারিবারিক দায়বদ্ধতার কারণেই নারীদের পক্ষে বেশিদিন ব্রহ্মচর্যাদি নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা সম্ভবপর ছিল না। অনুমান করা যেতে পারে নারীর পক্ষে উপনয়ন সংস্কার তাঁর বা তাঁর অভিভাবকের ইচ্ছাধীন ছিল। যে সব নারী কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতে পারবেন বলে মনে করতেন, তাঁরাই উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হতেন। তখন থেকে ব্রহ্মচর্যের কঠোর পরিশ্রম সহ্য করার সামর্থ্য বা সময়াভাব দেখা দিতে আরম্ভ হতে শুরু হয়েছিল। কেউ জোর করে এই সংস্কার পালন থেকে নারীদের বঞ্চিত করেছে বলে মনে হয় না।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় আলোচিত শ্রী নির্ম্মলা দেবীর "সেকালের শিক্ষায়"(প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, খণ্ড সংখ্যা ১.১, বর্ষ সংখ্যা ১৪.১, পৃষ্ঠা৬৪-৬৮) নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে নারীশিক্ষা হল সময়ের নিয়মে শ্বশুরালয়ে গিয়ে পরের মন যোগানো, বংশের সুনাম রক্ষা করা, নিজের প্রশংসা অর্জন করা এবং গুরুজনদের সমীহ করে চলা। এক

[১] বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবগুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া।। (মনু. সং ২/৬৭)

কথায় নারীশিক্ষা হল শ্বশুরালয়ে গিয়ে সকলের অনুমতিক্রমে বিনয়ী, নম্র, সভ্য হয়ে থাকা এবং দ্বন্দ্বহীন হয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকের আদেশ পালন করা।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্তের "স্ত্রীশিক্ষার কথা" (প্রকাশকাল : জৈষ্ঠ্য, ১৩২২, খণ্ড সংখ্যা ২.৬, বর্ষ সংখ্যা ২.২, পৃষ্ঠা ১০৪২-৪৮) প্রবন্ধে বেদবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথার উল্লেখ আছে। তিনি বলেন যে "পুরাকালে যখন ছাপাখানা ছিল না, এমনকী লিপির আবিষ্কারও হয় ত হয় নাই, যখন বেদবিদ্যা আচার্যদের মুখে মুখে থাকিত এবং মুখে মুখেই তাহা পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হৈত, তখন বেদের মন্ত্রে এবং ব্রাহ্মণে যে বিপুলায়ন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাকে অবিকৃত রাখাই প্রাচীন আর্য্যদের একান্ত চেষ্টার বিষয় হইয়াছিল। কারণ ইহা 'revealed scriptures'- ইহার একবর্ণ নষ্ট বা বিকৃত হৈঅতে দেওয়া চলিবে না। এই জন্য প্রত্যেক দ্বিজ বালককে অন্তত কিছু দিনের জন্য আচার্য্যের বাড়ীতে গিয়া, শিক্ষালাভ করিতে হইত। গুরুগৃহে অবস্থান ব্যতীত বেদাভ্যাস সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু বালিকার পক্ষে অধিক বয়স পর্য্যন্ত থাকিয়া বেদ-অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। খুব সম্ভব, এই কারণেই স্ত্রীজাতি কালক্রমে বেদের ভাষা ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়াছে। বেদের ভাষা অবিকৃত না থাকিলে, বেদ-অধ্যয়নে কোন ফল নাই, ইহাই তাহাদের ধারণা ছিলই যে সঙ্কোচ এবং সঙ্কীর্ণতা, তাহা কেবল বেদের ভাষার পক্ষেই। এই ভাষাটা অনুপনীত স্ত্রী-জাতি এবং অনুপনীত শূদ্র জাতির নিকট হইতে যথাসম্ভব গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বেদের তাৎপর্য্য কাহারও নিকট গোপন করা হয় নাই। বস্তুতঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট – বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি ও শূদ্র জাতির নিকট – তাহাদের বোধ্য-ভাষায় বহুলভাবে বেদবিদ্যা প্রাচারের জন্যই স্মৃতি শাস্ত্রের এবং বিশেষতঃ পুরাণেতিহাসের রচনা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা- কল্প – ব্যাকরণ –

জ্যোতিষাদি সমুদায় বেদাঙ্গ কপিশাদি – প্রণীত দর্শনশাস্ত্র, মন্বাদি প্রণীত সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ-মহাভারতাদি সমুদায় কাব্য ও ইতিহাস এবং যাবতীয় পুরাণ, উপপুরাণ, ঐ স্মৃতিসাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। এ সমুদায়ই বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সমস্তটাই প্রচার করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। সুতরাং স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার নাই – ইহার অর্থ এইমাত্র যে, বেদের ভাষার তাহার অধিকার নাই, বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অধিকার নাই বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।"

৩.১৭ শূদ্রের উপনয়নসংস্কার:

শাস্ত্রমতে সংস্কারের অধিকারী কেবল যে সব মানুষ দ্বিজপদবাচ্য তাঁরাই, আপামর জনসাধারণ নন। দ্বিজ বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বোঝানো হয়। কোনও গৃহ্যসূত্রে শূদ্রদের উপনয়ন সংস্কার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তার থেকে মনে করা যেতে পারে, সেই সময় শূদ্রদের উপনয়ন সংস্কার হত না।

ডঃ হরগোপাল বিশ্বাসের *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় লিখিত "বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ও পল্লীর উপর তার প্রতিক্রিয়া"(প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৩৫৯, খণ্ড সংখ্যা ১.১, বর্ষ সংখ্যা ৪০.১, পৃষ্ঠা ১৯-২০) এই প্রবন্ধে পল্লীসমাজে শিক্ষার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় গ্রামের মাহিষ্য ও সদ্‌গোপ শ্রেণীর লোকেরাই প্রধানতঃ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতা করতেন। বাড়ির কাজকর্ম ক্ষেত খামার দেখাশুনার মধ্যেই তাঁরা নামমাত্র বেতন নিয়ে গ্রামের ছেলেদের লেখাপড়া শিখাতেন। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে যে সব উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে সেখানেও শিক্ষকতাকর্মে এই সব শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত যুবকদেরই নিযুক্ত হয়ে দেখা যায়। শিক্ষার্থী হিসেবে দেখা যেত কেবলমাত্র শিক্ষিত ও বিত্তশালী পরিবারের ছেলেমেয়েদের। ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বড়

চাকুরী করে স্বচ্ছল জীবন যাপন করতেন। সুতরাং বলা যায় যে আধুনিক সমাজে অর্থাৎ পরাধীন ভারতবর্ষেও বঙ্গ সমাজব্যবস্থায় কেবলমাত্র শিক্ষার আঙিনায় আসার অধিকার কেবল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরই ছিল।

৩.১৮ আধুনিক যুগে উপনয়নসংস্কারের উত্তরাধিকার:

বর্তমান যুগে বঙ্গজীবনে উপনয়ন সংস্কারের প্রচলন বিবর্তিত ও সংক্ষিপ্তরূপে হলেও পরিলক্ষিত হয়। সমাজজীবন ছাড়া মুষ্টিমেয় আধুনিক গুরুকুলেও এর প্রচলন দেখা যায়। গুরুকুলে এখনও পরম্পরার অঙ্গ হিসেবে এই সংস্কারকে মান্যতা দেওয়া হয় এবং ব্রহ্মচর্যের যা নিয়মশৃঙ্খলা আছে সেগুলি শিষ্যকে অবগত করানো হয়। তবে শিষ্য সেই নিয়মগুলিকে কতটা মান্যতা দেয় সেই বিষয়টি অজানা। আধুনিক যুগে পশ্চিমবঙ্গে গুরুকুল ব্যতীত সাধারণ পরিবারে শুধুমাত্র জাতি বা বর্ণ ঘোষণা ছাড়া উপনয়ন সংস্কারের অন্য কোনও প্রাসঙ্গিকতা দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত সম্প্রদায়ের যাঁরা ক্ষত্রিয় (সিংহ পদবীর অধিকারী) তাঁদের উপনয়ন সংস্কার বর্তমানেও প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণসন্তান অন্ততপক্ষে এই সংস্কারের মাধ্যমে গায়ত্রী জপ অভ্যাস করবেন এটাই পরম প্রাপ্তি। আমাদের রাজ্যে বৈশ্য বর্ণের মধ্যে এই সংস্কারের প্রথা অবলুপ্ত হয়ে গেছে, কারণ হিসেবে মনে করা হয় যে এই বর্ণের মানুষেরা তাঁদের কাজের সঙ্গে এই উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গতি রাখতে না পারার জন্যই সম্ভবত যজ্ঞোপবীত নিয়মিত ধারণ করে থাকার ব্যাপারে উৎসাহহীন হয়ে পড়েছেন।

বর্তমানে উপনয়ন সংস্কারের সব নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানা না হয় না অর্থাৎ এই সংস্কার পালনের নিয়মের শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান যুগে পশ্চিমবঙ্গে নৈষ্ঠিক এবং উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীর এই দুই ভেদ বিদ্যমান আছে কি না সেই বিষয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কারও

কারও মতে এই ভেদ বিদ্যমান আছে, আবার কেউ কেউ বলছেন এই ভেদ বিদ্যমান নেই। শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদের মতে, ব্রহ্মচারীর কোনও ভেদই বর্তমানে বিদ্যমান নেই। কিন্তু শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়ের সদস্যদের মতে এই ভেদ বর্তমানে বিদ্যমান আছে। উপনয়ন সংস্কার দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বর্তমান কালের পুরোহিতরা সংস্কারের অনেক নিয়মেরই সংক্ষিপ্তকরণ করেছেন। আধুনিক যুগে জন্ম থেকে সাত বছর তিন মাস অতিক্রম করলে পনেরো বছর তিন মাসের মধ্যে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হতে হয়। বয়সের সময় সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে ব্রাত্যস্তোম বিধি পালন করতে হয়। ব্রাত্য বালকের মস্তকমুণ্ডন করে পুরোহিতকে যৎসামান্য অর্থ দান করে প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র পাঠ করে তারপর উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করতে হয়।

বর্তমানে উপনয়ন সংস্কারে পরিধেয় উপকরণ প্রভৃতিরও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য হয়েছে। আধুনিক কালে উপনয়নে ব্যবহৃত উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই হয়তো এই পরিবর্তন বাধ্যতামূলক হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার সচেতনতার ফলে অকারণে বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া পশুবধ নিষিদ্ধ। তাই উপনয়নের মতো সংস্কারের জন্য হরিণ বা বাঘের চামড়া দুষ্প্রাপ্য এবং এগুলো সংগ্রহ করা একেবারেই দুঃসাধ্য। বর্তমানে উপনয়নের উপকরণের তালিকায় গেরুয়া বা সাদা পট্টবস্ত্র, মাথাসমান দীর্ঘ বেল বা পলাশ বা বাঁশের দণ্ড, যজ্ঞসূত্র প্রভৃতির সংগ্রহের বিধান দেওয়া হয়ে থাকে। উপনয়নের দিনই এই দণ্ডটি ভেঙে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানেও বৈদিক যুগের ন্যায় উপনয়নের দিনই মস্তক মুণ্ডন বাধ্যতামূলক। আধুনিক যুগে গুরুকুলে বটুকদের এখনও শিখা সহিত মুণ্ডন বাধ্যতামূলক, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের গৃহে শিখা সহিত মুণ্ডন বাধ্যতামূলক নয়। বৈদিক যুগের ন্যায় বর্তমান যুগেও যজ্ঞোপবীত সাধারণত কুলপুরোহিত অথবা কোনও সদ্‌ব্রাহ্মণ তৈরি

করেন। তবে এখানে কোনও সধবা ব্রাহ্মণী এই যজ্ঞোপবীত তৈরি করতে পারবেন কি না সেই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট মত পাওয়া যায় না। তবে পূর্বকালের ন্যায় বর্তমানকালেও যজ্ঞোপবীতটি কার্পাস সূত্রেরই হয়। পূর্বের ন্যায় যজ্ঞোপবীতের তিনটি ভাগ বর্তমানেও বিদ্যমান। পিতৃতর্পণ এবং শ্রাদ্ধের সময় প্রাচীনাবীতী ধারণ করতে হয়। পূজার সময় উপবীতী এবং দেবতর্পণের সময় নিবীতী ধারণ করতে হয়। মৃতাশৌচ হলে এবং যজ্ঞোপবীত কোনও কারণে অপবিত্র হলে বা জীর্ণ হলে পুরনো যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করে নতুন যজ্ঞোপবীতে চন্দনলেপন করে এবং শালগ্রাম শিলার স্পর্শ দিয়ে পবিত্র করে জীর্ণ এবং পুরনো যজ্ঞোপবীতটি ত্যাগ করে নতুন যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হয়।

এযুগেও আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী থেকে কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী এই সময়টি বাদ দিয়ে (অর্থাৎ বর্ষার চারটি মাস বাদ দিয়ে) এবং জন্মমাস ছাড়া বাকি সময়ে, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ- এই মাসগুলিতে উপনয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। এককথায় বলা হয় যে শীত, গ্রীষ্ম এবং বসন্ত ঋতুতে শুক্লপক্ষের উত্তরায়ণে উপনয়ন সংস্কার করা হয়ে থাকে।

গুরুকুল এবং সাধারণ গৃহস্থের ঘরে উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারীকে তিন দিন অথবা পরিবারের মতানুযায়ী তিন দিনের কম সময় দণ্ডী গৃহে সূর্যদর্শন ব্যতীত এক বার চরু ভক্ষণ করে বা ঘ্রাণ নিয়ে, ফল-মূলাদি ভক্ষণ করে, অগ্নিপক্ক জিনিস ভক্ষণ না করে ক্ষার লবণহীন খাদ্য ভক্ষণ করে দিনযাপন করতে হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে বর্তমানে এই দিনসংখ্যা পরিবারের বা গুরুকুলের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করে, সকল সময় শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। বর্তমানে কন্যার উপনয়নের কোনও প্রথা প্রচলিত নেই এই রাজ্যে।

উপনয়ন সংস্কারের দিন পুরোহিত বা গুরু বটুককে উপাংশু স্বরে কর্ণের নিকটে গায়ত্রী মন্ত্র শুনিয়ে যজ্ঞডুমুর বা যে কোনও একটি কাষ্ঠ দ্বারা উপনীত বালককে দিয়ে সমিধাধান করাবেন। এরপর প্রথমে মাতা তারপর পিতার নিকট থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করলে তারপর এই ভিক্ষাদ্রব্য গুরু বা পুরোহিত নিয়ম রক্ষার্থে স্পর্শ করেন। বৈদিক যুগের ন্যায় ভিক্ষাদ্রব্য গুরু বা পুরোহিত গ্রহণ করেন না। কর্ণবেধকে উপনয়নের অঙ্গ হিসেবে যাঁরা স্বীকার করেন, উপনয়নের দিন তাঁদের সূচ অথবা সজারুর কাঁটা দিয়ে কর্ণবেধ সংস্কার করানো হয়। তবে পূর্বের ন্যায় স্বর্ণসূচ এখন ব্যবহার করা হয় না। উপনয়নের দক্ষিণা হিসেবে গুরু বা পুরোহিতকে বর্তমানে অর্থ অথবা হরীতকী প্রদান করা হয়। ব্রহ্মচারীদের কর্তব্যকর্ম বর্তমানে যেগুলি পালন করার কথা বলা হয় বা ব্রহ্মচারীদের মানতে হয় সেগুলি হল- একাদশী পালন করা, খাদ্যগ্রহণকালে মৌন অবলম্বন করা, সন্ধ্যাহ্নিক ও গায়ত্রীজপ করা, দিবানিদ্রা বর্জন করা, একদিনে একবার অন্ন গ্রহণ করা।

বর্তমান কালের প্রথায় বৈদিক যুগের ন্যায় উপনয়নের পরেই শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ বর্তমানে গুরুকুল ব্যবস্থার মাধ্যমে পঠনপাঠন বাধ্যতামূলক নয়। হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের পর থেকেই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একজন শিশুকে অতি অল্প বয়সেই অর্থাৎ দুই থেকে আড়াই বছর বয়সে শিক্ষার আঙিনায় আনা হয়।

বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার গুণাবলীর মধ্যে প্রথম গুণটি হল শিক্ষার ব্যাপকতা। স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও বর্ধিতকরণ, জ্ঞানের বিকাশ, সামাজিক কর্তব্যের পালন, সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ, নৈতিক চরিত্রের বিকাশ, আধ্যাত্মিক বিকাশ- এই সব কিছুই বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈদিক যুগে প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের উপর

জোর দেওয়া হত। পরা এবং অপরা উভয় ধরণের বিষয়ই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুরুকুল শিক্ষায় সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন এবং নীতিশাস্ত্রের শিক্ষার উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছিল এবং এগুলি ছিল বাধ্যতামূলক বিষয়। বৈদিক যুগে গুরুকুলগুলি দূষণমুক্ত বনের শান্ত ও নির্মল পরিবেশে অবস্থিত ছিল। বর্তমান স্কুলগুলিকে দূষণমুক্ত জায়গায় অবস্থিত করা উচিত যেখানে চারপাশে সবুজ রয়েছে।

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার অবদান অনস্বীকার্য। বৈদিক যুগে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর। অসংখ্য ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র, গুরুকুল এবং সংস্কৃত বিদ্যালয় এখনও বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। যদিও এদের প্রকৃতি ও রূপ বৈদিক যুগের ঋষি আশ্রম এবং গুরুকুল থেকে একেবারেই আলাদা, কিন্তু এদের মৌলিক ভিত্তি একই। আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে বৈদিক শিক্ষার অবদান অনেক। বৈদিক যুগে শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল বেশ বিস্তৃত। এই শিক্ষাব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই আধুনিক ভারতীয় শিক্ষায় আমরা শিল্পকলা, দক্ষতা ও কৌশলকে স্থান দিয়েছি। পার্থক্য শুধু এই যে- বৈদিক যুগে ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে গণিত, ভাষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালাভ মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের একটি বড় উপকরণ, আর এই বিদ্যারম্ভের সূচনা হত উপনয়ন সংস্কারের মধ্যে দিয়ে। মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন যে প্রকৃত শিক্ষা তারই মূল আধার উপনয়নসংস্কার। সুখভোগের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত বিদ্যালাভ হয় না। অর্থাৎ একজন বিদ্যার্থী একই সময় বিদ্যা এবং সুখ এই দুটি ভোগ করতে পারে না।

অল্প বয়সে গুরুগৃহে থেকে বিদ্যা অর্জন ও কৃচ্ছ্রসাধন ভবিষ্যতের মানুষকে স্বচ্ছ বুদ্ধি, স্বচ্ছ চিন্তা, সুস্থ ও সবল শরীর দানের মাধ্যমে দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী ও নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করত। উপনয়নের সময় দণ্ড ও বস্ত্র ধারণ, ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি যে অনুষ্ঠানের বিধান আছে তার দ্বারা বিদ্যালাভের জন্য যে কষ্ট স্বীকার অপরিহার্য, সে কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপনয়ন সংস্কারে প্রযুক্ত বিধিগুলি থেকে বোঝা যায়, আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি, তাঁরা উপনয়ন সংস্কারের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে সকল শিক্ষার্থীই যেন সামাজিক ও ব্যাবহারিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হন, তাঁরা যেন জীবনের আরম্ভ থেকেই কর্মে নিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা, সদাচার, বাক্‌সংযম প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আয়ত্ত করে। তবে দুঃখের বিষয় হল বর্তমান আধুনিক সমাজে ব্রহ্মচর্য-ব্যবস্থা না থাকার কারণে কঠোর নিয়ম পালনের কোনও অবকাশ নেই। তাই বর্তমান যুগে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক সেটি কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রাচীনকালে শত শত বালককে প্রথিতযশা গুরু এবং আচার্যবৃন্দ অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং শিষ্যরাও তাঁদেরকে যোগ্য সম্মানও দিয়েছেন। গুরু বা আচার্যের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক এবং গুরু বা আচার্যের অবস্থান বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ যে সমস্ত আলোচনা করেছেন, তা থেকে সেই সময় সমাজে শিক্ষকদের অপরিসীম মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই সমস্ত ছাত্র শিক্ষকের কথা আজও আমরা স্মরণ করি। তবে বর্তমান যুগে গুরু শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক আগের মতো নেই। এখনকার গুরু শিষ্য সম্পর্ক কিঞ্চিৎ হলেও অধোগতি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই বর্তমান যুগে বিদ্যাচর্চা বা শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন প্রাচীন কাল থেকে অনেক বেশি যে অগ্রসর হতে পেরেছে সে কথা বলা যায় না।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল অনেকদিন আগে, এখনকার যন্ত্রযুগে সেগুলোর অনেকাংশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত গুরুর অভাব এবং উপযুক্ত গুরুর অবমাননা আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ফলস্বরূপ।

চতুর্থ অধ্যায়:

বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার

৪.১ উপাকরণ বা উপাকর্ম:

উপাকরণ হল বার্ষিক পাঠ্যসূচী শুরু করার অনুষ্ঠান। উপাকরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈদিক পাঠ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন অনুষ্ঠিত হয়। যখন হস্তা বা শ্রবণা নক্ষত্রে ওষধির প্রথম উৎপত্তি হয় তখন ভাজা যব ও শষ্যের চূর্ণ দই ও ঘি এর সাথে মিশিয়ে সমস্ত বেদমন্ত্র পাঠ করে অথবা কোনও কোনও আচার্যের মতে সূক্ত বা অনুবাকগুলোর প্রথম মন্ত্রগুলো পাঠ করে যে আহুতি দেওয়া হয় তাকে উপাকরণ বলা হয়ে থাকে। [১] *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হলে শ্রাবণ মাসে শ্রবণা নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্র যুক্ত হলে অথবা শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে হস্তা নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্র যুক্ত হলে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করতে হবে।[২] গৃহ্যসূত্রকার গোভিল বলেছেন ভাদ্রমাসের যে কোন তিথিতে পূর্বাহ্নে হস্তা নক্ষত্র যুক্ত দিবসে উপাকরণ নামক কর্ম করবে হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সামবেদের কৌথুমী শাখার যারা ব্রহ্মচারী তাদের এই অনুষ্ঠানটি শ্রাবণ মাসেই হয়ে থাকে।[৩] স্মৃতিকার মনু বলেছেন যে ব্রহ্মচারী শ্রাবণমাসের পূর্ণিমাতে অথবা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে

---

[১] শা. গৃ ৪/৫/১-৩, জৈ. গৃ. সূ ১/১৪, খা. গৃ. সূ ৩/২/১৪, কা. গৃ. সূ ১/৯/১, মা. গৃ. সূ ১/৪/১, হি. গৃ. সূ ২/৮/২

[২] আ. গৃ. সূ ৩/৫/২-৩

[৩] গো. গৃ. সূ ৩/৩/১,খা. গৃ. সূ ৩/২/১৫

শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সাড়ে চার মাস একনিবিষ্ট হয়ে বেদপাঠারম্ভ অর্থাৎ উপাকর্ম নামক কর্ম করবেন। [১]*বিষ্ণুসংহিতাতে* বলা হয়েছে এরপর উপাকৃত বেদের উৎসর্গ গ্রাম বর্হিভাগে করবে, অনুপ্রাকৃতের উৎসর্গ করবে না।[২] বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করার পূর্বে আচার্য দুটি আজ্যভাগ আহুতি দেওয়ার পর সাবিত্রী, ব্রহ্মা, শ্রদ্ধা, মেধা, প্রজ্ঞা, ধারণা, সদসস্পতি, ছন্দ ও ঋষিদের উদ্দেশ্যে আজ্যাহুতি দেবেন। এরপর দধিমিশ্রিত ছাতুও আহুতি দেবেন।[৩] মাণ্ডূকেয়ের মতে বৈদিক সংহিতাভাগের অধ্যায়গুলোর প্রথম মন্ত্রগুলো দিয়ে এবং বিভিন্ন ঋষির প্রথম মন্ত্রগুলো দিয়ে আহুতি দিতে হবে। কিন্তু কৌষীতকি বলেছেন "অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।" (ঋ.বে১/১/১) এবং "কুষুম্ভকস্তদব্রবীদ্গিরেঃ প্রবর্তমানকঃ। বৃশ্চিকস্যারসং বিষমসরসং বৃশ্চিক তে বিষম্।। "(ঋ.১/১৯১/১৬), "অবদংস্ত্বং শকুনে ভদ্রমা বদ তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিং চিকিদ্ধি নঃ। যদুৎপতন্বদসি কর্করির্যগা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ।।" (ঋ.বে ২/৪৩/৩), "গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতম্। পাতং সোমমৃতাবৃধা।।" (ঋ.বে ৩/৬২/১৮), "সামন্তে বিশ্বং ভূবনমধি শ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যং তরায়ুষি। অপামনীকে সমিথে য অভৃতস্তমশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্মিম্।।" (ঋ.বে ৪/৫৮/১১)। "গন্তা নো যজ্ঞং যজ্ঞিয়াঃ সুশমি শ্রোতা হবমরক্ষ এবয়ামরুৎ । জ্যেষ্ঠাসো ন পর্বতাসো ব্যোমানি যুয়ং তস্য প্রচেতসঃ সাত দুর্ধতবো নিদঃ।।" (ঋ.বে ৫/৮৭/৯), "যো নঃ স্বো অরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাংসেতি। দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্।।" (ঋ.বে

---

[১] শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্টপদ্যাং বাঽপ্যুপাকৃত্য যথাবিধি। যুক্তশ্চছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধ পঞ্চমান্।। মনু.সং ৪/৯৫, বিষ্ণু. সং ৩০/১

[২] বিষ্ণু. সং ৩০/২

[৩] আ. গৃ. সূ ৩/৫/৪-৫, জৈ. গৃ. সূ ১/১৪

৬/৭৫/১৯), "প্রতি চক্ষবি চক্ষেন্দ্রশ্চ সোম জাগৃতম্। রক্ষেভ্যো বধমস্যতমশনিং যাতুমদ্ব্যঃ" (ঋ.বে ৭/১০৪/২৫), "আগ্নে যাহি মরুৎসখা রুদ্রেভিঃ সোমপীতয়ে। সোভর্যা উপ সুষ্টুতিং মাদয়স্ব স্বর্ণরে।।" (ঋ.বে ৮/১০৩/১৪), "যত্তে রাজঞ্ছৃতং হবিস্তেন সোমাভি রক্ষ নঃ। অরাতীবা মা নস্তারীন্মো চ নঃ কিং চনামমদিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।।" (ঋ.বে ৯/১১৪/৪) – এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে যে কোনো দুটি করে মন্ত্র এবং "তচ্ছংযোরা বৃণীমহ, গাতুং যজ্ঞপতয়ে। দৈবীঃ স্বস্তিরস্তুনাঃ স্বস্তির্মানুশেভ্যঃ ঊর্দ্ধং জিগাতু ভেষজং শন্নো অস্তু দ্বিপদে, শম চতুষ্পদে।। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।।" (ঋ. বে ১০/৯০) এই একটি মন্ত্র আহুতিকালে পাঠ করা হবে। এরপর আহুতিদ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ থেকে কিছু অংশ নিয়ে সেই যজ্ঞীয় আহার্যের অংশ "দধিক্রাবণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্রাণ আয়ুংসি তারিষৎ।।" (ঋ. বে ৪/৩৯/৬) এই মন্ত্র পাঠ করে গ্রহণ করবেন। এরপর আচমন করে উপবিষ্ট হয়ে মহাব্যাহৃতি, সাবিত্রী এবং বেদের আদি থেকে শুরু যতগুলো স্বস্তিবচন আছে সেগুলো আচার্য অনুচ্চ স্বরে বলবেন।[১] *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে আচার্য শিষ্যের সঙ্গে স্বয়ং অধ্যয়ন করবেন তখন পাঠনীয় শিষ্যগণ তাঁকে স্পর্শ করে থাকলে তিনি সবিতা প্রভৃতি নয় দেবতার উদ্দেশ্যে আজ্যহোম এবং "অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।" (ঋ.বে১/১/১) ইত্যাদি মন্ত্রে স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিকে উদ্দেশ্যে করে আহুতি দিয়ে দধিমিশ্রিত ছাতু ভক্ষণ করে তারপরে মার্জন (বেদিতে বিছানো কুশের তলায় অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাত রেখে জল ঢেলে হাত ধুয়ে নেওয়া) করবেন। এরপর আচার্য অগ্নির পশ্চিমদিকে পূর্বমুখী দর্ভসমুহ অর্থাৎ তৃণসমূহের উপর উপবেশন করে জলের পাত্রে দর্ভগুলো স্থাপন করে বেদ লাভের জন্য অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে জপ করবেন। তারপর তিনবার গায়ত্রী মন্ত্র আবৃত্তি করে বেদের

[১] শা. গৃ. সূ ৪/৫/৪-১৩, জৈ. গৃ. সূ ১/১৪

প্রারম্ভিক অংশের পাঠ আচার্য শুরু করবেন। পাঠ শেষ হলেও এই একইভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে।[১] *গোভিল গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে উপাকরণে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করে তিনটি আহুতি প্রদান করে বেদাধ্যয়ন আরম্ভর্থে যে সমস্ত ছাত্ররা উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে উপনয়নে কৃত উপদেশের ন্যায় আচার্য প্রথমে একটি পাদ, পরে অর্ধেক পাদ এবং শেষে সমস্ত ঋক্ আবৃত্তিক্রমে সাবিত্রী মন্ত্র অভ্যাস করাবেন। গায়ত্রীমন্ত্র পাঠের সঙ্গে সামগানও অভ্যাস করাবেন। যদি কোনো শিষ্য স্বল্পদিনই উপনীত হয়ে থাকে এবং সেই ব্রহ্মচারী যদি সাবিত্রী এবং সামগানে অন্যভ্যস্ত থাকেন তাহলে তাদের জন্য সাবিত্রী পাঠ এবং সামগান অত্যাবশ্যক। আচার্যকে "সোমং রাজানং"(ছং আং ১/২/৫/১)" এই ঋকটি এবং ঐ ঋক্ মূলক সামটি (গেং গাং ৩/১/১) সাবিত্রী মন্ত্রের ন্যায় ঐ ক্রমানুসারেই অভ্যাস করাতে হবে। অনন্তর ছন্দ আর্চিক গ্রন্থের পূর্ব ও উত্তর উভয় ভাগই আদ্যন্ত অথবা যাঁর যতদূর অধীত হয়েছে তারপর থেকে সবাই মিলিত হয়ে পাঠ করবে। এই ভাবে বেদ পারায়ণ সমাপ্ত হলে যথা প্রয়োজন অপর কার্যাদি করতে পারবেন।[২] বেদ পারায়ণের পরে "ধানারন্তং করম্ভিণম্" (ছং আং ৩/১/২/৭) মন্ত্র পাঠ করে অভগ্ন ভাজা যব সকলেই ভক্ষণ করবে। তদনন্তর "দধিক্রাব্ণো অকারিষম্" (ছং আং ৪/২/২/৭) মন্ত্র পাঠ করত সকলেই দধি ভক্ষণ করবে। তদনন্তর সকলেই আচমন করে যথাস্থান সুস্থভাবে উপবিষ্ট হবে। এরপরে আচার্য যে ছাত্র যতদূর অধ্যয়ন করেছে তাকে তার পর থেকে অধ্যয়ন করাতে আরম্ভ

[১] আ. গৃ. সূ ৩/৫/১০-১৩, মা. গৃ. সূ ১/৪/২-৪

[২] গো. গৃ ৩/৩/২-৫, জৈ. গৃ. সূ ৩/২/১৬-১৮, খা. গৃ. সূ ৩/২/১৬-১৮

করাবে। যে দিনে এই উপাকরণ ক্রিয়া হবে, সেদিন দধিভক্ষণ এবং আচমনের পরেই নূতন ছাত্রগণের বিশ্রাম ব্যবস্থা করবে।[১]

উপাকর্ম এবং উৎসর্গের সময় বেদাধ্যয়নে তিন দিন ও তিন রাত্রির জন্য ছেদ পরবে এবং অষ্টকাশ্রাদ্ধের সময় একদিন ও একরাত্রি এবং প্রত্যেক ঋতুর শেষ রাত্রে ছেদ পরবে।[২] *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে উপাকরণের পর কমপক্ষে ছয় মাস পাঠ বজায় রাখতে হবে. এই পাঠে কোনও ছেদ পরবে না।[৩] অফুরন্ত শক্তি, শ্রদ্ধা এবং অকাট্যতা প্রাপ্তি কামনা করে ঋষিরা তাঁদের তপস্যাবলে উপাকর্ম কর্ম আবিষ্কার করেছেন। যজন-যাজন ইত্যাদি ছটি পবিত্রকর্মের নিয়ত সম্পাদক ব্যক্তি তার সাফল্যের জন্য "উপাকর্ম" করবেন।[৪]

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে উপাকর্ম সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বিবরণ পাওয়া যায়। পঞ্চ মহাযজ্ঞের পর অধ্যয়ন উপক্রমের বিধি অনুষ্ঠিত হয়। ওষধির প্রাদুর্ভাব হলে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত শ্রাবণী পূর্ণিমার অথবা হস্তা নক্ষত্রযুক্ত শ্রাবণী পঞ্চমীতে উপাকর্ম অনুষ্ঠান করা হবে।

বেদাধ্যয়নকারী প্রথমে পঞ্চভূসংস্কারপূর্বক অগ্নিস্থাপনাদি আজ্যভাগ হোম করে পৃথিব্যাদি সকল দেবতার উদ্দেশ্যে দুটি আজ্যাহুতি দেবে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে *ঋগ্বেদ* অধ্যয়ন আরম্ভ করলে "পৃথিব্যৈ স্বাহা" ও "অগ্নয়ে স্বাহা" মন্ত্রে দুটি আহুতি দেবেন। *সামবেদ* আধ্যয়ন করলে "দিবে স্বাহা" এবং "সূর্যায় স্বাহা" মন্ত্রে দুটি আহুতি দেবেন। *যজুর্বেদ* অধ্যয়ন

---

[১] গো. গৃ. সূ ৩/৩/৬-১০, জৈ. গৃ. সূ ১/১৪, খা. গৃ. সূ ৩/২/১৯-২২

[২] শা. গৃ. সূ ৪/৫/১৭, গো. গৃ. সূ ৩/৩/১১-১২, জৈ. গৃ. সূ ১/১৪

[৩] আ. গৃ. সূ ৩/৪/১৪, জৈ. গৃ. সূ ১/১৪

[৪] শা. গৃ. সূ ৪/৫/১৪-১৬

করলে "অন্তরিক্ষায় স্বাহা" ও "বায়বে স্বাহা" মন্ত্রে দুটি আহুতি দেবেন।*অথর্ববেদ* অধ্যয়ন করলে "দিগভ্যঃ স্বাহা" এবং "চন্দ্রমসে স্বাহা" মন্ত্রে দুটো আজ্যাহুতি দেবেন। এরপর "ব্রহ্মণে স্বাহা" এবং "ছন্দ্যেভ্যঃ স্বাহা" মন্ত্রে সর্বক্ষেত্রেই অতিরিক্ত দুইটি করে আজ্যাহুতি দিতে হবে। এরপর প্রতিটি ক্ষেত্রেই "প্রজাপতয়ে স্বাহা", "দেবেভ্য স্বাহা", "ঋষিভ্যঃ স্বাহা", "শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা", "মেধায়ৈ স্বাহা", "সদসস্পতয়ে স্বাহা" এবং "অনুমতয়ে স্বাহা" মন্ত্রে সাতটি আহুতি দিতে হয়। এরপর আচার্য "সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্ । সনিং মেধা মযাশিষং স্বাহা।।" (য.সং ৩২/১৩) এই মন্ত্র পাঠ করে তিনবার অক্ষতধান্য আহুতি দেবেন। আচার্য যখন এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন তখন সমস্ত শিষ্যও সেই সঙ্গে মন্ত্রটি পাঠ করবেন।[১]

এরপর "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা " য. সং ৩/৫৫ এই সাবিত্রী পাঠ করতে করতে একটি একটি করে করে আহুতি দিয়ে আচার্যের সঙ্গে প্রত্যেক শিষ্য তিনটি করে ঘৃতাক্ত পত্রসমন্বিত উদুম্বর সমিধ অগ্নিতে আহুতি দেবে। অর্থাৎ একসঙ্গে তিনটি সমিধ আহুতি দেওয়া যাবে না, পৃথক পৃথক ভাবে দিতে হবে। ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্য ব্রতকালীন নির্দিষ্ট অগ্নিপরিচয়ন সমিদধান মন্ত্রে সমিদাধান করবে। আচার্যের সঙ্গে শিষ্যগণ সকলে "শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষু দেবতাতা মিতদ্রবঃ স্বর্কাঃ। জম্ভয়ন্তোঽহিং বৃকং রক্ষাংসি সনেম্যস্মদ্যুযবন্নমীবা" য.সং ৯/১৬ এই মন্ত্র পাঠ করে অক্ষত যবের কণাগুলো না চিবিয়ে খাবে। "দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষ্যৎ।। য.সং ২৩/৩২" এই মন্ত্রটি পাঠ করে দধি ভক্ষণ করবে।[২] আচার্য যতগুলো ইচ্ছা করবেন অর্থাৎ যতগুলো শিষ্যকে সমিদধান করাবেন ততগুলো তিল

[১] পা. গৃ. সূ ২/১০/১-১২, কা. গৃ. সূ ১/৯/২-৩, বৈ. গৃ. সূ ১/১২/১-১৫

[২] পা. গৃ. সূ ২/১০/১৩-১৬. কা. গৃ. সূ ৯/১/৪

এবং বাহু পরিমিত সর্পাকৃতি উদুম্বর খন্ড ""তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা " য. সং ৩/৫৫" এই সাবিত্রী মন্ত্র দ্বারা অথবা "শুক্রজ্যোতিশ্চ চিত্রজ্যোতিশ্চ সত্যজ্যোতিশ্চ জ্যোতিষ্মাশ্চ শুক্রশ্চ ঋতপাশ্চাত্যংহাঃ য.সং ১৭/৮০, ১৭/৮১-৮৬" এই সাতটি অনুবাক দ্বারা আহুতি দেবে।[১] প্রাশনের পর অর্থাৎ আচার্য পূর্ব মুখে বসে পশ্চিম মুখে উপবিষ্ট শিষ্যকে তিনবার ওঁ মন্ত্র এবং তিনবার সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়ে (যজুর্বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক) অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অংশ পাঠ করাবে। ঋগ্বেদের উপাকরণে ঋষি ছন্দ সমেত মন্ডলগুলো শিষ্যদের পাঠ করাবেন। সামবেদের উপাকরণে পর্বের প্রাম্ভিক মন্ত্রগুলো পাঠ করাবেন। অথর্ববেদের উপাকর্মে সূক্তগুলো পাঠ করাবে। আচার্যের সঙ্গে সকল শিষ্যই "সহনোহস্তু সহনোহবতু সহন ইদং বীর্যবদস্তু ব্রহ্ম। ইন্দ্রস্তদ্বেদ যেন যথা ন বিদ্বিষামহ ইতি।" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করবে। উপাকর্মের পর তিনদিন অধ্যয়ন করবে না এবং উক্ত তিন দিন লোম ও নখ কাটবে না।[২]

৪.২ উৎসর্জন বা উৎসর্গকর্ম বা উপক্রম:

উৎসর্জন হল বেদাধ্যয়নের বিসর্জন।[৩] *গোভিল গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে পৌষী পূর্ণিমাতে বেদাধ্যাপনের উৎসর্গ অর্থাৎ কয়েক মাসের জন্য নূতন পাঠ অধ্যাপন ত্যাগ করবে। এটিকে প্রত্যুৎপাকরণও বলে।[৪] *শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে মাঘমাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে

[১] পা. গৃ. সূ ২/১০/১৭

[২] পা. গৃ. সূ ২/১০/১৮-২৫

[৩] আ. গৃ. সূ ৩/৫/২৩

[৪] গো. গৃ. সূ ৩/৩/১৫, জৈ. গৃ. সূ ১/১৫, খা. গৃ. সূ ৩/২/২৪

উত্তর-পূর্বদিকে ওষধি বহুল স্থানে সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে "উদু ত্যং জাতবেদসং"(ঋ.বে ১/৫০/১-১৩), "চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং" (ঋ.বে ১/১১৫/১-৬), "নমো মিত্রস্য বরুণস্য" (ঋ.বে ১০/৩৭/১-১২), "সূর্যো নো দিবস্পাতু"(ঋ.বে ১০/১৫৮/১-৫)- এই সূক্তগুলো অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করে ভূমিতে দিগন্তের বিভিন্ন দিকে বাম থেকে দক্ষিণে "শাস ইৎথা"(ঋ.বে ১০/১৫২/১-৫) এই সূক্তটি ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশ্যে পাঠ করবেন। এই সূক্তের প্রতি মন্ত্রে (একটি করে) মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করে এবং জল দিয়ে ঋষিদের, ছন্দের, দেবতাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং পিতৃপুরুষদের প্রত্যেককে তর্পণের মাধ্যমে তুষ্ট করে, পাঠার্থীরা সাড়ে ছয় মাস বা সাড়ে পাঁচ মাস বেদের অধ্যয়ন স্থগিত রাখেন।[১] যদি তারা বেদপাঠে ইচ্ছুক হন তাহলে একদিন ও একরাত্রির বিরতির পর তারা বেদপাঠ করতে পারেন।[২] মনু বলেন উৎসর্গ কর্ম সমাপ্ত করার পর পক্ষিণী রাত্রিতে ব্রহ্মচারী বেদপাঠ থেকে বিরত থাকবেন অথবা একদিন তারা বেদপাঠ করবেন না । এরপর শিষ্যেরা শুক্লপক্ষে মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদ অধ্যয়ন করবেন এবং কৃষ্ণ পক্ষে বেদাঙ্গগুলো পাঠ করবে।[৩] *পারস্কর গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে পৌষমাসের রোহিণী নক্ষত্রে অথবা কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বেদাধ্যয়ন উৎসর্গ করা হবে অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত পুনর্বার উপাকর্ম না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বেদাধ্যয়ন করবেন না। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হল পুনরায় নূতন পাঠ গ্রহণ। সাড়ে পাঁচ মাস মতান্তরে সাড়ে ছয় মাস অধ্যয়ন করে বেদ উৎসর্গ করবে।[৪] *আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে ব্রহ্মচারী শ্রাবণ মাসের

---

[১] শা. গৃ. সূ ৪/৬/১-৮, গো. গৃ. সূ ৩/৩/১৬-১৭

[২] শা. গৃ. সূ ৪/৬/৯

[৩] মনু.সং ৪/৯৭-৯৮

[৪] পা. গৃ. সূ২/১২/১, হি. গৃ. সূ ২/৮/৮

পূর্ণিমাতে বেদাধ্যয়নের উপাকর্ম করে এক মাস ধরে প্রদোষকালে (রাত্রির প্রথম ভাগে) অধ্যয়ন করবেন না কিন্তু প্রদোষকালের পরে রাত্রিতে কোনো অধ্যয়ন করলে সেটি কোনো দোষের হবে না। পৌষমাসের পৌর্ণমাসিতে অথবা তার পূর্বে রোহিণী নক্ষত্রতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, সুতরাং বেদাধ্যয়নের কাল হল পাঁচ মাস। কোনো কোনো ধর্মজ্ঞের মতে সাড়ে চার মাস বেদ অধ্যয়নের সময় বলা হয়ে থাকে। যারা সাড়ে চার মাস বেদ অধ্যয়নের কথা বলেছেন তাদের মতানুসারে উপাকর্ম ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতে হওয়া প্রয়োজন। উৎসর্জনের পরও এই ক্রমেই বেদাধ্যয়ন এবং অনধ্যায় করতে হবে। ব্রহ্মচারীকে প্রত্যেক মাসের কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গ এবং ব্যাকরণাদির অধ্যয়ন করতে হবে। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে উপাকর্ম করে প্রথমে যে বেদ পড়া হয়নি সেই বেদের অংশের অধ্যয়ন করতে হবে।[১]

মনুসংহিতায় আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে উপাকর্ম অর্থাৎ সাড়ে চার মাস বেদসমূহ অধ্যয়ন করার পর পৌষমাসের পুষ্যা নক্ষত্রে অথবা মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পূর্বাহ্নে গ্রামের বাইরে অনাবৃত স্থানে উৎসর্জন অর্থাৎ বেদ পাঠের বিরাম নামক কর্মানুষ্ঠান করা হবে।[২] নদী অথবা কোনো জলাশয়ে গিয়ে অর্থাৎ স্নান করে জল দিয়ে দেবতাদের, ছন্দের, বেদসমূহের, ঋষিদের, পুরাণাচার্যদের, গন্ধর্বদের, অন্য আচার্যদের দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু প্রভৃতি অবয়বসহ সংবৎসরের এবং নিজের মৃত পিতা পিতামহাদি ও আচার্যদের

[১] আপ. ধর্ম ১/৩/১-৩

[২] পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্যাদ্বহিরুৎসর্জনং দ্বিজঃ। মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্নে প্রথমেঽহনি।। (মনু.সং ৪/৯৬)

তর্পণ করবে। আচার্য সাবিত্রীমন্ত্রকে চার ভাগে বিভক্ত করে পড়ে "বিরতাস্ম" অর্থাৎ পাঠ থেকে বিরত হচ্ছি এই কথাটি বলবে।[১]

৪.৩ বেদাধ্যয়ন বা বেদব্রত:

যারা উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হয়েছে তাদের বেদ-অধ্যয়ন করানো হবে। *গৌতম ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে যে শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে উপাকর্ম সংস্কারের পর বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করতে হয়।[২] এই অধ্যয়নকালে ব্রহ্মচারী ক্ষৌর কর্ম করবেন না এবং মাংস ভক্ষণও করবেন না অথবা এই নিয়মটি ব্রহ্মচারীরা কেবলমাত্রে দুই মাসের জন্যই পালন করতে পারেন একথাও এই ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে। বেদাধ্যয়নের রীতি হল আচার্য পূর্বে বা উত্তর দিকে বসেন, শিষ্য উত্তরমুখী হয়ে দক্ষিণ দিকে বসেন অথবা গুরু শিষ্য উভয়েই দক্ষিণ দিকে বসবেন। ছাত্র সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে ইচ্ছানুসারে তারা উপবেশন করবেন। ছাত্র "মহাশয়" উচ্চারণ করার পর আচার্য তাকে দিয়ে "ওম্" উচ্চারণ করাবেন। পাঠ হয়ে গেলে আচার্যের চরণ দুটো আলিঙ্গন করে "বিরতাঃ স্ম ভো৩" অর্থাৎ "আমাদের পাঠ শেষ হয়েছে মহাশয়" বলে শিষ্যেরা নিজ নিজ কর্মে রত হবেন। আচার্য বলবেন "যাও", কোনও কোনও আচার্য বলেন "ইত্যবসরে থাম।" অধ্যয়নরত ছাত্র ও আচার্যের মধ্যে অন্য কেউ প্রবেশ করবেন না। মন্ত্রোচ্চারণকালে কেউ স্থান পরিবর্তন করবেন না। ব্রহ্মচারীর বেদাধ্যয়নে কোনও ত্রুটি হলে তিন দিন অথবা এক দিন ও এক রাত্রি উপবাস করে যতবার

---

[১] পা. গৃ. সূ ২/১২/২-৪, মা. গৃ. সূ ১/৪/৮, হি. গৃ. সূ ২/৮/১০

[২] গৌ. ধর্ম. সূ ২/৭/১-৪

সম্ভব সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করবেন এবং ব্রাহ্মণদের কিছু দান করবেন। এরপর একদিন ও একরাত্রি পাঠ বন্ধ রাখার পর অধ্যয়ন আবার চলতে থাকবে। গুরুর উপস্থিতিতে শিষ্য উচ্চাসনে বসবেন না। তাঁর সাথে একাসনেও বসবেন না। পা দুটি ভূমিতে প্রসারিত করবেন না।

দুই বাহুদ্বারা জানুকে ধারণ করে ও স্তম্ভে হেলে বসবেন না। পা তুলে বসবেন না। কুঠারের মত পা দুটোকে ধরে থাকবেন না।[১]

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে ব্রহ্মচারী যখন বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করবেন তখন তিনি ধৌতবস্ত্র পরিধান করবেন, শাস্ত্রানুসারে আচমন করে উত্তরমুখ হয়ে উপবেশন করবেন এবং ইন্দ্রিয়ের সংযমন করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে গুরুর নিকটে বেদাধ্যপনা করবেন। বেদাধ্যয়নের প্রারম্ভে এবং অবসানে শিষ্য প্রতিদিন গুরুর চরণযুগল স্পর্শ করবেন।[২] বেদাধ্যয়নের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ করা কর্তব্য কারণ প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ না করলে অধীয়মান বেদমন্ত্র মন থেকে অপসৃত হয়ে যায়।[৩]

মনুর মতে যারা বিষয়ভোগে আসক্ত হয়ে দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন হয়েছেন তাদের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ।[৪] বেদাধ্যাপনায় এবং বেদাধ্যয়নে যোগ্য ও অযোগ্য সম্পর্কে মনু বলেছেন আচার্যের পুত্র, গুরুর শুশ্রুষা করেন এমন ব্যক্তি, আচার্য বা গুরুর অজানা বিষয় যে ব্যক্তি গুরু বা

---

[১] শা. গৃ. সূ ৪/৮/১-২০, কা. গৃ. সূ ৪/২/৩

[২] মনু. সং ২/৭০-৭১

[৩] ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্যাদাদাবন্তে চ সর্বদা। স্রবত্যহনোঙ্কৃতং পূর্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতি।। (মনু. সং ২/৭৪)

[৪] বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংশি চ। ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ।। (মনু.সং ২/৯৭)

আচার্যকে জানান, ধার্মিক অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কার্যে যে আসক্ত, মৃত্তিকা বা জলের দ্বারা যে ব্যক্তি সবসময় শৌচসম্পন্ন, আপ্ত অর্থাৎ সুহৃদ, নিকট আত্মীয়, বিদ্যার গ্রহণ ও তার ধারণে সমর্থ ব্যক্তি, ধনদানে সমর্থ এমন ব্যক্তি, সাধু এবং উপনীত শিষ্য এই দশজন ধর্মানুসারে অধ্যাপনার যোগ্য।[১] যে ব্রহ্মবাদী ব্যক্তির জীবনোপায়ের কষ্ট হলেও কখনই তিনি অপাত্রে বিদ্যাবীজ বপন করবেন না।[২] যে শিষ্যকে বিদ্যাদান করলে কোনও ধর্ম এবং অর্থ (উপকারপ্রাপ্তি) হয় না এবং যে অধ্যাপনায় অধ্যাপনার অনুরূপ সেবা শুশ্রুষাও নেই সেখানে বিদ্যাদান করা অসঙ্গত।[৩]

গৌতম সংহিতাতে বেদাধ্যয়ন বিষয়ে বলা হয়েছে যে গুরু তাঁর হস্ত দ্বারা শিষ্যের অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করে "ওহে অধ্যয়ন কর" এই বলে শিষ্যকে সম্বোধন করবেন। এরপর শিষ্যে দর্ভ অর্থাৎ কুশ দ্বারা চক্ষু, মন ও প্রাণের স্থান ও ঘ্রাণ স্পর্শ করবে এরপর প্রত্যেক স্থলে পঞ্চদশ জপ করে তিনবার প্রাণায়ম করবেন। এরপর শিষ্য দর্ভে উপবেশন করে ওঙ্কারপূর্বক পঞ্চ বা সপ্ত ব্যাহৃতি পাঠ করবেন। প্রাতঃকালে বেদাধ্যয়নের আরম্ভে এবং অন্তে শিষ্য গুরুর পাদগ্রহণ করবেন এবং গুরু কর্তৃক অনুজ্ঞাত হয়ে উপবেশন করবেন। শিষ্য বেদাধ্যয়নের সময় গুরুর দক্ষিণ পূর্ব বা উত্তরমুখ হয়ে উপবেশন করে প্রথমে গায়ত্রী পাঠ করবেন এবং অন্তে ওঙ্কারের উচ্চারণ করবেন।[৪]

---

[১] আচার্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্মিকঃ শুচিঃ। আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ স্বোঽধ্যাপ্যা দশ ধর্মতঃ।। মনু. সং ২/১০৯

[২] বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা। আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ।। (মনু. সং ২/১১৩)

[৩] ধর্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রুষা বাপি তদ্বিধা তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে।। (মনু. সং ২/১১২)

[৪] গৌ. সং ১ অধ্যায়

৪.৪ উপরমকর্ম বা অনধ্যায়:

বেদাবৃত্তির ব্যাঘাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে – যদি কোনো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে তাহলে যেইদিন এই ঘটনাটি ঘটবে সেইদিন থেকে তারপর দিনে ঠিক সেই সময় পর্যন্ত বেদভ্যাস বন্ধ থাকবে, অন্যান্য দৈব ঘটনার ক্ষেত্রেও তাই হবে অর্থাৎ বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, উল্কাপাত, সূর্য, চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রেও এবং বৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনটি গোধূলি অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অনেক আচার্যের মতে একদিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, শ্রাদ্ধাহারের বেলায় একদিনের জন্য, কোন আত্মীয়ের মৃত্যু বা জন্ম ঘটলে দশদিনের জন্য, দুটি পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে, অমাবস্যার দিনগুলোতে এবং অষ্টকাশ্রাদ্ধের দিনগুলোতেও বেদের আবৃত্তি বিঘ্নিত হবে। প্রতি পূর্ণিমাতে অনধ্যায় হবে। বিশেষত কার্ত্তিকী, ফাল্গুণী ও আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে একদিন ও একরাত্রি অধ্যয়ন বন্ধ থাকবে। মেঘাছন্ন দিনগুলোতেও বেদাভ্যাসে এই ছেদ পড়বে। শ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করলে, সতীর্থের মৃত্যুতে, মৃত ব্যক্তির শবযাত্রায় অনুগমন করলে, পিতাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করলে, রাত্রিতে, গোধূলিবেলায়, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাগুলোর সময়ে, সূর্যাস্তের পর, শূদ্রসান্নিধ্যে, সামগান শোনা গেলে, শ্মশানে, গ্রামের অধীনস্থ অরণ্যে, গ্রামে শব থাকলে, নিষিদ্ধ কোনো দৃশ্য দেখলে, নিষিদ্ধ কিছু শুনলে, দুর্গন্ধ নাকে গেলে, প্রবল বাতাস বইলে, মেঘ প্রবল বৃষ্টি ঘটালে, শকটমার্গে, বীণাধ্বনি শোনা গেলে, রথে অবস্থিত থাকলে, শূদ্রের সান্নিধ্যের মত কুকুরের সান্নিধ্যে, গাছে উঠলে, গর্তে নামলে, জলে নিমজ্জিত হলে, কেউ কাঁদলে, শারীরিক যন্ত্রনা হলে, নগ্নাবস্থায়, উচ্ছিষ্ট খাদ্যের কারণে অশুদ্ধ হলে, সেতুর উপরে উঠলে, কেশ এবং শ্মশ্রু কর্তনের সময়, গাত্রমর্দনের সময়ে, স্নানের সময়ে, নারীসংসর্গের সময়ে, তৈলমর্দনের সময়ে, যে মানুষকে শব স্পর্শ করতে হয়, সদ্যপ্রসূত স্ত্রীর সান্নিধ্যে,

অপবিত্র নারীর সান্নিধ্যে, অভুক্ত ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে এবং অভুক্ত গাভীর উপস্থিতিতে বেদাভ্যাস বিঘ্নিত হয়। এই বিষয়টিকে বলা হয় উপরমকর্ম বা অনধ্যায় কর্ম।

যদি ব্রহ্মচারী অনিচ্ছাবশত কোন একটি বিষয় ঘটান তাহলে তিনি নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে অধ্যয়ন করবেন। বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও বৃষ্টি ব্যতীত কল্পের অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এই বিধিগুলো প্রযোজ্য। বর্ষণের সময়ে যেমন কল্পের অধ্যয়ন সাড়ে পাঁচমাস যাবৎ পালন করা যেতে পারে। মনু বলেন ছয় বেদাঙ্গে, নিত্য কর্তব্যাদি সন্ধ্যাবন্দনাদি কাজে, স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ বিষয়ে এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যয়নের দিনও অধ্যয়ন করা যেতে পারে।[১] দিনের বেলায় ধূলোযুক্ত প্রবল বাতাস বাহিত হলে এবং রাত্রিবেলায় প্রবল বাতাস বাহিত হলে এবং তার ধ্বনি শোনা গেলে অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। কুকুর, শৃগাল এবং গর্দভ যদি একই সঙ্গে ডাকে তাহলে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করলে, আকাশে ইন্দ্র ধনু দেখা দিলে, বর্ষা ঋতু ব্যতীত অন্য ঋতুতে জলপূর্ণ মেঘ দেখা দিলে, মূত্র অথবা পুরীষ ত্যাগ করার সময়, মধ্যরাত্রি, সন্ধ্যা এবং জলের মধ্যে দাড়িয়ে অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। অন্ন, জল, ফল, মূল এবং অন্য যা কিছু শ্রাদ্ধসম্পর্কিত বস্তু যদি ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন তাহলেও অনধ্যায় পালন করতে হবে, কারণ কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে হাতই হচ্ছে তাঁর মুখ। যেহেতু হাতই ব্রাহ্মণের মুখ, তাই হাতে গ্রহণ করা মানেই মুখ দিয়ে তা ভক্ষণ করা। কোনও গুরুর শিষ্য মৃত হলে, আচার্যের মৃত্যু হলে, ভূস্বামীর মৃত্যু হলে এক অহোরাত্র অধ্যয়ন বন্ধ থাকবে। কোনো কোনো গৃহ্যসূত্রকারের মতে গুরু বা আচার্যের মৃত্যু হলে উদক ক্রিয়া করতে হবে অর্থাৎ স্নান করে জলদান করতে হবে এবং দশদিন অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকতে হবে। সব্রহ্মচারিনী অর্থাৎ সহপাঠী তথা সতীর্থের মৃত্যুতে তিন রাত্রি

[১] মনু.সং ২/১০৫, বিষ্ণু.সং ৩০/৩

অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। অসব্রহ্মচারী অর্থাৎ সতীর্থ না কিন্তু সহপাঠী তার মৃত্যুতে একরাত্রি অনধ্যায়। গীত, বাদ্য, ক্রুন্দন, অভিবাত উপস্থিত হলে যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো চলবে ততক্ষণ অধ্যয়ন বন্ধ থাকবে। কোনো নিমিত্ত কর্মের জন্য যেমন কোন শিষ্য ব্যক্তি যদি আশ্রমে উপস্থিত হন তাহলে তার সেবার জন্য বেদাধ্যয়ন বন্ধ থাকবে। কঠ এবং কৌথুমী শাখাযুক্ত ব্রহ্মচারী যতদিন জলপূর্ণ মেঘ থাকবে ততদিন বেদ অধ্যয়ন করবেন না। ভোজন করে আচমন করার পর হাতের জল না শুকানো পর্যন্ত, জলের মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়ে, মধ্যরাত্রে অর্থাৎ রাত্রির দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহরে, সন্ধ্যাবেলায়, গ্রামের মধ্যে কোনো মৃতদেহ পরে থাকলে সেই গ্রামে এবং চন্ডাল অধ্যুষিত গ্রামে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। দৌড়ানো অবস্থায়, ব্রহ্মহত্যাদি পাপে অভিযুক্ত বা অভিশপ্ত ব্যক্তির এবং ব্রহ্মহত্যা করেছেন এমন পতিত ব্যক্তির দর্শনে, যাদুবিদ্যাদি বিস্ময়াবহ ঘটনা দর্শনকালে, পুত্রজনন বিবাহাদি যে অভ্যুদয়কাল সেই সময় বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ থাকে। কুষ্ঝটিকা বা কুয়াশায় আচ্ছন্ন কালে, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য বাজনার সময়, দুঃখ বা পীড়িত ব্যক্তি ক্রুন্দন করতে থাকলে, গ্রামের শেষ সীমায় শ্মশানে, কুকুর, গাধা, পেঁচা, শিয়াল, সাম এদের শব্দ বা ডাক শোনা গেলে এবং শিষ্ট বা শ্রোত্রিয়ের আগমন ঘটলে- সেই সেই কাল অনধ্যায়ের কাল অর্থাৎ এই সমস্ত সময় অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। গ্রামে চোরের উপদ্রব হলে. অগ্নিজনিত ভয় উপস্থিত হলে এবং দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোকের অদ্ভূত কোনও উপদ্রব ঘটলে আকালিক অনধ্যায় হবে। চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমীতে অহোরাত্র অধ্যয়ন করবে না, রাজা, এক শাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়, গো অথবা ব্রাহ্মণের বিপত্তি হলে অধ্যয়ন করবে না।[১] ভয়ভীত হলে, অশ্বাদি যানের উপর আরোহণ করলে, শয়ন করলে, একটি পায়ের উপর আরেকটি পা

[১] শা. গৃ. সূ ৪/৭/১-৫৫, গো. গৃ. সূ ৩/৩/১৮-২৯, জৈ. গৃ. সূ ১/১৫ ,খা. গৃ. সূ ৩/২/২৪-৩১, পা. গৃ. সূ ২/১০/১-৯,১৩, কা. গৃ. সূ ৯/১/৫-১২, মা. গৃ. সূ ২/৪/৫-৬, গৌ. ধর্ম. সূ ২/৭/৫-১৩, আপ. ধর্ম ১/৩/১-১১, মনু.সং ৪/৯৯-১১৮, বিষ্ণু. সং ৩০/৪-৩৩

রাখলে অথবা আসনাদির উপর পা রেখে বেদাধ্যয়ন করা যাবে না। যতক্ষণ সামগান শোনা যাবে ততক্ষণ ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদের অধ্যয়ন করা যাবে না।[১] *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে সামবেদের অধ্যয়নধ্বনি শ্রুত হলে কখনই ঋক ও যজুর্বেদের অধ্যয়ন যেমন করবে না তেমনি বেদের সমাপ্তি অর্থাৎ বেদের এক একটি অংশ সমাপ্ত হলে তা অধ্যয়নের পর অথবা বেদের অরণ্যকভাগ অধ্যয়ন করে, বেদের অন্য কোনও অংশ অধ্যয়ন করবে না।[২]

উপাকর্ম এবং উৎসর্জনের পূর্বে এবং পশ্চাতে তিন দিন অনধ্যায় বলে পরিগণিত হয়।[৩] উপনয়নাদি উৎসবে ভোজনের পর ঐদিন অনধ্যায় হবে। উপাকর্মের পরে যার অধ্যয়ন আরম্ভ করেন তারা রাত্রিকালে চার মুহূর্তে তাদের অনধ্যায় হবে।[৪] অপবিত্র থাকলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শ্রাদ্ধ কর্তা শ্রাদ্ধের দিন থেকে দুই দিন বেদাধ্যয়ন করতে পারবেন না।[৫]

চৌরাহিতে অথবা রাজপথে বসে কোনো প্রকার অধ্যয়ন করা যাবে না। গোবর লেপন করা হয়েছে এমন কোনো স্থানে অধ্যয়ন করতে হবে। শ্মশানের স্থানে গ্রাম তৈরী হলে অথবা শ্মশানকে ক্ষেত বানানো হলে সেখানে অধ্যয়ন করবে। শুদ্র বর্ণ এবং পাতক শ্রেণীর মানুষের সম্মুখে বেদ অধ্যয়ন করা যাবে না। কোনো কোনো আচার্যের মতে শূদ্র এবং পতিত যেই ভবনে থাকবে সেখানে বেদাধ্যয়ন করা যাবে না। যদি শূদ্র স্ত্রী বিদ্যার্থীকে এবং বিদ্যার্থী শূদ্র

---

[১] গৌ. ধর্ম. সূ ২/৭/১৭-১৮

[২] মনু. সং ৪/১২৩

[৩] গৌ. ধর্ম. সূ ২/৭/৪০, মনু. সং ৪/১১৯

[৪] গৌ. ধর্ম. সূ ২/৭/৪৩-৪৪

[৫] গৌ. ধর্ম. সূ ২/৭/৪৬-৪৭

স্ত্রীকে দর্শন করে তাহলে বেদাধ্যয়ন করা যাবে না। বিদ্যার্থী অথবা নিম্ন বর্ণের পুরুষের সাথে যৌন সম্বন্ধ করেছে এমন কোনো স্ত্রীর সামনে বেদাধ্যয়ন করা যাবে না। যেই গ্রামে চণ্ডাল থাকে সেখানে অধ্যয়ন করা যাবে না। যখন শবদেহকে গ্রামের সীমারেখায় নিয়ে যাওয়া হবে তখন অধ্যয়ন করা যাবে না। বনে শব দেহ অথবা চণ্ডাল দেখা গেলে সেখানে অধ্যয়ন করা যাবে না। উগ্র, নিষাদ প্রভৃতি বহিষ্কৃত জাতির লোক গ্রামে আসলে তাদের সামনে অধ্যয়ন করা যাবে না। যদি সন্ধ্যায় মেঘের গর্জন হয় তাহলে ঐ রাত্রিতে অধ্যয়ন করা যাবে না। যদি বিদ্যুৎ চমকায় তাহলে শয়ন করার সময় অধ্যয়ন করা যাবে না।[১]

অসময়ে বিদ্যুৎ চমকালে, মেঘ গর্জন করলে এবং বর্ষা এই তিনটি একসাথে হলে তখন তিন দিন অধ্যয়ন করা যাবে না অথবা এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি ঘটনাও যদি হয় অথবা দুটি ঘটনা একসাথে হয় তাহলে সেই সময়ের সেই দিন থেকে শুরু করে পরের দিন ওই সময় পর্যন্ত অনধ্যায় হবে।[২] রাত্রিকালে এমন কোনো বনে বসে অধ্যয়ন করবে না যেখানে অগ্নি অথবা স্বর্ণ নেই। অসময়ে অর্থাৎ উৎসর্জন এবং উপকরণের মধ্যবর্তী সময়ে

[১] আপ. ধর্ম. সূ ১/৩/৪-২১

[২] আপ. ধর্ম. সূ ১/৩/২৩,২৫,২৬

ছন্দের সেই অংশের অধ্যয়ন করা যাবে না যেই অংশের পাঠ পূর্বে করা হয়নি।[১] যেগুলো পূর্বে পড়া হয়েছে সেগুলো যে কোনো সময়ে অধ্যয়ন করা যাবে।[২]

বিবাদে অর্থাৎ বাক্কলহের সময়, দণ্ডাদিধারণ পূর্বক কলহের সময়, সৈন্যেদের মধ্যে অবস্থান করে, যুদ্ধের সময়, ভোজনের পর আচমনান্তে যতক্ষণ হাত সিক্ত থাকলে, অজীর্ণ হলে (আগের দিনের ভোজ্য খাদ্য যদি পরের দিনে পরিপাক না হয়), বমি করার অব্যবহিত পরে এবং শুক্তকে অর্থাৎ ঢেকুর তুলতে থাকলে বেদাধ্যয়ন করবে না। গৃহে উপস্থিত অতিথি বা গৃহাগত শিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে অর্থাৎ গৃহে উপস্থিত ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে কিংবা প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে থাকলে কিংবা জোঁক প্রভৃতির সংস্পর্শে শরীর থেকে রক্তপাত হলে অথবা শরীর শস্ত্রাদির দ্বারা ক্ষত হওয়ায় রক্তস্রাব হতে থাকলে বেদাধ্যয়ন করবে না।[৩] বেদাধ্যয়নকালে যদি গুরু ও শিষ্যের মাঝখান দিয়ে বা যারা অধ্যয়ন করছেন তাদের মাঝখান দিয়ে গবাদিপশু, ব্যাঙ, বিড়াল, কুকুর, সাপ, বেজী কিংবা ইঁদুর চলে যায় তাহলে এক অহোরাত্র অনধ্যায় হবে।[৪] গৌতম বলেছেন এইরকম হলে তিন দিন অনধ্যায় হবে। উল্লিখিত জন্তু ব্যতীত অপর কোনও জন্তু যদি অধ্যয়নকালে গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়ে গমন করেন অথবা শিষ্য যদি শ্মশানে গমন করেন তাহলে সেই শিষ্য প্রাণায়াম এবং ঘৃত ভোজন করবেন।[৫]

---

[১] আপ. ধর্ম. সূ ১/৩/২৯-৩১

[২] আপ. ধর্ম. সূ ১/৩/৩৩

[৩] মনু. সং ৪/১২১-১২২

[৪] মনু. সং ৪/১২৬

[৫] গৌ.সং ১ অধ্যায়

৪.৫ আধুনিক যুগে বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার:

আধুনিক যুগে উপাকর্ম, উৎসর্জন এবং বেদ ব্রতের কোনও প্রচলন নেই। গুরুকুলগুলোতে বর্তমানে পরম্পরা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক বেদের প্রথম চারটি মন্ত্র দৈন্দদিন রীতি হিসেবে পাঠ করা হয়। এছাড়াও এই মন্ত্রগুলোর সাথে সাথে তাদেরকে বৈদিক সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং বর্তমান যুগের উপযোগী বিষয় যেমন অংক, ইংরাজী, সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ করানো হয়ে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়:

শিক্ষাবিষয়ক সংস্কাররূপে সমাবর্তন ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার

৫.১ সমাবর্তনের স্বরূপ:

শৈশব উত্তীর্ণ সংস্কার হিসেবে পরিচয় পাওয়া যায় উপনয়ন সংস্কারের। যৌবনের সংস্কার হল সমাবর্তন এবং এই সংস্কার বিদ্যাসমাপনান্তে অনুষ্ঠিত হয়। উপনয়ন সংস্কারের জন্য বিদ্যার্থীকে আচার্যের কাছে যেতে হয় অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে উপনয়ন হল আচার্যের নিকটে গমনের অনুষ্ঠান। অপর দিকে সমাবর্তন হল আচার্যের নিকট থেকে পিতৃগৃহে অর্থাৎ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুষ্ঠান। সমাবর্তন শব্দের অর্থ– বেদ অধ্যয়নের পর গুরুকুল থেকে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন। এই সমাবর্তনকে ব্রহ্মচর্য পালনের সমাপ্তি বলা যেতে পারে। এই সংস্কারের অপর নাম স্নান।[১] *ব্যাসসংহিতায়* বলা হয়েছে "সমাপ্য বেদান্ বেদৌ বা বেদং বা প্রসতং দ্বিজঃ। স্নায়ীত গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ প্রবৃত্তোদিতদক্ষিণঃ।" অর্থ হল চারটি বেদের অথবা যে কোনও একটি বেদের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ব্রহ্মচারীকে গুরুর আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণা দিয়ে স্নান করতে হয়।[২] *দক্ষসংহিতাতে* বলা হয়েছে যে "ব্রহ্মচারী ভবেৎ তাবদূর্ধ্বং স্নাতো ভবেদ্গৃহী" এর অর্থ হল ব্রহ্মচারী অবস্থার সমাপ্তি হলে সমাবর্তন স্নান করে গৃহস্থাশ্রমী হতে হয়।[৩] *গৌতমসংহিতাতেও* অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরুকে দক্ষিণা দান করে গুরুর অনুজ্ঞা

---

[১] আ. গৃ. ৩/৮/৪, শা. গৃ. সূ ৩/১/১, পা. গৃ. সূ ২/৬/১, গো. গৃ. সূ ৩/৪/১, খা. গৃ. সূ ৩/১/১, আপ. ধর্ম ১/১১/১

[২] ব্যা. সং ১/৪১

[৩] দক্ষ. সং ১/৭

লাভ করে স্নান করার কথা বলা হয়েছে।[১] *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষায় ও ব্রতে যে ব্যক্তি কৃত্য এবং অকৃত্য হয়ে ব্রতস্নান করে স্নাতক হয়েছে এবং পিতার কাছ থেকে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ এবং দায় অর্থাৎ ধন লাভ করার অধিকারী হয়েছে যে তাকে মাল্যদ্বারা অলংকৃত করে এবং উৎকৃষ্ট শয্যায় উপবেশন করিয়ে বিবাহের পূর্বে গোসাধন এবং মধুপর্কের দ্বারা পিতা বা তাঁর অভাবে আচার্য শিষ্যকে যেভাবে সম্মানিত করেন তাকেই বলা হয় সমাবর্তন বা স্নান।[২] সমাবর্তনের সময় ব্রহ্মচারীর মেখলামোচন, দণ্ডত্যাগ, পৃথক বস্ত্রধারণ প্রভৃতি বাহ্য কাজগুলো করা হয়ে থাকে। এই সময় জটা, লোম প্রভৃতির ছেদন করে গার্হস্থ্যের উপযুক্ত চন্দন, পুষ্পমালা, পাগড়ি, বস্ত্রাভূষণ, অলংকার প্রভৃতি ধারণ করে এবং যে কার্যগুলো ব্রহ্মচর্য ব্রতে নিষিদ্ধ ছিল সেগুলো গ্রহণ করা হয়। এগুলো হল দর্পণ অবলোকন করা, কাজল লাগানো, ছাতা এবং জুতো ব্যবহার করা। এই সব কর্ম আচার্যের তত্ত্বাবধানে সমন্ত্রক হয়।[৩]

এই অনুষ্ঠানকে স্নান বলা হয়ে থাকে কারণ বিদ্যালাভের অন্তে গুরুকে কিছু প্রদান করে অর্থাৎ দক্ষিণা দিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে শিষ্যকে স্নান করতে হয়। এরপর শিষ্য নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই সংস্কারই হল শিক্ষাপ্রাপ্তির শেষ সংস্কার। এই সংস্কারে ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং বিদ্যাধ্যয়নের পূর্ণতা পাওয়া যায়। বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থীর আর ব্রহ্মচারী সংজ্ঞা থাকে না, বরং তিনি স্নাতক সংজ্ঞায় বিশেষিত হন। *আশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে সমাবর্তন স্নান করার পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার ইচ্ছা থেকে শিষ্য গুরু দ্বারা

---

[১] "বিদ্যান্তে গুরুরর্থে নিমন্ত্র্যঃ ততঃ কৃতানুজ্ঞানস্য জ্ঞানস্য" (গৌ. সং ২য় অধ্যায়)

[২] মনু. সং ৩/৩

[৩] শা. গৃ. সূ ৩/১/২),(বৌ. গৃ. সূ ২/৬/১-৩০),(জৈ. গৃ. সূ ১/১৯),(হি. গৃ. সূ ১/৩/৯/১০,১৩-১৮)

নিজের নাম উচ্চারণ করার সময় "ইদং বৎস্যামো ভোঃ ইতি" এই বাক্য উচ্চ স্বরে বলবেন। তারপর আচার্য এবং শিষ্য একসঙ্গে "প্রাণাপানয়োর্ উপাংশু" তথা "আ মন্দ্রেরিন্দ্র হরিভির্ ইতি।" (ঋ. বে ৩/৪৫/১) এই দুটি মন্ত্র উপাংশু স্বরে পাঠ করবেন। এরপর বৃদ্ধ আচার্য "প্রাণাপানয়োরুরুব্যচাস্তয়া প্রপদ্যে দেবায় সবিত্রে পরিদদামীত্যৃচং" এই মন্ত্রটি এবং ঋক্ মন্ত্রটিও জপ করবেন এবং জপ শেষ করে গুরু "ওঁ প্রাক্ স্বস্তি" এই মন্ত্রে জপ করে আদিত্যদেবতার উদ্দেশ্যে (ঋ.বে ১০/১৮৫) এই সূক্তের দ্বারা শিষ্যকে অনুমন্ত্রণ করে বিদায় জানাবেন।[১] *মানব গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর এই স্নানাদি সংস্কার হয় না।[২]

দীর্ঘকাল যাঁরা ব্রহ্মচর্য পালনের পর সমাবর্তন সংস্কারের দ্বারা স্নাতক হন, তাঁদের জন্য স্বাধ্যায় পাঠের যে ব্যবস্থা আছে তার অন্তর্গত হল- ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও সূত্র গাথা (বিশেষ কিছু মন্ত্র), নারাশংসী (বিশেষ মানুষের কামনামূলক কিছু মন্ত্র), ইতিহাস ও পুরাণ। এছাড়া বেদাঙ্গ (অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ), মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থসমূহও পাঠ করতে হবে।[৩] আশ্বলায়ন বলেছেন, ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় যে প্রত্যেকদিন পাঠ করতে হবে এমন নিয়মও নেই, ব্রহ্মচারী যতটা পাঠ করা তার পক্ষে সম্ভব বলে মনে করবেন ততটা পাঠ করবেন এবং "নমো ব্রহ্মণে নমো অস্ত্বগ্নয়ে নমঃ পৃথিব্যৈ নম ওষধীভ্যঃ নমো বাচে নমো বাচস্পতয়ে নমো বিষ্ণবে মহতে করোমীতি"- এই মন্ত্রের দ্বারা পাঠ শেষ করবেন। (মন্ত্রার্থ হল ব্রহ্মকে নমস্কার, অগ্নিকে

[১] আ.গৃ.সূ ৩/১০/১-৭

[২] মা. গৃ. সূ ১/২/১০

[৩] পা. গৃ. সূ ২/৬/১-৭

নমস্কার, পৃথিবীকে নমস্কার, ওষধিদের নমস্কার, বাক্ দেবতাকে নমস্কার, বাক্ পতিকে নমস্কার এবং মহান বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি।)[১]

ব্রহ্মচারী অবস্থায় বেদপাঠ ও অন্যান্য অঙ্গবিদ্যা সমাপ্ত করে যে ব্যক্তি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'স্নাতক' পদবী লাভ করতেন, সমাজে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত হতেন। আশ্বলায়ন বলেছেন "মহদ্ বৈ ভূতং স্নাতকো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে" । এই শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, স্নাতক একজন মহান পুরুষ।[২] বিদ্যালাভের শেষে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্র গুরুকে জিজ্ঞাসা করবেন, শিষ্য তাঁর কোন উদ্দেশ্য সাধন করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু যা করতে বলবেন তা করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে শিষ্য গুরুগৃহে থেকেই স্নান বা সমাবর্তন করবেন।[৩]

৫.২ স্নানের নিয়ম:

স্নানের নিয়ম সম্পর্কে *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে অপরাজিত দিশা অর্থাৎ দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব তথা দক্ষিণ-পশ্চিম ব্যতীত অন্য দিক থেকে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে যজ্ঞীয় বৃক্ষের সমিধ অর্থাৎ কাঠ সংগ্রহ করে আনতে হবে। সেই কাঠগুলো অবশ্যই শুষ্ক অর্থাৎ শুকনো এবং আর্দ্র অর্থাৎ ভিজে- এই দুই রকমই হবে। ভোজ্য অন্ন, পুষ্টি অথবা শক্তি কামনা করলে আর্দ্র সমিধ এবং ব্রহ্মবর্চস-কামনাকারী শুষ্ক সমিধ আহরণ করবে এবং যাঁরা উভয় কামনা করেন তাঁরা উভয় প্রকার সমিধ সংগ্রহ করবেন। এরপর এই যজ্ঞীয় কাঠকে

---

[১] আ. গৃ. সূ ৩/৩/৪

[২] আ. গৃ. সূ ৩/৯/৮

[৩] বিদ্যান্তে গুরুম্ অর্থেন নিমন্ত্র্য কৃতানুজ্ঞাতস্য বা স্নানম৷ আ. গৃ. সূ ৩/৯/৪

সর্বদা ভূমির থেকে উপরে কোনও স্থানে রাখতে হবে। এরপর ব্রাহ্মণদের গাভী ও অন্ন দান করে গৌদানিক কর্ম (শ্মশ্রু প্রভৃতি ছেদন করা) করতে হবে।[১] *গোভিল গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণরা দুটি গাভী, ক্ষত্রিয়রা দুটি অশ্ব এবং বৈশ্যরা দুটি মেষ আচার্যকে দক্ষিণা দেবেন।[২] *শঙ্খ সংহিতায়* বলা হয়েছে গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপ ধনাদি প্রদান করে স্নান করতে হবে।[৩]

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ব্রহ্মচারী ডান ও বাম হাত দিয়ে গুরুর ডান ও বাম চরণ স্পর্শ এবং গুরুর চরণে মাথা ছুঁইয়ে স্নান করার অনুমতি চাইলে শিষ্যকে গুরু স্নান করার অনুমতি দেন। এই অনুমতি পেলে ব্রহ্মচারী দুহাত দিয়ে অগ্নিপরিসমূহন থেকে আরম্ভ করে অগ্নিপরিচরণ করেন (ব্রহ্মচর্যকালীন অগ্নিপরিচর্যার থেকে পৃথক সমিদাধানের প্রাধান্য এখানে সূচিত হয়েছে)। তারপর কট (মাদুর), বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং জল দ্বারা পরিশ্রিত অগ্নির উত্তর দিকে পূর্বাগ্র করে পাতিত কুশের উপর ব্রহ্মচারী স্থাপিত জলপূর্ণ আটটি কলসীর মধ্যে প্রাণিসমূহনাশকারী, মুখবিকৃতকারী ও নাশকারী, মানসিক উৎসাহনাশক, বিবিধ রোগ দ্বারা পীড়নকারী, বিকৃতাবয়বকারী এবং ইন্দ্রিয়নাশকারী আট প্রকার অগ্নিকে দূর করে এবং যজ্ঞে যেই অগ্নি শুভ ও দীপ্তিযুক্ত সেই অগ্নিকে গ্রহণ করে কলসী থেকে জল নিয়ে গুরু ধর্মাদি বুদ্ধির কামনায়, কীর্তির জন্য বেদ জ্ঞানলিপ্সা এবং ব্রহ্মতেজ কামনা করে ওই আটটি কলসীর জল দ্বারা ব্রহ্মচারীকে অভিষিক্ত

---

[১] আ. গৃ. সূ ৩/৮/৩-৬, কা. গৃ. সূ ১/৪/২৫, বৈখ. গৃ. সূ ২/১৩/৩ , হি. গৃ. সূ ১/৩/৯/১২

[২] গো. গৃ. সূ ৩/১/৫-৮

[৩] গুরবে চ ধনং দত্ত্বা স্নায়াচ্চ তদনন্তরম্ । শঙ্খ. সং ৩/১৪

করবেন এবং পৃথক পৃথক মন্ত্র পাঠ করবেন।[১] এরপর শিষ্য মেখলা ও দণ্ড পরিত্যাগ করবেন অন্য একটি বস্ত্র পরে সূর্যোপস্থাপন করবেন। সূর্যোপস্থাপনের পর দধি বা তিল ভক্ষণ করে দন্তধাবন করে নতুন বস্ত্র পরিধান করবেন, জটা-লোমাদি ছেদন করবেন, গায়ে সুগন্ধি লেপন করবেন, হাতে পুষ্পধারণ করবেন, মাথায় উষ্ণীষ বেষ্টন করবেন, দুটি কানে কুণ্ডল ও মাথায় ছাতা ধারণ করবেন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠেয় শাস্ত্রীয় কাজ সম্পন্ন করবেন। *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে এই বস্তুগুলো নিজের এবং আচার্যের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। যদি দুজনের জন্য অর্থাৎ ব্রহ্মচারী এবং আচার্য এই দুজনের জন্য সমাবর্তনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো একত্র করতে না পারা যায় তাহলে শুধুমাত্র আচার্যের জন্যই এই বস্তুসমূহ সংগ্রহ করতে হবে।[২]

গোভিল ও খাদির গৃহ্যসূত্রে স্নানের নিয়মগুলো একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আচার্য পরিবারসম্বন্ধী স্থানেই উত্তর বা পূর্বদিকে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত স্নানাগার প্রস্তুত করবেন। ওই স্নানাগারে পূর্বাগ্রে যে কুশাসন বিছানো আছে সেখানে উত্তরাভিমুখ হয়ে আচার্য বসবেন অপরদিকে দক্ষিণভাগে এবং উত্তরাগ্রে যে কুশ বিছানো আছে সেখানে ব্রহ্মচারী বসবেন। *খাদির গৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মতেজ কামনা করেন তিনি এইভাবে বসবেন। যে ব্রহ্মচারী পশুর বৃদ্ধি কামনা করে তিনি গোশালাতে স্নান করবেন। যিনি যশ কামনা করেন তিনি বেদ যে স্থানে পাঠ করানো হয় সেখানে স্নান করবেন।[৩] এরপর আচার্য সুগন্ধ, সর্বৌষধি মিশ্রিত জলে ব্রহ্মচারীকে প্রথমে অভিষিঞ্চন করাবেন, তারপর ব্রহ্মচারী স্বয়ং

---

[১] পা. গৃ ২/৬/৯-১১

[২] আ. গৃ. সূ ৩/৮/১-২

[৩] খা. গৃ. সূ ৩/১/২-৬

একই ভাবে নিজেকে অভিষিঞ্চিত করবেন। স্বয়ং অভিষিঞ্চিত হবার সময়ে তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করবেন। প্রথমে পাঁচটি মন্ত্রে পঞ্চাঞ্জলি জল ব্যবহার করে শেষে অবশিষ্ট জল নিজের মস্তকে ঢালবেন। তার মধ্যে প্রথমে "যে অন্তস্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্যো মরূকো মনোহাঃ। খলো বিরুজস্তনূদূষিরিন্দ্রিয়হা অতি তান্তসৃজামি।। (ম. ব্রা ১/৭/১)"- এই মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল ভূমিতে ক্ষেপণ করবেন। এরপর তিনি "যদপাং ঘোরং যদপাং ক্রূরং যদপা মাশান্ত মতি তৎসৃজামি (ম. ব্রা ১.৭.২)" এই মন্ত্রেও অপর এক অঞ্জলি জল ভূমিতেই ক্ষেপণ করবেন। তারপরে "যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চসায় বলায়েন্দ্রিয়ায়। বীর্যায়ান্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্বিষ্যা অপচিত্যৈ।। (ম.ব্রা ১.৭.৪)" মন্ত্র পাঠ করে অপর এক অঞ্জলি জলে মস্তকাদি সিঞ্চিত করবেন। শেষে "যেন স্ত্রিয় মকৃণুতং যেনাপা মৃষতং সুরাম্৷ যেনাক্ষানভ্যিষঞ্চতং যেনেমাং পৃথিবীং মহীম্ । যদবাংতদশ্বিনা যশ স্তেন মা মভিষিঞ্চতম্ ।।" (ম. ব্রা ১/৭/৫) মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে তৃতীয়াঞ্জলি জলে পুনরায় নিজের মস্তকাদি সিঞ্চিত করবেন। অবশিষ্ট সমস্ত জলই অমন্ত্রক অবস্থায় মস্তকের উপরে ঢালবেন। এরপর স্নানাসন থেকে উত্থান করে উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎপ্রাতর্যাবভিরস্থাত্। দশসনিরসি দশসনি মা কুর্বা ত্বা বিশাম্যা মা বিশ।। (ম. ব্রা ১/৭/৬) অথবা উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎসান্তপনেভিরস্থাৎ। শতসনিরসি শতসনিং কুর্বা ত্বা বিশাম্যা মা বিশ।। (ম. ব্রা ১/৭/৭) অথবা উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎসায়ংযাবভিরস্থাৎ। সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্বা বিশাম্যা মা বিশ।। (মন্ত্র. ব্রা ১/৭/৮)এই তিনটি মন্ত্রের মধ্যে যে কোনও এক প্রকার মন্ত্র পাঠ করে সূর্যদেবতার মতো আরাধ্য দেবকে আরাধনা করবেন। তারপর "উদুত্তমং বরুণ পাশ মস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়। অথাদিত্য ব্রতে বয়ন্তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম। (ম. ব্রা ১/৭/১০)"- এই মন্ত্রটি পাঠ করে ব্রহ্মচর্য গ্রহণকালে গৃহীত মেখলা ত্যাগ করবেন। এইভাবে

স্নানক্রিয়া সমাপন করে মেখলাত্যাগের পর সেই স্নাতক কিছু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবেন এরপর নিজে ভোজন করবেন তারপর নাপিতের দ্বারা শিখা ব্যতীত সমস্ত কেশ-শ্মশ্রু-রোম ও নখ কর্তন করবেন।[১]

জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে উত্তর দিকে এরকা ঘাসের মাদুর বিছিয়ে শিক্ষক এবং ছাত্র উত্তর পূর্বদিকে মুখ করে বসবেন। এরপর ব্রহ্মচারী মেখলামোচন, দণ্ডত্যাগ, নতুন বস্ত্রধারণ প্রভৃতি করবেন। এরপর চুল, দাড়ি, নখ প্রভৃতি নাপিতের দ্বারা কর্তন করে সেগুলোকে অশ্বত্থ বা যজ্ঞডুমুর গাছের গোড়ায় পুঁতে দিতে হবে। এরপর গুরু উষ্ণ জলে হিরণ্য অর্থাৎ সোনা দিয়ে শিষ্যকে স্নান করাবেন।[২]

বসন্ত ঋতুতে স্নানানুষ্ঠান হলে প্রজাপতির অধীনে রোহিণী নক্ষত্রে এই অনুষ্ঠান করতে হবে। ব্রহ্মচারী যদি সোমবল্লী আহরণ করতে চান তাহলে তাঁকে মৃগশিরা নক্ষত্রে স্নান করতে হবে। আবার যদি ব্রহ্মচারী আধ্যাত্মিক দীপ্তি পেতে চান তাহলে তিনি ব্রহ্মের অন্তর্গত তিষ্যা নক্ষত্রে স্নান করবেন। যদি ব্রহ্মচারী সাবিত্রী দ্বারা প্ররোচিত হতে চান তাহলে তাঁকে সাবিত্রীর অধীনে হস্তা নক্ষত্রে স্নান করতে হবে। যদি ব্রহ্মচারী বন্ধুদের প্রিয় হতে চান তাহলে তাঁকে অনুরাধা নক্ষত্রে স্নান করতে হবে, কারণ অনুরাধা মিত্রের অন্তর্গত নক্ষত্র। ব্রহ্মচারী যজ্ঞের অধিকারী হতে চাইলে তাঁকে যজ্ঞের দেবতা বিষ্ণুর অন্তর্গত শ্রবণা নক্ষত্রে স্নান করতে হবে। [৩]

---

[১] গো. গৃ. সূ ৩/৪/৮-২৪, খা. গৃ. সূ ৩/১/৭-২৪

[২] জৈ. গৃ. সূ ১/১৯

[৩] জৈ. গৃ. সূ ১/১৯, বৈখ. গৃ. সূ ২/১৩/২, হি. গৃ. সূ ১/৩/৯/৩

৫.৩ সমাবর্তনে নিয়মের শিথিলতা:

জীবনের উপযুক্ত বিকাশের জন্য ব্রহ্মচারী জীবনের যে বিধিনিষেধ পালন করা হয় তার থেকে মুক্তি লাভ হয় এই সমাবর্তন সংস্কারের মাধ্যমে। ব্রহ্মচারী জীবনে বিদ্যার্থীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল জ্ঞানার্জন করা। সেই সময় কোনওরকম দৈহিক প্রসাধন ব্যবহার করা তাঁদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই নিয়মেরই শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। এই অনুষ্ঠানে ব্রহ্মচারী অবস্থার নিষিদ্ধ বিষয়ের উপর বিধি নিষেধের প্রত্যাহার লক্ষ্য করা যায়। বেদাধ্যয়নের জন্যে উপনয়নের বয়স ৬ বা ৮ বা ৯ বা ১৬ বছর হলে যথাক্রমে ১৬ বা ২২ বা ২৪ বা ২৫ বছর বয়সে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।[১]

ব্রহ্মচারী যখন যজ্ঞডুমুরের কাঠ দিয়ে দন্তধাবন করবেন তখন স্নাতক "অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজাঽয়মাগমৎ। স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ।"- এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন। এরপর শরীরে সুগন্ধি লেপন করে স্নান করবেন এবং সুগন্ধিদ্রব্য মুখ ও নাসিকার কাছে ধরে "প্রাণাপানৌ মে তর্পয় চক্ষুর্মে তর্পয় শ্রোত্রং মে তর্পয়েতি" এই মন্ত্রটি পাঠ করে সুগন্ধি মুখ ও নাসিকায় লেপন করবেন। এরপর তিনি "পিতরঃ শুন্ধধ্বমিতি পাণ্যোরবনেজন দক্ষিণানিষিচ্যানুলিপ্য জপেৎ।"- এই মন্ত্রটি পাঠ করে হাত দুটো ধুয়ে হাত ধোয়া জল দক্ষিণ দিকে ফেলে চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য অঙ্গে লেপন করে "সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং ভূয়াসং সুবর্চা মুখেন। সুশ্রুৎকর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্ ।" এই মন্ত্রটি জপ করবেন। এরপর তিনি "পরিধাস্যৈ যশোধাস্যৈ দীর্ঘায়ুত্বায় জরদষ্টিরস্মিশ শতং চ জীবামি শরদঃ পুরূচী রায়স্পোষমভিসংব্যয়িষ্য" এই মন্ত্রটি পাঠ করে নতুন তথা নিখুঁত একবার মাত্র ধোয়া হয়েছে কিন্তু রজক দ্বারা ধৌত নয় এরকম একটি কাপড় পরবেন। এরপর ব্রহ্মচারী "যশসা মা দ্যাবা পৃথিবী

[১] গো. গৃ ৩/১/১, খা. গৃ. সূ ২/৫/১

যশসেন্দ্রাবৃহস্পতী। যশো ভগশ্চ মাবিন্দদ্যশো মা প্রতিপদ্যতামিতি" এই মন্ত্র পড়ে উত্তরীয় ধারণ করবেন। যদি একটি মাত্র বস্ত্র হয় অর্থাৎ পৃথক উত্তরীয় না থাকে তাহলে তিনি বস্ত্রেরই অর্ধাংশ দিয়ে উত্তরীয়ের মত গাত্র আচ্ছাদন করবেন। এরপর "যা আহরজ্জমদগ্নিঃ শ্রদ্ধায়ৈ মেধায়ৈ কামায়েন্দ্রিয়ায়। তা অহং প্রতিগৃহ্ণামি যশসা চ ভগেন চ।" এই মন্ত্রটি পাঠ করে পুষ্প গ্রহণ করবেন এবং "যদ্যশোঽপসরসামিন্দ্রশ্চকার বিপুলং পৃথু। তেন সংগ্রহিতাঃ সুমনস আবধ্নামি যশোময়ী" এই মন্ত্রটি বলে স্নাতক ফুলগুলো নিজের মাথায় দেবেন। এরপর মাথায় উষ্ণীষ, কানে কুণ্ডল ধারণ করবেন এবং কাজল পরবেন। এই বেশভূষা ধারণ করার সময় স্নাতক "উষ্ণীষেণ শিরো বেষ্টয়তে যুবা সুবাসা ইতি", "অলঙ্করণমসি ভূয়োঽলঙ্করণং ভূয়াদিতি কর্ণবেষ্টকৌ", "বৃত্রস্যেত্যঞ্জেঽক্ষিণী"- এই মন্ত্র তিনটি যথাক্রমে পাঠ করবেন। এরপর শিষ্য "রোচিষ্ণুরসীত্যাত্মানমাদর্শে প্রেক্ষতে"- এই মন্ত্র পাঠ করে দর্পণে নিজের মুখ দেখবেন এবং ছাতা, জুতো, বাঁশের দণ্ড ধারণ করবেন। এগুলো ধারণ করার সময় "বৃহস্পতেদ্শ্ছদিরসি পাপ্মনো মা মন্তর্ধেহি তেজসো যশসো মাঽন্তর্ধেহীতি", "প্রতিষ্ঠেস্থো বিশ্বতো মা পাতম্", "বিশ্বাভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যস্পরিপাহি সর্বত" এই তিনটি মন্ত্র যথাক্রমে পাঠ করবেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে দন্ত প্রক্ষালনাদি কর্ম স্নাতক সবসময় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বকই করবেন কিন্তু কাপড়, ছাতা, জুতো প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন ধারণের সময় মন্ত্র উচ্চারণ করে এগুলো ধারণ করবেন, অন্য সময় বিনা মন্ত্রেই ধারণ করবেন।[১] *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* ও *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে স্নান করার পর স্নাতক অন্তর্বাস অর্থাৎ নিম্নাংশের বস্ত্র, অধোবস্ত্র

[১] পা. গৃ. সূ ২/৬/১৭-৩২, আ. গৃ. সূ ৩/৮/৮-১৬, শা. গৃ. সূ ৩/১/৩-১২, গো. গৃ. সূ ৩/৪/২৫- ২৭, জৈ. গৃ ১/১৯, বৈখ. গৃ. সূ ২/১৫/১-৯, কা. গৃ. সূ ১/৩/৪-১৬, মা. গৃ. সূ ১/২/১৫-১৮, আপ. গৃ. সূ ৫/১২/৫-১১ বৌ. ধর্ম. সূ ১/৩/৬,৭

এবং উত্তরীয় ধারণ করবেন। এখানে বাঁশের দণ্ড ধারণ করা ছাড়াও জল পূর্ণ কমণ্ডলু, দুটি যজ্ঞোপবীত, বেদ অর্থাৎ কুশমুষ্টি এবং স্বর্ণনির্মিত দুটি মনোহর কুণ্ডল ধারণ করবেন।[১] এইভাবে বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করে বিভিন্ন দ্রব্য গ্রহণ করার পর গুরুর আশীর্বাদ নিতে হবে। এইভাবে শিষ্য ব্রহ্মচারী থেকে স্নাতক পদে উন্নীত হবেন।

৫.৪ স্নাতকের প্রকারভেদ:

যাঁদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় তাঁরা হলেন স্নাতক। স্নাতকেরা আবার বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যিনি বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করেন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য ব্রত সমাপ্ত না করে সমাবর্তন স্নান করেন এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন সেই ব্রহ্মচারী বিদ্যাস্নাতক। যে ব্রহ্মচারী বারো বছর বা আটচল্লিশ বছর ধরে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেন কিন্তু বেদের একটি শাখাও সমাপ্ত না করে সমাবর্তন স্নান করেন তিনি ব্রতস্নাতক। যে ব্রহ্মচারী বেদ ও ব্রত উভয়ই সমাপ্ত করে সমাবর্তন স্নান করেন তিনি বিদ্যাব্রতস্নাতক।[২] *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে এই তিন প্রকার স্নাতক বেদজ্ঞ গৃহস্থগণকে অর্থাৎ যাঁরা অতিথিরূপে উপস্থিত হবেন তাঁদের হব্য ও কব্য দ্বারা অর্থাৎ শান্তিকর্ম প্রভৃতি দেবকর্ম এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্যের দ্বারা পূজা করবেন। কিন্তু যাঁরা স্নাতক নন এমন ব্যক্তিগণকে এই ব্যাপারে পরিহার করবেন।[৩] বিদ্যাস্নাতক ও ব্রতস্নাতক গৃহস্থ অন্নপ্রাপ্তির জন্যে ক্ষত্রিয় রাজার কাছ থেকে ধন গ্রহণ করবেন অথবা যাজন ও অধ্যাপন করার জন্যে

---

[১] বৌ. ধর্ম. সূ ১/৩/২-৫, মনু. সং ৪/৩৫

[২] পা. গৃ ২/৫/৩২-৩৫, বৈখ. গৃ. সূ ২/১৩/১, জৈ. গৃ. সূ ১/১৯, গো. গৃ. সূ ৩/৫/২১-২২, আপ. ধর্ম. সূ ১/১১/৩-৪, মনু.সং ২/২

[৩] মনু. সং ৪/৩১

যজমান বা শিষ্যের কাছ থেকে ধন প্রার্থনা করবেন, কিন্তু অন্য কারও কাছ থেকেই অর্থ গ্রহণ করবেন না।[১]

৫.৫ সমাবর্তন-ভাষণ ও তার তাৎপর্য:

প্রাচীন ভারতের বেদপন্থী সমাজে বিদ্যার্থীরা যখন ব্রহ্মচর্যব্রত ও বেদবিদ্যা সমাপ্ত করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের উপযুক্ত হতেন, তখন গুরুগৃহে তাঁদের জন্য সম্পাদিত হত সমাবর্তন অনুষ্ঠান।

পারস্কর গৃহ্যসূত্র থেকে জানা যায় ৪৮ বছর বেদপাঠ ও ব্রহ্মচর্যব্রত প্রতিপালনের পর আবার কোনও কোনও আচার্যের মতে বারো বছর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করার পর গুরু অর্থাৎ আচার্যের অনুমতি সাপেক্ষে বিদ্যার্থী সমাবর্তন সংস্কারের অধিকার অর্জন করেন।[২] আচার্যের সমাবর্তন-ভাষণ স্নাতকোত্তর জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। ব্রহ্মচারী স্নানান্তে শুচিবস্ত্র পরিধান করে গুরু এবং মাতৃসমা গুরুপত্নীর চরণবন্দনার পর সমাবর্তন সংস্কার প্রার্থনা করেন। আচার্য তখনই আশীর্বাদান্তে সমাবর্তন ভাষণ দেন অর্থাৎ বেদের অধ্যাপনা শেষ করার পর আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দেন। *তৈত্তিরীয় উপনিষদের* শিক্ষাবল্লীর একাদশ অনুবাকে এই অমূল্য ভাষণটি রক্ষিত আছে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যে কী ছিল- এই সংক্ষিপ্ত ভাষণটি পর্যালোচনা করলেই আমরা তা জানতে পারি। এই ভাষণটি হল-"সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ । ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্ । কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।

---

[১] মনু. সং ৪/৩৩

[২] পা.গৃ ২/৬/১-৪

স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ । মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি । নো ইতরাণি। নো ইতরাণি। যে কে চাস্মৎ শ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্ । শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ । অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্ । শ্রিয়া দেয়ম্ । হ্রিয়া দেয়ম্ । ভিয়া দেয়ম্ । সংবিদা দেয়ম্ । অথ যদি তে কর্মচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্, তথা তেষু বর্তেথাঃ। এয আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্ । এবমুপাসিতব্যম্ ।”[১]

স্নাতকের প্রতি আচার্যের সর্বপ্রথম আদেশ ও উপদেশ হল ‘সত্যং বদ’ অর্থাৎ সর্বদা সত্য কথা বলবে। বৈদিক সমাজে সত্যের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। *ঋগ্বেদ-সংহিতায়* বলা হয়েছে যে, পৃথিবী সত্যের দ্বারাই উত্তোলিত হয়ে আছে।[২] এমনকী ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রবেশের সময় বিদ্যার্থী সর্বদা সত্য কথা বলার জন্য কৃতসংকল্পিত হয়। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে আচার্য স্নাতককে “সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্” এই নির্দেশ দেন অর্থাৎ সত্য অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। সংসারের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গৃহী যেন কখনও সত্যভ্রষ্ট না হন তারও নির্দেশ দেন।

---

[১] তৈ. উ ১/১১/১-৪

[২] সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ। ঋ. স. ১০/৮৫/১

‘ধর্মং চর’ উপদেশের অর্থ হল ‘ধর্মের অনুষ্ঠান করো’। আচার্য মনু ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (কেউ অনিষ্ট করলেও তার অনিষ্ট না করা), দম (ঔদ্ধত্য না করা), অস্তেয় (অন্যায় পূর্বক পরধন হরণ না করা), শৌচ (আহার প্রভৃতি বিষয়ে শুদ্ধতা), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (নিজ নিজ বিষয়গুলো থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রত্যাবৃত্ত করানো), ধী (প্রতিপক্ষের সংশয়াদি নিরাকরণ পূর্বক সম্যক্ জ্ঞান লাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য এবং অক্রোধ (যে ক্রোধ উৎপন্ন হতে পারত তা উৎপন্ন না হতে দেওয়া) ভেদে ধর্মের যথাক্রমে দশটি লক্ষণের কথা বলেছেন।[১] স্নাতক সংসারে প্রবেশ করে এই বিষয়গুলোর যথাযথ অনুশীলন যেন করেন এজন্য স্নাতককে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং বলা হয় ‘ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্’। অর্থাৎ ধর্ম থেকে যেন তারা কখনো বিচ্যুত না হয়।

‘স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ’ অর্থাৎ ‘স্বাধ্যায় থেকে ভ্রষ্ট হবে না’। প্রাচীন ঋষিগণ আমাদের জন্য যে জ্ঞানভাণ্ডার সযত্নে রেখেছেন তার সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যকর্তব্য। একারণে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেও প্রত্যেক স্নাতককে নিয়মিতভাবে স্বশাখার বেদপাঠ করতে হত, যার নাম স্বাধ্যায়। আবার কেবল স্বয়ং অধ্যয়ন করলেই চলবে না, অধ্যাপনাও (প্রবচন) করতে হবে। এজন্য গৃহে গমনের পূর্বে আচার্য অন্তেবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন- “স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ।” অর্থাৎ স্বাধ্যায় এবং অধ্যাপনা বিষয়ে শিক্ষার্থী যেন মনোযোগী হয়।

“আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ”- অর্থাৎ ‘বিদ্যানিষ্ক্রয়ের জন্য আচার্যের অভীষ্ট ধন আহরণ করে তা দক্ষিণাস্বরূপ দেবে’। তারপর আচার্যের আদেশক্রমে

---

[১] মনু. সং ৬/৯১,৯২,৯৩

সংসারে প্রবেশপূর্বক সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখবে অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন করবে। প্রাচীনকালে বিদ্যার্থী অধ্যয়ন সমাপ্ত করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে বিদ্যাদানের মূল্যস্বরূপ আচার্যের প্রিয় সামগ্রী আহরণ করে তাঁকে উপহার দিতেন যাকে বলা হয় গুরুদক্ষিণা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যে আচার্য শিষ্যের সদাচরণ দ্বারাই এমন প্রীত হতেন যে তিনি পৃথক ভাবে বিদ্যার্থীর নিকট কোনও দক্ষিণা কামনা করতেন না। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে *রঘুবংশের* দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। *রঘুবংশে* আচার্য বরতন্ত শিষ্য কৌৎসের অস্খলিত প্রগাঢ় ভক্তিকেই গুরুদক্ষিণা স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন।[১]

"কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ । ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্"- অর্থাৎ "আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নবান হতে হবে এবং উন্নতি লাভের জন্য মঙ্গলজনক কার্যে অবহিত থাকতে হবে"।

"দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ । মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি । নো ইতরাণি। নো ইতরাণি।" অর্থাৎ দেবকার্য ও পিতৃকার্যে অমনোযোগী হওয়া যাবে না অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে পিতৃকার্য ও দেবকার্যে কখনও ঔদাসীন্য দেখানো যাবে না। মাতা, পিতা, অতিথি এবং আচার্যকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে হবে। যেহেতু বিদ্যার্থী মাতা, পিতা এবং আচার্যের নিকট ঋণী সেহেতু এঁদের তিন জনকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। এছাড়াও অতিথিকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। সেই জন্যই বলা হয়েছে "অতিথিদেবো ভব"। সনাতন ভারতে গৃহাশ্রমীর পক্ষে অতিথিসেবা অবশ্য অনুষ্ঠেয় যজ্ঞরূপে

---

[১] সমাপ্তবিদ্যেন ময়া মহর্ষিবিজ্ঞাপিতোঽভূদ গুরুদক্ষিণায়ৈ। স মে চিরায়াস্খলিতোপচারাং তাং ভক্তিমেবাগণয়ৎ পুরস্তাৎ। (রঘু ৫/২০)

বিবেচিত হত। অতিথিপূজন পঞ্চমহাযজ্ঞের (ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ) অন্তর্গত। পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে এই নৃযজ্ঞের মাধ্যমেই অতিথিকে পূজা করা হয়ে থাকে।[১] লোকসমাজে যে সব কর্ম নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয় সেই ধরণের কর্ম করা যাবে না অনিন্দনীয় কর্মই সর্বদা করতে হবে। আচার্যগণের শোভন আচরণগুলোই অনুসরণ করতে হবে। অন্য আচরণ সমূহের অনুষ্ঠান করা যাবে না।

"যে কে চাস্মৎ শ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্ । শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ । অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্ । শ্রিয়া দেয়ম্ । হ্রিয়া দেয়ম্ । ভিয়া দেয়ম্ । সংবিদা দেয়ম্ । অথ যদি তে কর্মচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা গেত তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্, তথা তেষু বর্তেথাঃ। এয আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্ । এবমুপাসিতব্যম্ ।" অর্থ হল যে সব ব্রাহ্মণ আচার্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ সেই সব ব্রাহ্মণদের আসনাদি দ্বারা শ্রম দূর করতে হবে। সামর্থ্য অনুসারে দান অবশ্যকরণীয়। গৃহাশ্রমীর দানের ওপর অন্যান্য আশ্রম নির্ভরশীল। দান করার পদ্ধতি সম্পর্কে আচার্য স্নাতককে সমাবর্তন ভাষণে বলেছেন যে, শ্রদ্ধা সহকারে দান করতে হবে অশ্রদ্ধার সঙ্গে দান করলে চলবে না। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করতে হবে। নম্রতা, সম্ভ্রম এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের সঙ্গে দান করতে হবে। যদি শ্রৌত, স্মার্ত কর্ম বা আচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয় তাহলে সেই সময় সেই স্থানে যে সমস্ত বিচারক্ষম, কর্তব্যপরায়ণ ও আচারনিষ্ঠ, দয়ালু এবং নিষ্কাম ব্রাহ্মণ থাকবেন তাঁরা ওইসব কর্ম বা আচারে যেভাবে রত থাকবেন স্নাতক যেন

[১] মনু.সং ৩/৬৯-৭১

সেভাবেই রত থাকেন। আর তাঁদের কারও আচরণ বিষয়ে যদি কেউ সংশয় প্রকাশ করেন ওই স্থানে বা সময়ে যে কর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ থাকবেন তাঁরা ওইসব বিষয়ে যেভাবে রত থাকেন স্নাতকও যেন সেইভাবেই থাকেন। এটি আদেশ এবং এটিই উপদেশ। এই হল বেদোপনিষদের রহস্য। এই সমস্ত কিছুই হল সমাবর্তন ভাষণের তাৎপর্য। এই সমস্ত বলেই আচার্য তাঁর উপদেশ সমাপ্ত করবেন।

৫.৬ স্নাতকোত্তর বিধিনিষেধ কার্য:

স্নান সম্পন্ন হওয়ার পর অর্থাৎ স্নাতকোত্তর কালে এবং গুরুগৃহ থেকে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে স্নাতকের জীবনযাপন সম্পর্কে গুরু স্নাতককে শিক্ষা দেবেন। গৃহের বাতাবরণে মাতাপিতার স্নেহ দ্বারা যাতে স্নাতক নিয়ম পালন থেকে চ্যুত না হন, শমদমাদি আচরণ যাতে শিথিল না হয়, সেই কারণে গুরু তাঁকে শিক্ষা প্রদান করেন যে স্নাতক যেন সব সময়ই যম এবং নিয়মের পালন দৃঢ়তার সঙ্গে করেন। কামবাদ, কামাচার এবং কামভক্ষণ থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন, নৃত্যগীতাদিতে অভিরুচি না রাখেন, সবার সঙ্গে মিত্রতা পূর্ণ ব্যবহার রাখেন। বিবাহের আগে পর্যন্ত এই সমস্ত নিয়মের পালন করার উপদেশ দেন গুরু। এরপর তিনি গৃহস্থধর্মের পালন করার কথা বলেন।

এই সমাবর্তনকারী ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধের কথা গুরু বলেন সেগুলো হল- রাত্রিতে স্নান করা যাবে না, নগ্ন হয়ে স্নান করা যাবে না, নগ্ন হয়ে শয়ন করা যাবে না, মৈথুনকাল ব্যতীত অন্যত্র অন্য নগ্ন স্ত্রীকে দেখা যাবে না, বর্ষায় গমন করা যাবে না। বৃক্ষের

উপর ওঠা যাবে না, কূপে প্রবেশ করা যাবে না, বাহু দ্বারা সাঁতার কেটে নদী পার করা যাবে না। প্রাণসংকট হবে এমন কোনও কার্য করা যাবে না।[১]

অন্তর্লোম উৎপন্ন হয়নি এমন রসানভিজ্ঞা বালিকার সঙ্গে উপহাস করা যাবে না। বয়স, রূপ, গুণ প্রভৃতিতে সর্বথা অযোগ্যা নারীর সঙ্গে উপহাস করা যাবে না। রজস্বলা পত্নীর সঙ্গেও এই একইরকম পার্থক্য রাখতে হবে। সধবা অর্থাৎ পরস্ত্রীর সঙ্গেও উপহাসাদি করা যাবে না। অপর কোনও গুপ্ত দ্বারপথে অন্নভোজন করা যাবে না। দুইবার রান্না করা চাল অর্থাৎ সিদ্ধ চাল, পুষ্টিভাত প্রভৃতি ভোজন করা যাবে না। কন্দমূলফলাদি উপাদানে প্রস্তুতিকৃত অর্থাৎ শতমূলীর মোরব্বা,মাংস দিয়ে তৈরি কোনও খাদ্য, যবাদি থেকে উৎপন্ন জিলিপি প্রভৃতি খাদ্য, পিঠে বা অপর কোনওরূপ বিকৃত খাদ্য মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করলে কোনও ক্ষতি নেই। বৃষ্টির সময় বা তার পরে কর্দমময় পথে দৌড়ানো যাবে না। নিজের উপানৎ অর্থাৎ জুতো নিজের হাতে বহন বা নির্মাণ করবে না। অতিগভীর কূপাদির মধ্যে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা যাবে না। আম প্রভৃতি কোনও ফলই স্বয়ং তোলা অর্থাৎ চয়ন করা যাবে না। গন্ধশূন্য মালা মস্তকে ধারণ করা যাবে না কিন্তু সুবর্ণনির্মিত মালা আভরণের পক্ষে গন্ধশূন্য হলেও ধারণ করা যাবে।[২]

নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতি প্রমোদমূলক কাজ নিজে করবে না এবং যেখানে এগুলো হয় সেখানে যাবে না। ইচ্ছা করলে নিজে গান করবে এবং অপরে গান করলেও শুনবে বা তার সঙ্গে মিলিত হবে কারণ গানে হৃদয়ে রতি জন্মায়- এরকম শ্রুতিতে বলা হয়েছে।

---

[১] আ. গৃ. সূ ৩/৯/৬-৭

[২] গো. গৃ. সূ ৩/৫/৩-১৭, খা. গৃ. সূ ৩/১/৩২-৪০

কোনওরকম সঙ্কট না হলে রাত্রি বেলায় স্নাতক অন্য গ্রামে যাবে না। অযথা যত্র তত্র দৌড়াদৌড়ি করবে না। গাছের কাঁচা ফল পাড়বে না, নিষিদ্ধ পথে যাবে না, পর্বত-গর্ত প্রভৃতি লঙ্ঘন করবে না, অশ্লীলবাক্য বলবে না, সন্ধ্যাকালে অর্থাৎ সূর্যের অস্তগমন কালে সূর্যকে দেখবে না। কারও কাছে ভিক্ষা চাইবে না। যখন বৃষ্টি হবে তখন ছাতা ব্যবহার করবে না, জলের মধ্যে নিজের মুখ দেখবে না। গাত্রলোমহীন এবং দাড়িগোঁফ বিশিষ্ট নারী (হিজড়ে) এবং নপুংসক ব্যক্তিকে দেখে উপহাস করবে না। গর্ভবতী রমণীকে "বিজন্যা" বলে সম্বোধন করবে। নকুল অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিহীন নির্বংশ মানুষকে নির্বংশ না বলে সকুল বলবে। কপালকে ভগাল, ইন্দ্রধনুকে মণিধনু এরকম উচ্চারণ করবে। গাভী যখন বাছুরকে দুধ পান করাবে তখন কাউকে বলবে না। শস্যপূর্ণ বা তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে বসে মল-মূত্র ত্যাগ করবে না, নিজের থেকে ভেঙে পড়া কাঠের টুকরো দিয়ে মলদ্বার মার্জন করবে না। ছিন্ন বা উৎকট রঙে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না, হত্যাকারীর হাত থেকে নিজেকে ও অন্যকে রক্ষা করবে, সকলের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করবে।[১] পারস্কর বলেছেন, এই নিয়মগুলো অব্রহ্মচারী ও শূদ্ররাও ইচ্ছা করলে পালন করতে পারেন।[২]

সমাবর্তনকাল থেকে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত স্নাতকের বর্জনীয় বিষয়গুলোর কথা বলার পর পারস্কর স্নাতককে "ত্রিরাত্রিব্রত" আচরণের কথা বলেছেন। সমাবর্তনের পর থেকে পর পর তিন দিন স্নাতককে যে ব্রত পালন করতে হবে তাকেই ত্রিরাত্রিব্রত বলা হয়। 'ত্রিরাত্রি' বলতে তিন দিন বা তিন রাত্রি বুঝতে হবে এই তিনটি দিন বা রাত্রিতে স্নাতক মাংস ভক্ষণ করবেন না। মাটির পাত্রে জল পান করবেন না। তিনি নারী,

[১] পা. গৃ. সূ ২/৭/৩-১৮

[২] পা. গৃ. সূ ২/৭/২

শূদ্রজাতীয় মানুষ, মৃতদেহ, কাক ও কুকুরকে দেখবেন না এবং এদের সাথে কোনও কথাও বলবেন না। তিনি মৃত্যুজনিত এবং সন্তানাদি জন্মজনিত অশৌচ যাঁরা পালন করছেন তাঁদের দেওয়া অন্ন খাবেন না, সূর্যকিরণ পড়ছে এমন স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করবেন না, থুথু ফেলবেন না। ছাতা প্রভৃতির সাহায্যে সূর্যের কিরণ থেকে মাথা ঢাকবেন না। শৌচ আচমন প্রভৃতি কাজগুলো গরম জলের সাহায্যে করতে হবে। অন্ধকারে ভোজন করবেন না এবং রাত্রিতে ভোজনের সময় অবশ্যই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবেন। এই নির্দেশগুলো না মানতে পারলে ভোজন করাও নিষিদ্ধ।[১]

স্নাতক প্রাতঃকাল তথা সায়ংকালে এবং সন্ধ্যার সময় গ্রামের বাইরে মৌন হয়ে বসবেন। তাঁকে দিনের বেলায় মলমূত্র ত্যাগ করার সময় বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করে নিতে হবে এবং ভূমিতে তৃণাদি রেখে দিতে হবে। বৃক্ষের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু নিজের ছায়া পড়ছে এমন জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে। জুতো পরে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে না। কর্ষণ করা হয়েছে এমন ক্ষেতে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে না। পথের মধ্যে বা জলে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে না। জলের মধ্যে থুতু ফেলা যাবে না এবং মৈথুন কর্ম করা যাবে না। অগ্নি, জল, ব্রাহ্মণ, গরু, দেবতা, প্রতিমার দিকে মুখ করে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে না। পাথরের টুকরো দিয়ে, মাটি দিয়ে, যে বৃক্ষ ফল প্রদান করে সেই বৃক্ষের পাতা

[১] পা. গৃ. সূ ২/৮/১-৭, জৈ. গৃ. সূ ১.১৯, কা. গৃ. সূ ১/৫/১-৮, মা. গৃ. সূ ১/২/১৯-২১, আপ. গৃ. সূ ৫/১২/১২-১৪

এবং বনস্পতির পাতা দিয়ে শরীরে লেগে থাকা মল-মূত্রকে পরিষ্কার করা যাবে না। অগ্নি, সূর্য, জল, ব্রাহ্মণ, গরু, দেবমন্দিরের দরজার দিকে পা দেওয়া যাবে না।[১]

স্নাতক পূর্বদিকে মুখ করে অন্ন ভক্ষণ করবে, দক্ষিণ দিকে মুখ করে মল ত্যাগ করবে, উত্তর দিকে মুখ করে মূত্রত্যাগ করবে এবং পশ্চিমদিকে মুখ করে নিজের পা ধোবে। নিবাস স্থান থেকে দূরে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গিয়ে মূত্র এবং মল ত্যাগ করে। কিন্তু সূর্যাস্ত হওয়ার পর গ্রাম থেকে বাইরে গিয়ে অথবা দূরে কোথাও গিয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করবে। অপবিত্র অবস্থায় দেবতার নাম নেওয়া যাবে না। দেবতা তথা রাজার বিষয়ে কোনও নিন্দাজনক কথা বলা যাবে না। নিজের চরণ অথবা হাত দিয়ে ব্রাহ্মণ, গরু অথবা কোনো পূজ্য বস্তুকে স্পর্শ করা যাবে না।[২]

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে স্নাতক গৃহস্থ কেশ, নখ ও শ্মশ্রু নিয়মিত ছেদন করবেন, তপস্যাদি ক্লেশসহিষ্ণু হবেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম করবেন। পরিস্কৃত ও শুভ্র বস্ত্র পরিধান করবেন, অন্তরে ও বাইরে পবিত্র হবেন, বেদাভ্যাসে যত্নবান হবেন এবং প্রতিদিন নিজের হিতানুষ্ঠান করবেন। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সূর্যগ্রহণ অথবা আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্তী সূর্য দর্শন করা যাবে না। গোবৎস বন্ধন করার রজ্জু লঙ্ঘন অর্থাৎ অতিক্রম করবেন না। বৃষ্টিপাত হওয়ার সময় দ্রুত গমন করবেন না এবং জলে প্রতিবিম্বিত নিজ রূপ নিরীক্ষণ করবেন না।[৩]

---

[১] আপ.ধর্ম. সূ ১/১১/৮-২৫

[২] আপ. ধর্ম. সূ ১/১১/১-৭

[৩] মনু. সং ৪/৩৫,৩৭-৩৯

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় স্নাতকের ব্রত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে- যাঁরা স্বাধ্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করেন, যাঁরা উচিত-অনুচিত কর্ম বিচার করেন না, তাঁদের থেকে এবং নৃত্যগীতাদি কার্য এই সমস্ত বিষয় থেকে স্নাতকরা ধনগ্রহণ করবেন না।[১]

৫.৭ নারীর সমাবর্তন : *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে* বর্ণিত সমাবর্তনকালীন একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, ভারতীয় সমাজে নারী উপনয়নের অধিকারী ছিলেন। এই গৃহ্যসূত্রের একটি সূত্রে সমাবর্তনের একটি বিশেষ ক্রিয়ানুষ্ঠান বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে সমাবর্তনের অনুষ্ঠান কালে অনুলেপনের জিনিস দিয়ে হাতদুটি অনুলিপ্ত করে ব্রাহ্মণ প্রথমে নিজের মুখ, ক্ষত্রিয় নিজের দুই বাহু, বৈশ্য উদর, নারী নিজ উপস্থ (যোনি) এবং পরবর্তীকালে যারা সংবাদাদি বহনের কাজে নিযুক্ত হতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিরা নিজ নিজ ঊরু অনুলিপ্ত করবেন। এইভাবে প্রথমে মুখ প্রভৃতি অঙ্গকে কুঙ্কুমাদি দ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত করে অন্যান্য অঙ্গাবয়ব অনুলেপন করতে হবে।[২] সমাবর্তন উৎসবে নারীদের অনুলেপন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা থেকে মনে করা যায়, পুরুষদের মতো নারীদেরও উপনয়ন ও সমাবর্তন সংস্কার হত।

৫. ৮ আধুনিক জীবনযাত্রায় সমাবর্তন সংস্কারের প্রাসঙ্গিকতা :

শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য, সমাবর্তন ও স্নাতক সম্পর্কে নানামুখী আলোচনা থেকে দেখা যায়, প্রাচীনকালে এই চারটি কাজ গাম্ভীর্যের সঙ্গে ও পবিত্রভাবে অনুষ্ঠিত হত। উপনয়নকে বলা হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দ্বিতীয় জন্মের উপায় এবং এই কাজগুলোর

---

[১] যাজ্ঞ. সং আচারাধ্যায় ৬/১২৯

[২] আ. গৃ ৩/৮/১১

মাধ্যমে এরা দ্বিজ নামে অভিহিত হয়। দ্বিজত্বপ্রাপ্তির জন্যে স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক ও মানসিক শুদ্ধতার প্রয়োজন। পরবর্তী জীবনে গৃহস্থ অবস্থায় জীবন যাপনের জন্যও এই শুদ্ধতার আবশ্যকতা ছিল এবং এখনও আছে। আজ আমরা যন্ত্রের দাস হয়ে যন্ত্রের তালে তালেই চলেছি। এখন ওই সব নিয়ম পালনের সার্থকতা আছে বলে অনেকেই মনে করেন না। কিন্তু নিয়মগুলোর কিছু অংশ যদি পালন করা হয় এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য যদি শিক্ষার্থীকে বোঝানো হয় তাহলে তার মধ্যে আত্মিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব। যন্ত্রযুগের মানুষের কাছে যার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি।

গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রগুলোতে সমাবর্তন সম্পর্কে নানারকম আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য- এই তিন বর্ণের মানুষরাই এই সমাবর্তন সংস্কারকে খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে এবং নিষ্ঠাসহকারে পালন করতেন। বর্তমানে এই নিয়মের অনেক শিথিলতা দেখা যায়। বর্তমান কালের পশ্চিমবঙ্গে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পালন এবং বেদপাঠের প্রথা প্রায় বিলুপ্ত। সুতরাং বেদাধ্যয়নই যখন বিলুপ্তপ্রায় তখন ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতপালন নিরর্থক। আধুনিক যুগে পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত যে সব গুরুকুল আজও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করছে সেই সব গুরুকুলে ব্রহ্মচারীরা পাঁচ বছর থাকার পর বেদ-ভূষণ এবং সাত বছর থাকার পর বেদ-বিভূষণ এই উপাধিগুলি মহর্ষি সান্দীপনী রাষ্ট্রিয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করেন যা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক ডিগ্রির সমতুল। উক্ত উপাধিগুলি গ্রহণ করার পর তাঁরা গুরুকুল ত্যাগ করেন এবং বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। সাধারণ গৃহস্থের গৃহে উপনয়ন সংস্কার যে দিন অনুষ্ঠিত হয় সেদিনই পরবর্তী ব্রহ্মচর্যের কিছু মন্ত্র পাঠ করে বটুকের মস্তকে গুরু বা পুরোহিত জল ছিটিয়ে দেন। এইভাবেই উপনয়নের দিনই সমাবর্তন সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়।

অপরদিকে প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এখনও জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ- নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং তৎপরবর্তী অন্যান্য উপাধি দানের মাধ্যমে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে এবং সমাবর্তনের ভাষণ এবং তার তাৎপর্যও বলা হয়ে থাকে। বৈদিক যুগে সমাবর্তনের আগে অধীতবেদ বিদ্যার্থীকে প্রথা অনুসারে স্নান করতে হত। বর্তমানে এই প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছে। আমরা দেখেছি পূর্বে স্নাতকদের তিন প্রকার ভাগ ছিল। বর্তমানে এইরকম কোনও ভাগ লক্ষ্য করা যায় না। বৈদিক ও তৎপরবর্তীযুগে এই ভাগ স্নাতকদের বিদ্যা এবং ব্রতকে অনুসরণ করেই করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে ব্রত পালন করার বিষয়টি লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এই ভাগের কোনও গুরুত্ব সমাজে নেই। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্নভাবে এই সমাবর্তন সংস্কার পালন করা হয়ে থাকে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী আজও প্রাচীন ব্যবস্থার অনুসরণে সমাবর্তন সংস্কারের ব্যবস্থা করে থাকেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (রাজ্যপাল অথবা প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি) সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মানপত্র ছাত্র ছাত্রীদের হাতে প্রদান করেন। এই সময় প্রাচীন রীতিকে অবলম্বন করেই নিষ্ঠার সঙ্গে বৈদিক যুগে কথিত যে ভাষণ প্রদান করা হত সেই একই ভাষণ প্রদান করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান প্রতি বছর হয় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর এবং তৎপরবর্তী বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিদ্যার্থীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মান প্রদান করা হয়ে থাকে। এরপর যে সমস্ত অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে বিশেষ সম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে নিয়ে আসেন তাঁদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। অবশেষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্নাতক থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর এবং তৎপরবর্তী বিদ্যার্থীদের প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর উপাধি প্রদান করা হয়ে থাকে। সমাবর্তনের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক, বিভাগীয় অধ্যক্ষ ইতাদি পদাধিকারীরা প্রথমে মঞ্চে অবস্থান করেন। উপাচার্য বিদ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন যা তাঁদের পরবর্তী জীবনে চলার পথে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজে লাগবে। উপাচার্যের এই সমাবর্তন ভাষণের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সমাবর্তন ভাষণের (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, শীক্ষাবল্লী;) ইংরেজি অথবা বাংলা অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এরপর আচার্য (এক্ষেত্রে রাজ্যপাল) পি.এইচ.ডি উপাধিধারী গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করেন। এরপর উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধককে যেসব শিক্ষার্থী পদক, পারিতোষিক এবং শংসাপত্র পাবেন তাঁদের নাম ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করেন। নাম ঘোষণার পর ওইসব শিক্ষার্থী উপাচার্যের কাছ থেকে পদক, পারিতোষিক এবং শংসাপত্র গ্রহণ করেন। এরপর উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় আচার্যকে ভাষণ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন। এরপর বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষ বিভিন্ন বিষয়ের এম.ফিল উপাধিপ্রাপ্ত গবেষক, স্নাতকোত্তর উপাধিধারী এবং স্নাতক উপাধিধারী ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদানের জন্য প্রতি বিষয়ের বিভাগীয় প্রধানদের মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করেন। অবশেষে সহ-উপাচার্য এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সাধন করা হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান মোটামুটি এইভাবেই সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে বিভিন্ন বৎসর অনুষ্ঠেয় কার্যক্রমের বিন্যাসের কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের শুরুতে উপাচার্য, প্রধান অতিথি, অধ্যক্ষ এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠানের অন্যান্য পরিচালকমণ্ডলী মঞ্চে অধিষ্ঠান করেন এবং অনুষ্ঠানের শুরুতে বৈদিক স্তোত্র পাঠ করা হয়। এরপর মঞ্চে উপস্থিত সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত উপস্থাপন করেন এবং তারপর নিজেদের আসন গ্রহণ করেন। এরপর সকলে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই তাঁদের আসন গ্রহণ করেন। এরপর উপাচার্য সমাবর্তনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এরপর প্রধান অতিথি সমাবর্তন ভাষণ দেন। এরপর উপাচার্য যোগ্য প্রার্থীদের উপাধি ও ডিপ্লোমা প্রদান করেন এবং আসন্ন অধিবেশন পরিচালনার ভার সহ-উপাচার্যকে অর্পণ করেন। এরপর সহ-উপাচার্য ডি. লিট, পি. এইচ. ডি, স্নাতকোত্তর ও স্নাতক উপাধিধারী ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করেন। এরপর প্রধান অতিথিকে সমাবর্তন ভাষণ দেওয়ার জন্য উপাচার্য অনুরোধ করেন। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ বিশেষ পুরস্কারও উপাচার্য প্রদান করে থাকেন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও জাতীয় সঙ্গীত, বৈদিক স্তোত্র এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সমাবর্তন অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়ে থাকে। এরপর উপাচার্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনমূলক ভাষণ প্রদান করেন। এরপর মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর উপাচার্যের হাতে উপাধি প্রদানের প্রতীক হিসাবে সপ্তপর্ণী গাছের পাতা তুলে দেওয়া হয় এবং উপাচার্য সংকল্পবচন এবং শান্তিবচন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেন। এরপর রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতি তাদের বক্তব্য রাখেন। অবশেষে আশ্রম সঙ্গীত এবং জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে

স্নাতকোত্তর এবং তৎপরবর্তী বিদ্যার্থীদের সমাবর্তন সংস্কারের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেমন সিধু-কানহু বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনূষ্ঠান হয়ে থাকে। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়। উপাচার্য, আচার্য এবং অধ্যক্ষ এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্নাতকোত্তর, পি.এইচ.ডি, ডি.লিট, স্বর্ণপদক, রৌপ্যপদক এবং বিশেষ পুরস্কারের অধিকারীদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

অবশেষে বলা যেতে পারে যে বর্তমান সমাজের মানুষেরা বৈদিক যুগের সমস্ত প্রথা, নিয়ম ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে মেনে না চললেও আংশিক ভাবে অনুসরণ করেন। আমাদের সমাজকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার জন্য এই নিয়মগুলোকে যুগ যুগ ধরে অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

উপসংহার

৬.১ অধ্যায়সংক্ষেপ (Chapter Summary):

বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে নানান সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সংস্কারেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক সমাজে সংস্কারগুলো মূল উপজীব্য হলেও সংস্কারগুলোর নিয়মের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত বেদাঙ্গ সাহিত্যে যে কল্প নামক বিভাজনটি আছে তারই গৃহ্য ও ধর্ম সূত্রের অন্তর্গত যে সংস্কারগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো প্রধানত তিন বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে ধর্মশাস্ত্রগুলোতেও প্রায় একই প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। তবে আধুনিক যুগে এই নিয়মের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান যুগে জাতি. ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই এই সংস্কারগুলোর অধিকারী।

এই সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে কল্পসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বেদ সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক আলোচনা করে বেদাঙ্গ সাহিত্যে কল্পসূত্রের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর কল্পসূত্রের অন্তর্গত গৃহ্য এবং ধর্মসূত্র গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারসমূহের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্রতে সংস্কারের সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিটি সংস্কার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ধর্মশাস্ত্রগুলোতে এই সংস্কার গুলো সম্পর্কে যা যা আলোচনা করা হয়েছে তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কাররূপে উপনয়ন ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যা আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের প্রধান অলোচনার বিষয় শিক্ষা সংস্কারের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এই সংস্কারকে শিক্ষা অর্জন এবং গুরু গৃহে প্রবেশ দ্বার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই অধ্যায়ে উপনয়ন-সংস্কারের লক্ষ্য অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার করার কারণ, উপনয়ন সংস্কারের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, উপনয়ন সংস্কারের বিবিধ নাম, উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃতায়িত করানোর অধিকারী, উপনয়নের কাল, বয়স, নিয়মাবলী, উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি এবং ভিক্ষা দ্রব্যের ব্যবহার, উপয়ন পরবর্তী ব্রহ্মচারীর সমিধ আধান কর্ম, ব্রহ্মচারীর সংজ্ঞা, সূচনা, প্রকারভেদ, ব্রহ্মচারীর পরিধেয় সামগ্রী ধারণ এবং ধারণের তাৎপর্য্য, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য ও অকর্তব্য, কন্যার উপনয়ন সংস্কার, শুদ্রের উপনয়ন সংস্কার, আধুনিক যুগে উপনয়ন সংস্কারের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক সংস্কারগুলো হল উপাকরণ বা উপাকর্ম, উৎসর্জন বা উৎসর্গকর্ম বা উপক্রম, বেদাধ্যয়ন বা বেদব্রত, উপরমকর্ম বা অনধ্যায়। এই সংস্কার গুলো সম্পর্কে, এই সংস্কার গুলোর নিয়ম এবং আধুনিক যুগে বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক সংস্কাররূপে সমাবর্তন ও আধুনিক বঙ্গজীবনে তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যা সমাপ্ত করার পর স্নাত হয়ে স্নাতক রূপে

গুরুর কিছু বাণীকে বা উপদেশকে পাথেয় করে গুরুকুল থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য যে সংস্কার করা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় সমাবর্তন সংস্কার। সমাবর্তনের স্বরূপ, স্নানের নিয়ম, স্নাতকের প্রকারভেদ, সমাবর্তন ভাষণ ও তার তাৎপর্য, স্নাতকোত্তর বিধিনিষেধ কার্য, নারীর সমাবর্তন, আধুনিক জীবনে সমাবর্তন সংস্কারের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.২ নূতন দিগ্‌দর্শন (New Findings):

আমাদের এই গবেষণা সন্দর্ভটির মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিপুল সংস্কারগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র শিক্ষা সংস্কারগুলো নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে বর্তমান যুগে শিক্ষা-সংস্কারের কতটা প্রাসঙ্গিকতা আছে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কারের যে সমস্ত বিধিনিয়ম বৈদিক সাহিত্য ও তৎপরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় সে সমস্ত আধুনিক কালে পালন করা হয় কি না তাও সীমিত পরিসরের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং সেগুলোর বিবর্তনের ধারা আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আধুনিক শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য থাকবে তা স্বাভাবিক ব্যাপার। আবার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ- কোনও না কোনও রূপে তা যে অবস্থান করবে সেটি আমরা অনুমান করতে পারি। এই অনুমানের সূত্র ধরেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছি।

গবেষণাকার্যটি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সাহায্যলাভের জন্যে নানা গ্রন্থাগার ব্যবহার করা হয়েছে। যথা- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, প্রভৃতি। ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্যে শ্রী শ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ এবং শ্রী

সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জালিক মাধ্যমের সাহায্যও গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্কারবিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। চলিত বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে এবং এজন্যে আধুনিক বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণা-সন্দর্ভটিতে প্রবন্ধের শিরোনামে কালপুরুষ ১৬ মাত্রাকৃতি রাখা হয়েছে। মূল প্রবন্ধ ও পাদটীকায় এই মাত্রাকৃতি হয়েছে যথাক্রমে ১৪ ও ১২। সন্দর্ভটির মূলভাগে মুদ্রিত উভয় পঙ্‌ক্তির মাঝে ১.৫ করে ব্যবধান রাখা হয়েছে। এখানে মূল অংশে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এবং পাদটীকায় বিস্তৃত উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে কখনও মূল অংশ ও কখনও বা পাদটীকায় আকরস্থান উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জিতে MLA পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রন্থগুলির নাম বর্ণক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। মূল গ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থের সূচী পৃথক্‌ভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। গবেষণাকর্মের শেষে কয়েকটি নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের এই গবেষণা সন্দর্ভটিতে কেবলমাত্র বঙ্গজীবনে বৈদিক শিক্ষা সংস্কারের আধুনিক প্রভাব এবং এই সংস্কারের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্য রাজ্যে বা ভারতবর্ষ বহির্ভূত অন্যান্য দেশে এই সংস্কার গুলোর কোনও প্রভাব বা প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করার অবকাশ পাওয়া যায়নি। এছাড়াও অন্য ধর্মের এবং অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সংস্কারের কোনও প্রভাব আছে কীনা আর থাকলেও তার পদ্ধতি, এই সংস্কারের গুলোর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কোনও আলোচনা আমদের এই সন্দর্ভে করা হয়নি। আমার এই সন্দর্ভে অন্যান্য সংস্কারের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও আলোচনা করা হয়নি।

অবশেষে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় লিখিত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "সমাজ চেতনা ও সংস্কৃতির আদিকথা" (প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৩৫৯, খণ্ড সংখ্যা ১.৩, বর্ষ সংখ্যা ৪০.১, পৃষ্ঠা ১৮৭-৮৯) এই প্রবন্ধে লেখক বলেছেন – "মানুষ শুধু ব্যক্তি নয়, সে সামাজিক জীব- এই অর্থে যে, সমাজের মধ্যে ভিন্ন তার বেঁচে থাকা অসম্ভব। সকলের সঙ্গে তাকে এক মঞ্চে দাঁড়াতে হয়, জীবন ধারণের উপায় স্থির করার জন্য। সকলের জন্য প্রত্যেকে এবং প্রত্যেকের জন্য সকলে- এমনি একটি সচেতন বা অচেতন অনুভূতি মানুষকে পরস্পর হিতসাধন, ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণ ও আত্মরক্ষার পথে চালিয়ে নিয়ে যায়। সমবেত কর্মের এই মঞ্চই সমাজ। ব্যক্তির উপর সমাজের প্রভাব জীবন্ত, সমাজকেও তেমনই স্বাধীন বুদ্ধি-বৃত্তি শ্রেয়ের পথ দেখায়, পরিণতির আদর্শ লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেয় সমাজ পরিবর্তনশীল- অগ্রগতিই তার জীবন। সমাজের এই গতিপথে আমরা পাই সংস্কৃতির সাক্ষাৎ। সংস্কৃতি সমাজ স্মৃতির ধারক ও বাহক। যুগ যুগান্তের সামাজিক অভিজ্ঞতার যে স্মৃতি পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, সেই স্মৃতিকে পরিস্ফুট করে সংস্কৃতি, মানব সমাজের নূতন আবেষ্টনের মধ্যে। কালচক্রের আবর্তনে নূতন হয় পুরাতনে পরিণত, অনাগত নূতন রূপে এসে দেখা দেয়। বিবর্তনের চিরন্তন বিধির মত নূতনের সঙ্গে পুরানোর গাঁট ছড়া বেঁধে দেয় সংস্কৃতি- পুরাতনকে করে নূতন, নূতনকে পুরাতন।"

তালিকাসমূহ

১.উপনয়ন সংস্কারে বর্ণানুসারে পরিহিত বস্ত্রের তালিকা

গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র	ব্রাহ্মণ অজিন বা পট্ট বস্ত্র	ক্ষত্রিয় অজিন বা পট্ট বস্ত্র	বৈশ্য অজিন বা পট্ট বস্ত্র	ব্রাহ্মণ মেখলা	ক্ষত্রিয় মেখলা	বৈশ্য মেখলা	ব্রাহ্মণ অন্তর্বাস	ক্ষত্রিয় অন্তর্বাস	বৈশ্য অন্তর্বাস
আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র	কৃষ্ণমৃগ / গৈরিক বর্ণ	রুরু মৃগ /ঈষৎ রক্ত বর্ণ	ছাগ/ হলুদ বর্ণ	মুঞ্জঘাস	ধনুর জ্যা	মেষের লোম	*	*	*
শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র	*	*	*	মুঞ্জঘাস	ধনুর জ্যা	পশমী সুতো	*	*	*
জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র	কৃষ্ণমৃগ	রুরু মৃগ	ছাগ	মুঞ্জঘাস	মুর্ব	তমাল	শণ বা লিনেন	শণ বা লিনেন	শণ বা লিনেন
গোভিল গৃহ্যসূত্র	কৃষ্ণমৃগ	রুরু মৃগ	ছাগ	মুঞ্জঘাস	কাশতৃণ	শণ বা পাট	ক্ষৌম বা তসর	শণ	তুলো
পারস্কর গৃহ্যসূত্র	কৃষ্ণমৃগ	রুরু মৃগ	ছাগ	মুঞ্জঘাস	ধনুর জ্যা	সরু তৃণ	পট্ট বা পাট	রেশম	মেষ

বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র	কৃষ্ণমৃগ	রুরু মৃগ	বস্তাজিন	*	*	*	*	*	*
বৈখানস গৃহ্যসূত্র	কৃষ্ণমৃগ	রুরু মৃগ	বস্তাজিন	মুঞ্জঘাস	মৌর্বী বা ধনুর জ্যা	শণ	*	*	*
কাঠক গৃহ্যসূত্র	কৃষ্ণমৃগ	ব্যাঘ্র	রুরু	*	*	*	*	*	*
হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র	*	*	*	মুঞ্জঘাস	ধনুর জ্যা	মেষের লোম	*	*	*
আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র	কৃষ্ণ মৃগ /গৈরিক বর্ণ	রুরু মৃগ/ঈষৎ রক্ত বর্ণ	ছাগ/ হলুদ বর্ণ	মুঞ্জঘাস	ধনুর জ্যা	ঊণী/ বৃষ বন্ধন রজ্জু	শণ	অতসী	যে কোন পশুর চর্ম
গৌতম ধর্মসূত্র	কৃষ্ণ মৃগ/ গৈরিক বর্ণ	রুরু মৃগ/ ঈষৎ রক্ত বর্ণ	ছাগ/ হলুদ বর্ণ	*	*	*	শণ	অতসী	ঊণী

বৌধায়ন ধর্মসূত্র	কৃষ্ণ মৃগ	রুরু মৃগ	ছাগ	মুঞ্জঘাস	ধনুর জ্যা	পট্ট বস্ত্র	*	*	*
মনু সংহিতা	*	*	*	মুঞ্জঘাস	মুর্ব	তিন গাছি শণ	*	*	*
বিষ্ণু সংহিতা	মৃগ /কার্পাস বস্ত্র	ব্যাঘ্র/ শণের বস্ত্র	ছাগ মেষের লোম জাত	মুঞ্জঘাস	ধনুর জ্যা	বল্বজ তৃণ	*	*	*
উশনঃ সংহিতা	শ্বেত বস্ত্র	শ্বেত বস্ত্র	শ্বেত বস্ত্র	*	*	*	*	*	*

২. উপনয়ন সংস্কারে বর্ণানুসারে দণ্ডধারণের তালিকা

গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র	**ব্রাহ্মণের দণ্ড**	**ক্ষত্রিয়ের দণ্ড**	**বৈশ্যের দণ্ড**	**ব্রাহ্মণের দণ্ডের পরিমাপ**	**ক্ষত্রিয়ের দণ্ডের পরিমাপ**	**বৈশ্যের দণ্ডের পরিমাপ**
আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র	পলাশ	ডুমুর	বেল	কেশ	কপাল	নাসিকা

শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র	পলাশ বা বেল	ন্যগ্রোধ	ডুমুর	নাসিকা	কপাল	কেশ
গোভিল গৃহ্যসূত্র	পার্ণ বা পলাশ	বৈল্ব বা বেল	অশ্বত্থ	*	*	*
জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র	পলাশ	ন্যগ্রোধ	উদুম্বর	নাসিকা	*	*
পারস্কর গৃহ্যসূত্র	পলাশ	ন্যগ্রোধ	উদুম্বর	কেশ	কপাল	নাসিকা
বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র	পলাশ	ন্যগ্রোধ	উদুম্বর	*	*	*
বৈখানস গৃহ্যসূত্র	পলাশ বা বেলের	ন্যগ্রোধ	উদুম্বর	কেশ	ললাট	নাসিকা
হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র	পলাশ বা বেল	ন্যগ্রোধ	উদুম্বর	*	*	*
আপস্তম্ভ গৃহ্যসূত্র	পলাশ	ন্যগ্রোধ	উদুম্বর	*	*	*
গৌতম ধর্মসূত্র	বেল বা পলাশ	পীপল বা পীল্লু	পীপল বা পীল্লু	কেশ	কপাল	নাসিকা

বৌধায়ন ধর্মসূত্র	*	*	*	কেশ	কপাল	নাসিকা
মনু সংহিতা	বেল বা পলাশ	বট বা খদির	পিলু বা উদুম্বর	কেশ	কপাল	নাসিকা

৩. বর্ণানুসারে উপনয়ন সংস্কারের বয়সের তালিকা

গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র	**ব্রাহ্মণের বয়স**	**ক্ষত্রিয়ের বয়স**	**বৈশ্যের বয়স**
আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র	আট	এগারো	বারো
শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র	আট/ দশ	এগারো	বারো
আপস্তম্ভ গৃহ্যসূত্র	আট	এগারো	বারো
মানব গৃহ্যসূত্র	সাত/নয়	এগারো	বারো
কাঠক গৃহ্যসূত্র	সাত	নয়	এগারো
হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র	সাত	এগারো	বারো
বৈখানস গৃহ্যসূত্র	আট	এগারো	বারো
বারাহ গৃহ্যসূত্র	আট	এগারো	বারো
আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র	আট	এগারো	বারো

বৌধায়ন ধর্মসূত্র	আট	এগারো	বারো
গৌতম ধর্মসূত্র	আট	এগারো	ষোলো
মনু সংহিতা	আট	এগারো	বারো
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা	আট	এগারো	বারো
বিষ্ণু সংহিতা	আট	এগারো	বারো
ব্যাস সংহিতা	আট	এগারো	বারো

নির্দেশিকা

গবেষণা-সন্দর্ভে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দের তালিকা

অনধ্যায় ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২

অন্ত্যেষ্টি ২৭, ৬৮, ৭৮

আপ্তোর্যাম ১৪, ৬৭, ৬৮

অগ্নিষ্টোম ১৪, ২৮, ৬৮

অত্যগ্নিষ্টোম ১৪, ২৮,৬৮

অগ্ন্যাধান ১৪, ২৮, ৬০, ৬৮

অগ্নিহোত্র ১৪, ২৮, ৬০, ৬১-৬৩

অতিরাত্র ১৪, ২৮, ৬৭

অন্নপ্রাশন ২, ৭, ৮, ২০, ২২, ২৭, ৫০

অধ্যক্ষ ১৯১

অষ্টকাশ্রাদ্ধ ১৫, ২৮, ৫৯, ৬০

আগ্রয়ণ ১৪, ২৮, ৬০, ৬৪

আচার্য ৮৬, ৮৭, ৯৪-৯৯, ১০১, ১০২, ১০৮, ১০৯, ১২৪-১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৪৮, ১৫৩, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০-৭১, ১৭৭-১৮২, ১৮৯, ১৯২

আশ্বযুজীযজ্ঞ ২৮, ৫৯, ৬০

উক্থ্য ১৪, ২৮, ৬৭

উপনয়ন ২, ৩, ৭, ৮, ১৯, ২২, ২৫-২৮, ৫১, ৫২, ৮০-৯৪, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৪-১০৭, ১০৯, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৩১, ১৩৬-১৪৩, ১৪৫, ১৫০, ১৫৬, ১৬৬, ১৭৪, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৪

উপাকরণ বা উপাকর্ম ৩, ৭, ২২, ২৬, ২৭, ৫৩, ১৪৮, ১৫২, ১৫৪-১৫৭, ১৬৩, ১৬৪, ১৯৪

উৎসর্জন বা উৎসর্গ ৩, ৭, ২২, ২৭, ৫৩, ১৫২, ১৫৪-৫৬, ১৬৩, ১৬৪, ১৯৪

উপাচার্য ১৭৩-১৭৫

উত্থানবিধি ২৬, ৩৯

ঋত্বিক ৮৫

কেশান্ত / গোদান ৭, ২২, ২৬, ২৯, ৪৯

কর্ণবেধ ২৬, ৪২, ১৪৪

গুরু ৮৫-৮৭, ১০২-০৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১৪৪, ১৬৬-৭১, ১৭৩, ১৭৭, ১৮২, ১৮৮

গুরুকুল ১৪৩-১৪৬, ১৮৮

চাতুর্মাস্য ১৪, ২৬, ৬৫

চৌল/ চূড়াকরণ ২, ৭, ৮, ২২, ২৭, ৪৪-৪৭, ৪৮, ৫২

চৈত্রী যজ্ঞ ১৫, ২৮, ৬০

জাতকর্ম ২, ৭, ৮, ২২, ২৬-২৭, ৪০

দেবযজ্ঞ ১৫, ৫৯

দর্শপূর্ণমাস ১৪, ২৮, ৬৪

নিষেক/গর্ভাধান ২, ৮, ২০. ২৬, ২৭, ৩১, ৩২

স্নান/সমাবর্তন ২, ৩, ৭, ৯, ২০, ২৩, ২৬-২৮, ৫৩-৫৫ ৫৮, ৯২, ১৬৭-১৭২, ১৭৩-৭৭, ১৮২, ১৮৭, ১৮৮,১৯১, ১৯২

নামকরণ ২, ৭, ৮, ২০, ২২, ২৬, ২৭, ৪০-৪২

নিষ্ক্রামণ/ উপনিষ্ক্রামণ ২২, ২৬, ২৭, ৪৩, ৪৪

স্নাতক ৫৫, ৫৮, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৬-৭৭, ১৮৫-১৯০

নিরূঢপশুবন্ধ ১৪, ২৮, ৬০, ৬৫

নৃযজ্ঞ ১৫, ৫৯

পুংসবন ৩৩-৩৫

পাণিগ্রহণ/ বিবাহ ২, ৭, ৯, ২৩, ২৬-৩০, ১৩৭

পার্বণশ্রাদ্ধ ২৮, ৫৯, ৬০

পিণ্ডবর্ধন ২৭, ৫১

পুরোহিত ১৪৪, ১৮৮

পিতৃযজ্ঞ ১৫, ৫৯

ব্রহ্মযজ্ঞ ১৫, ৫৯

বেদপারায়ণাঙ্গভূত/বেদব্রত ৩, ৭, ২৭, ৫২, ১৫৬-৫৯

বিষ্ণুবলি ২৭, ৩৮

বর্ষবর্ধন ২৭, ৪২

বাজপেয় ১৪, ২৮, ৬৭

ব্রতবন্ধ সংস্কার ৮০, ৮৪, ৮৫

ব্রহ্মচারী ৫৩ - ৫৭, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৯১-৯৩, ১০০-১১২, ১১৪-১১৬, ১২১, ১২৫-১৩২, ১৩৬-৩৭, ১৪৮, ১৫৭, ১৬৬-৭৫, ১৭৭

ব্রহ্মচর্য ৮২, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ৯১-৯২, ৯৪, ১০২, ১০৭-১০৯, ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১৩৩, ১৩৭-৩৯, ১৪১, ১৪৭, ১৫৩, ১৬৬-৬৮, ১৭৩, ১৭৩-৭৮, ১৮৭, ১৮৮

ভূতযজ্ঞ ১৫, ৫৯

মাণবক ৮৫, ৮৬, ৯৩-৯৯, ১০৪

মৌঞ্জীবন্ধন সংস্কার ৮৪, ৮৫, ১৩৭

মধুপর্ক ২৭, ৮৪, ১৬৭

যজ্ঞোপবীত ৮১, ৮২, ৮৪, ১১৭-১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩৪, ১৩৭, ১৪১, ১৪৩, ১৭৬

শ্রাদ্ধ ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ৭৮,৭৯

শ্রাবণীযজ্ঞ ১৫, ২৮, ৫৯-৬০

ষোড়শী ১৪, ২৮, ৬৩

সৌত্রামণী ১৪, ২৮, ৬০, ৬৭

সীমন্তোন্নয়ন ২, ৮, ২১, ২৬-২৭, ৩৫-৩৭

সুতিকা গৃহের সংস্কার ২৮, ৩৮

.....

গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থ:

অথর্ববেদ-সংহিতা. সম্পা. বিজনবিহারী গোস্বামী. হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫

অথর্ববেদ-সংহিতা. সম্পা. দিলীপ মুখোপাধ্যায়. অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৭

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র. সম্পা. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়. দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

উপনিষদ. সম্পা. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ. হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬

ঊনবিংশতি সংহিতা. সঙ্কলন ও অনুবাদ. পঁঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পা. অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়. সদেশ, কলকাতা, ২০১৮

ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম খণ্ড). সম্পা. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়. হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫

ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড). সম্পা. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়. হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫

ঋগ্বেদীয়-গৃহ্যসূত্র. সম্পা. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪০৮

গোভিল-গৃহ্যসূত্র. সম্পা. অমিয় কুমার ভট্টাচার্য্য. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩

গোপথ-ব্রাহ্মণ (পঞ্চদশখণ্ড). সম্পা. তারকনাথ অধিকারী. রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৪২৩

যজুর্বেদ-সংহিতা. সম্পা. বিজনবিহারী গোস্বামী. হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮২

পারস্কর-গৃহ্যসূত্র. সম্পা. অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪০৬

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব (প্রথম খণ্ড). সম্পা. বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৯৪

মনুসংহিতা. সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৯

মন্ত্রব্রাহ্মণম্. সম্পা. অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়. সদেশ, কলকাতা, ১৪১৫

মীমাংসা-দর্শনম্ (দ্বিতীয় খণ্ড). সম্পা. ভূতনাথ সপ্ততীর্থ. সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৭

সামবেদ-সংহিতা. সম্পা. পরিতোষ ঠাকুর. হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫

অষ্টাধ্যায়ী. শ্রীগোপালদত্তপাণ্ডে. চৌখ্বাম্বা পাবলিসিং হাউস, বারাণসী

অষ্টাদশস্মৃতি. প. মিহিরচন্দ্র. প্রতিভা প্রকাশন, দিল্লী, ২০১৮

অথর্ববেদীয়-কৌশিক-গৃহ্যসূত্রম্. উদয়নারায়ণ সিংহ (সম্পা). জ্যোতিষ প্রকাশ প্রেস, বেনারস, ১৯৯৯

আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রম্. জমুনাপাঠকঃ(সম্পা). চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ আফিস, বারাণসী, ২০১৮

আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রম্. উমেশচন্দ্র পাণ্ডে (সম্পা). চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান,বারাণসী, ২০১৬

কুমারসম্ভবম্ (১ম- ৫ম সর্গ). শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য (সম্পা). সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৬

খাদিরগৃহ্যসূত্রম্. উদয়নারায়ণ সিংহ (সম্পা). চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৯১

গোভিলগৃহ্যসূত্রম্. সত্যব্রত সামশ্রমী (সম্পা). চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৯২

গৌতমধর্মসূত্রাণি. উমেশচন্দ্র পাণ্ডে (সম্পা). *চৌখম্বা সংস্কৃত্ সংস্থান, বারাণসী, ২০১৩*

पारस्करगृह्यसूत्रम्. जगदीशचन्द्र मिश्र, ड. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी (सम्पा). चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी, २०१२

वाराह-गृह्यसूत्रम्. ठाकुर् उदयनारायण सिंह (सम्पा). मथुरापुर, शास्त्रप्रकाश भबन

वीरमित्रोदयस्य संस्कारप्रकाशः. हरिप्रसाददासेन अन्तर्जाले संस्थापित. डिसम्बरः, २०१४

वौधायन-धर्मसूत्रम्. उमेशचन्द्र पाण्डे (सम्पा). चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, २०१७

याज्ञबल्क्यस्मृतिः. गङ्गासागर राय (सम्पा). चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, २०२०

रघुवंशम्. श्रीमद् गुरुनाथ बिद्यानिधि भट्टाचार्य (सम्पा). संस्कृत बुक डिपो, २०१६, कलकाता

श्रीवैखानसगृह्यसूत्रम् (प्रथम स्म्पुटम्). आ. रो. पार्थसारथि भट्टाचार्य (सम्पा). श्री तिरुमल- तिरुपति देबस्थानम्, तिरुपति, १९९७

श्रीवैखानसगृह्यसूत्रम् (द्वितीयं स्म्पुटम्). आ. रो. पार्थसारथि भट्टाचार्य (सम्पा). श्री तिरुमल- तिरुपति देबस्थानम्, तिरुपति, १८८९

संस्कार-चन्दिका. सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्कार (ब्याख्या). आर्यसमाज, महाराष्ट्र, २०११

संस्कारसारः. रामगोविन्द शुक्ल (सम्पा). सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी, १९८५

संस्काररत्नमाला (पूर्वार्धम्). हरिनारायण आप्टे (सम्पा). आनन्दाश्रममुद्रणालय, माद्रास, १८९९

Agnivesya Grhyasutra. Ed. L. A Ravi Varma. The Oriental Manuscripts Library, Trivandrum, 1940

(The) Apastamba-Grihya-Sutra. Ed. A. Mahadeva Sastri. Government Oriental Library, Mysore, 1893

Bhāravāja Gṛhyasūtra. Ed. Henriette J.W. Salomons Litt. D. Late E. J. Brill Ltd, Leyden, 1913

(The) Bodhâyana Grihyasutra. Ed. R. Shama Sastri. Oriental library, Mysore, 1920

Dharmasūtras. Ed. Patrick Olivelle. Oxford University press, United States, 1999

Grihya-Sūtra by Paraskar. Ed. Mahādeva, Gangādhar Bākre. Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd, Bombay, 1982

Goutama-Dharmasutra. Ed. L. Srinivasacharya. Government oriental Library, Mysore, 1917

(The) Grihyasūtra of Hiranyakesin. Ed. J Kirste. 1889, Vienna

(The) Jaiminigṛhyasūtra. Ed. W. Caland. Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, Delhi, 1991

Kāthakagryasūtra. Ed. Willem Caland. University of Utrecht, Lahor, 1925

Kauthuma Grhya. Ed. Suryakānta. The Asiatic society, Calcutta, 1956

Manavagṛhyasûtra. Ed. Ramakrishna Harsharji Sastri. Central library, Baroda 1926

Śabdakalpadruma (Vol.3). Raja Bahadur. Motilal Banarasidas, Delhi, 1961

Vaikhānasasmārtasūtram. Ed. W Caland. Asiatic Society of Bengal, Kolkata 1929

সহায়ক গ্রন্থ:

অনির্বাণ. *বৈদিক সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড). সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৭

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ. *ভারতবর্ষ.* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা. ২০২২

চট্টোপাধ্যায়, অশোককুমার. *বৈদিক যজ্ঞ* . সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪২৪

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *জীবনস্মৃতি.* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি. *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা.* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু. *হিন্দুশাস্ত্রমতে উপনয়ন ও তৎপূর্ববর্তী পঞ্চবিধ – সংস্কার.* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু. *হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ.* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১১

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু. *হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধ সংস্কার.* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩

বসু, যোগীরাজ. *বেদের পরিচয়.* ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯

ভট্টাচার্য, অমিত. *প্রাচীন ভারতের সংস্কার চর্চা.* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০২

Apte, Shivram Vaman. *The Student's Sanskrit-English Dictionary.* Rashtriya Sanskrit Sansthan, Delhi 2010

Keith, Arthur. *The Human Body*. Home University Library of Modern Knowledge, London

Max Müller, F. *The Sacred books of the east* (Vol. 30). Motilal Banarsidass Private Limited, Delhi 2007

Max Müller, F. *The Sacred books of the east* (Vol. 29). Motilal banarsidass Private Limited, Delhi, 2018

Mookerji, Radhakumud, *Ancient Indian Education*, Macmillan And Co., Limited, 1947, London

Mukhopadhyay, Gobinda Gopal. *A new Tri-Lingual dictionary.* Sanskrit Book Depot, Kolkata, 2010

Pandey, Rajbali. *Hindu Saṃskāras.* Motital Banarsidass Publishers Private limited, Delhi, 1969

Ramgopal. *India of Vedic Kalpasūtras.* National Publishing House, Delhi 1959

Williams, M. Monier. *A Sanskrit English Dictionary* (Vol-I). Parimal Publications, Varanasi, 2011

Williams, M. Monier. *A Sanskrit English Dictionary* (Vol-II). Parimal Publications, Varanasi, 2011

****

_____

Signature of the Candidate

Oishi Saha

Date: